পাপকারী ব্যক্তিগণের উপর যাহার সমতাজ্ঞান হয়, সেই যোগীই সকল যোগী-গণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ॥ ৯ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ সুহৃদিত্যাদি শ্লোকার্দ্ধমেকং পদম্। সুহৃদিতি প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনো ন কস্যচিত্ পক্ষং ভজতে। মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়োঃ হিতৈষী। দ্বেষ্য আত্মনোঽপ্রিয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী ইতি এতেষু সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষু চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু—সর্ব্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিশিষ্যতে, বিমুচ্যতে ইতি বা পাঠান্তরং যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকের অর্দ্ধভাগই একটীপদ (হইয়াছে জানিবে)। প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়া যে উপকার করে সে সুহৃৎ, যে অপকার করে সে অরি, যে কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করে সে উদাসীন; পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়েরই যে হিত কামনা করে সে মধ্যস্থ, যাহাকে দেখিতে ভাল লাগে না সেই দ্বেষ্য, যে সম্বন্ধী সেই বন্ধু, ইহারা সাধু (অর্থাৎ) শাস্ত্রানুবর্ত্তী অথবা পাপ (অর্থাৎ) প্রতিষিদ্ধের আচরণকারীই হউক, উভয়থাই ইহাদের উপর যাহার সাম্যবুদ্ধি আছে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কে কি কর্ম্ম করিতেছে, এই ভাবিয়া যাহার চিত্ত ব্যাপৃত হয় না। সেই ব্যক্তিই বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় (অর্থাৎ) যোগারূঢ় ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই শ্লোকে বিশিষ্যতে এই স্থলে বিমুচ্যতে, এই প্রকার পাঠান্তরও আছে (তাহার অর্থ বিমুক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (সন) যোগী আত্মানাং সততং যুঞ্জীত ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—নির্জ্জনে স্থিত একাকী বীততৃষ্ণ ও প্রতিগ্রহবর্জ্জিত হইয়া যোগী চিত্ত ও দেহের সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মার সমাধান করিবে ॥ ১০ ॥

ভাষ্য।—অতএবমুত্তরফলপ্রাপ্তয়ে যোগী ধ্যায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ, সততং সর্ব্বদা, আত্মানং অন্তঃকরণং, রহসি একান্তে, গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্ একাকী অসহায়ঃ। রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ। যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণং আত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য স যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ

বীতস্পৃহঃ অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ। সংন্যাসিত্বেঽপি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই কারণে এইরূপ চরম ফল পাইবার জন্য "যোগী" ধ্যায়ী যোগ (অর্থাৎ) সমাধান করিবে, 'সতত' সর্ব্বদা (কাহার?) 'আত্মার' অন্তকরণের, একান্তে পর্ব্বতগুহাদিতে অবস্থিত ও 'একাকী' অসহায় হইয়া, একান্তে স্থিত ও একাকী এই দুইটী বিশেষণ থাকাতে 'সংন্যাস করিয়া' এই প্রকার অর্থই (পাওয়া যাইতেছে)। 'যতচিত্তাত্মা' চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ, আত্মা এই শব্দটীর অর্থ দেহ, এই দুইটী পদার্থ যাহার সংযত হইয়াছে, তাহাকেই 'যতচিত্তাত্মা' (বলা যায়)। 'নিরাশীঃ' বীতস্পৃহ, 'অপরিগ্রহ' পরিগ্রহরহিত ইহাই অর্থ। সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও (সর্ব্বপ্রকারে পরিগ্রহ ত্যাগপূর্ব্বক চিত্ত সমাধান করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং॥ ১১॥

অন্বয়।—শুচৌ দেশে চেলাজিনকুশোত্তরং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং স্থিরং আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য॥ ১১॥

মূলানুবাদ।—পবিত্র দেশে, নীচে কুশ তাহার উপর মৃগচর্ম্ম এবং তাহার উপরে বস্ত্র এই প্রকার অনতি উচ্চ এবং অনতিনিম্ন নিজের স্থির আসন সংস্থাপন করিয়া॥ ১১॥

ভাষ্য।—অথেদানীং যোগং যুঞ্জতঃ আসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ, প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চ ইত্যত আরভ্যতে। তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমং উচ্যতে। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমচলমাত্মন আসনং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং নাপ্যতিনীচং তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলমজিনং কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্ আসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরং পাঠক্রমাদ্বিপরীতোঽত্র ক্রমশ্চেলাদীনাম্॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এক্ষণে যোগীর যোগের প্রতি অনুকূলতা নিবন্ধন, আসন আহার ও বিহারাদির নিয়ম বলিতে হইবে এবং যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও যোগ প্রাপ্তির ফলও বলিতে হইবে, এই জন্য আরম্ভ করা হইতেছে। তাহার মধ্যে প্রথমে আসন (কিপ্রকার) তাহাই বলা হইতেছে। শুচি (অর্থাৎ) স্বভাবতঃ

অথবা গোময়াদি লেপরূপ সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ দেশে (অর্থাৎ) স্থানে, 'স্থির' অচল নিজের আসন সংস্থাপিত করিয়া; (সেই আসনের বিশেষণ দেওয়া হইতেছে) 'নাত্যুচ্ছ্রিত' অতীব উন্নত নহে এবং নাতিনীচ (অর্থাৎ) অত্যন্ত নিম্নও নহে, 'চেলাজিনকুশোত্তর' অর্থাৎ প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর মৃগচর্ম্ম এবং তাহার উপর চেল বস্ত্র (পাতিয়া আসন করিতে হইবে)। 'চেলাজিন-কুশোত্তর' এই পদটীতে যে প্রকার পাঠের ক্রম আছে, তাহার বিপরীত ক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠক্রমানুসারে প্রথমে চেল বস্ত্র, তাহার উপর চর্ম্ম ও তাহার উপর কুশ, এই প্রকার অর্থ হইলেও উহা গ্রহণ না করিয়া অগ্রে কুশ, তদুপরি চর্ম্ম ও তদুপরি চেল গ্রহণ করিতে হইবে, ইহারই নাম পাঠক্রম হইতে বিপরীত ক্রম ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ তত্র (আসনে) উপবিশ্য একাগ্রং মনঃ কৃত্বা আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া সেই আসনে উপ-বেশন পূর্ব্বক মনের একাগ্রতা সম্পাদন করত চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য সমাধি অবলম্বন করিবে ॥ ১২ ॥

ভাষ্য।—প্রতিষ্ঠাপ্য কিং? তত্র তস্মিন্ আসনে উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ কথং? সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ চিত্তং চ ইন্দ্রিয়াণি চিত্তেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়াঃ সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ সঃ, কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাৎ ইত্যাহ আত্মবিশুদ্ধয়ে অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থ-মিত্যেতৎ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আসন স্থাপন করিয়া কি (করিবে?) সেই আসনে উপ-বেশন করিয়া যোগের অনুষ্ঠান করিবে। কি প্রকারে? সকল বিষয় হইতে উপসংহৃত করিয়া চিত্তের একাগ্রতা করিবে (এবং যতচিত্তেন্দ্রিয় (হইবে); চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সমূহ (এই অর্থে) চিত্তেন্দ্রিয় (এই পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে)। সেই চিত্ত ও ইন্দ্রিয় নিচয়ের ক্রিয়া সকলকে যে সংযত করিয়াছে, সে যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়। সে কি ফললাভের জন্য এই প্রকার যোগের অনুষ্ঠান করিবে?

তাহাই বলিতেছেন আত্মবিশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধিরূপ ফলের জন্য, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩॥

অন্বয়।—কায়শিরোগ্রীবং সমং (তথা) অচলং ধারয়ন্ স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ অনবলোকয়ন্ চ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—দেহ মস্তক ও গ্রীবাকে সমভাবে এবং নিশ্চল ভাবে ধারণ করিবে এবং দিক্ সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া নিজের নাসিকাগ্রে স্থির দৃষ্টি বিন্যাস পূর্ব্বক (যোগ করিবে) ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য।—বাহ্যমাসনমুক্তমধুনা শরীরধারণং কথমিত্যুচ্যতে, সমং কায়শিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবাচ কায়শিরোগ্রীবং সমং ধারয়ন্ অচলং চ সমং ধারয়তঃ চলনং সম্ভবতি অতো বিশিনষ্টি অচলমিতি স্থিরঃ স্থিরোভূত্বা ইত্যর্থঃ। স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সম্যক্‌প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বা ইব ইতি ইব শব্দোলুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। নহি স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতং, কিং তর্হি চক্ষুষোর্দৃষ্টি-সংনিপাতঃ। স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষোবিবক্ষিতঃ। স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণং চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি। আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যতি আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি। তস্মাদিব শব্দলোপেন অক্ষোর্দৃষ্টিসংনি-পাতএব সংপ্রেক্ষ্য ইত্যুচ্যতে। দিশশ্চানবলোকয়ন্ দিশাং চাবলোকনমন্তরা অকুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—বাহ্য আসন বলা হইয়াছে, এক্ষণে কি প্রকারে শরীরকে ধারণ করিবে, তাহাই বলা হইতেছে। দেহ মস্তক ও গ্রীবাকে সমভাবে ও নিশ্চল ভাবে ধারণ পূর্ব্বক, সমভাবে ধারণ করিলেও কম্পের সম্ভাবনা আছে, এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে নিশ্চল ভাবে (ধারণ পূর্ব্বক), স্বয়ং স্থির হইয়া, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এবং নিজের নাসিকার অগ্রভাগকে যেন সম্যক্‌প্রকারে দর্শন করিয়া (এখানে যেন এই অর্থে প্রযুক্ত ইব শব্দটী নাই বলিয়া, তাহার লোপ হইয়া, ইহা বুঝিতে হইবে), কারণ এই স্থলে নিজ নাসিকাগ্রের সম্যক্ দর্শন বিধান করিবার অভিলাষ (ভগবানের ছিল না); তবে কি? (বিধান করিয়াছেন?) নাসিকাগ্রে চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টির সংনিপাত (এই স্থলে বিহিত হই-য়াছে); তাহাও চিত্তের সমাধানের অপেক্ষায় বিবক্ষিত হইয়াছে। নিজের

নাসিকাগ্রের প্রতি সম্যগ্ দর্শন যদি এই স্থলে বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে মনও সেই খানেই সমাহিত হইত, আত্মাতে সমাহিত হইতে পারিত না। "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" (মনকে আত্মাতে সমাহিত করিয়া) ইত্যাদি শ্লোকে আত্মাতেই মনের সমাধান করিতে হইবে, ইহা বলিবেন; সেই কারণে এই স্থলে ইব শব্দের লোপ দ্বারা নয়নের দৃষ্টিসংনিপাত (নাসিকার অগ্রভাগে বাহ্য নয়ন ব্যাপারের স্থিরতা সংপাদন)ই সংপ্রেক্ষণ করিয়া এই শব্দের অর্থ (বুঝিতে হইবে) এবং দিক্ সকলকে না দেখিয়া (অর্থাৎ) মধ্যে মধ্যে বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া (যোগ করিবে). ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ মনঃ সংযম্য আসীত ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—প্রশান্ত চিত্ত, ভয় রহিত, গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি ব্রহ্মচারি ব্রতে রত, মচ্চিন্তানিরত এবং মৎপরায়ণ হইয়া মনের সংযম পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া থাকিবে ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ। প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্বিগতভয়ঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ব্রহ্মচারিণোব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষাভুক্ত্যাদি, তস্মিন্ স্থিতস্তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসঃ বৃত্তীরুপসংহৃত্য ইত্যেতৎ। মচ্চিত্তঃ ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তঃ, যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্, আসীত উপবিশেৎ, মৎপরঃ অহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরঃ ভবতি,কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তঃ নতু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্নাতি, কিন্তু রাজানং মহাদেবং বা অয়ংতু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও (যোগীর বিশেষণ বর্ণিত হইতেছে), "প্রশান্তাত্মা" আত্মা (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ, যাহার প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হইয়াছে সেই যোগীই প্রশান্তাত্মা, "বিগতভী" ভয়শূন্য, "ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত" ব্রহ্মচারিব্রত ব্রহ্মচর্য্য (অর্থাৎ) গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষাভোজনাদি, তাহারই অনুষ্ঠানকারী, হইবে ইহাই অর্থ। আরও মনের সংযম করিয়া (অর্থাৎ) বাহ্য বিষয়ে মনের বৃত্তি সমূহের উপসংহার করিয়া ইহাই তাৎপর্য্য, পরমেশ্বর আমার প্রতি যাহার চিত্ত (সংনিবিষ্ট হয়), তাহারই নাম মচ্চিত্ত; এই প্রকার সমাধিনিরত হইয়া উপ-

বেশন করিবে। আমিই যাহার পরম (গতি), তাহাকে মৎপর কহা যায়। কোন আসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীচিত্ত হয় বটে, কিন্তু একেবারে স্ত্রীকেই পরম বলিয়া গ্রহণ করে না, কি তবে ? রাজা অথবা মহাদেবকে পরম বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে, এই যোগী কিন্তু মচ্চিত্ত এবং মৎপর হইবে ॥ ১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—এবং (উক্ত প্রকারেণ) নিয়তমানসঃ (সন্) সদা আত্মানং যুঞ্জন্ যোগী মৎসংস্থাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিং সমধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—এই প্রকারে সংযতচেতা হইয়া যোগী সর্ব্বদা আত্মার সমাধি করিলে আমার অধীন মোক্ষপর্য্যবসানরূপ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য।—অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্ এবং যথোক্তেন বিধানেন সদা আত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ নিয়তং সংযতং মনোযস্য সোঽয়ং নিয়তমানসঃ শান্তিং উপরতিং নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষস্তৎ পরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা তাং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং মদধীনাং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এইক্ষণে যোগের ফল বলা যাইতেছে। এই প্রকার যথোক্ত বিধানে "নিয়তমানস" সংযতচিত্ত (হইয়া) সর্ব্বদা আত্মার যোগ (অর্থাৎ) সমাধান করিতে করিতে যোগী আমারই অধীন নির্ব্বাণপরমা শান্তি (অর্থাৎ) উপরতিকে লাভ করিয়া থাকে। "নির্ব্বাণপরমা" (ইহার অর্থ) নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ মোক্ষ, তাহাই যাহার শেষ সীমা, তাহারই নাম নির্ব্বাণপরমা শান্তি ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—অতি (বহুতরং) অশ্নতঃ (ভক্ষয়তঃ) ন যোগঃ অস্তি (তথা) একান্তং (নৈরন্তর্য্যেণ) অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) (ন যোগঃ অস্তি), অতিস্বপ্নশীলস্য (তথা) অতি জাগ্রতঃ (ন যোগোঽস্তি) হে অর্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে অর্জ্জুন ! যে অতিশয় ভোজন করে, তাহার যোগ হয়

না, যে একেবারে ভোজন করে না, তাহারও যোগ হয় না, যে অতিশয় নিদ্রালু তাহার যোগ হয় না এবং যে অতিশয় জাগরণ করে তাহারও যোগ হয় না ॥১৬॥

ভাষ্য।—ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে। নাত্যশ্নতঃ আত্ম-সংমিতমন্নপরিমাণমতীত্য অশ্নতঃ অত্যশ্নতঃ ন যোগোঽস্তি। নচৈকান্তমনশ্নতঃ যোগোঽস্তি। "যদুহবা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি যদ্ভূয়োহিনস্তি তৎ যৎ কনীয়ো ন তদবতি" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা যোগিনো যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতা-দন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো নাস্তি। উক্তং হি—

"অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥"

ইত্যাদি পরিমাণম্।

তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগোভবতি নৈবচাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো-ভবতি চ অর্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইক্ষণে যোগীর আহারাদির নিয়ম বলা হইতেছে; "অতি-শয় অশনকারীর" আত্মপরিমিত অন্নপরিমাণ হইতে অধিক ভক্ষণকারীর যোগ হয় না; একান্ততঃ অনশনকারীরও যোগ হয় না। শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে পারা যায়, কারণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, যাহা আত্মপরি-মিত অন্ন, তাহাই (শরীর) রক্ষার প্রতি হেতু, তাহা (শরীরের) কোন হানি করে না, যাহা পরিমাণের অধিক তাহা (শরীরের) হানি করে এবং যাহা পরিমিত হইতে অল্প তাহা শরীর রক্ষা করিতে পারে না। সেই কারণে যোগী আত্মসংমিত অন্ন হইতে অধিক বা ন্যূন অন্ন ভক্ষণ করিবে না। অথবা যোগশাস্ত্রে যোগীর পক্ষে যেরূপ অন্নের পরিমাণ উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে অতিমাত্র ভক্ষণকারীর যোগ হয় না, এই প্রকারেই তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে হইবে, কারণ যোগশাস্ত্রে অন্ন পরিমাণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অর্দ্ধ ভাগ ব্যঞ্জন সহিত অন্নের দ্বারা (পূর্ণ করিবে), তৃতীয় ভাগ জলের (দ্বারা পূর্ণ করিবে) এবং বায়ুসঞ্চারণের জন্য চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। এবং অতি-শয় নিদ্রাপর ব্যক্তির যোগ হয় না এবং অতিমাত্র জাগরণকারীরও যোগ হয় না ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যোগিনঃ) যোগঃ দুঃখহা ভবতি ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—যাহার আহার ও ভ্রমণ নিয়তপরিমাণ, যাহার বিহিত কর্ম্মে চেষ্টা নিয়তপরিমাণ, এবং যাহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়ত কালে হয়, সেই যোগীর যোগই দুঃখহর হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য।—কথং পুনর্যোগোভবতীত্যুচ্যতে যুক্তাহারবিহারস্য আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ অন্নং, বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য, তথা যুক্তচেষ্টস্য যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্ম্মসু, তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তো-স্বপ্নঃ চ অববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগোভবতি দুঃখহা দুঃখানি সর্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্যোগো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কি প্রকারে যোগ হয় তাহাই বলা হইতেছে; "যুক্তাহার-বিহার" যাহা আহৃত (অর্থাৎ ভক্ষিত হয়) তাহার নাম আহার, অন্নই আহার শব্দের অর্থ); বিহার শব্দের অর্থ বিহরণ (অর্থাৎ) পাদবিক্ষেপ এই দুইটী বস্তু যাহার যুক্ত অর্থাৎ নিয়তপরিমাণ হয় (সেই যুক্তাহারবিহার) কর্ম্মে যুক্তচেষ্ট যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত যাহার চেষ্টা (সেই যুক্তচেষ্ট); "যুক্তস্বপ্নাববোধ" স্বপ্ন (নিদ্রা), অববোধ (জাগরণ), সেই স্বপ্ন ও অববোধ যাহার যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত-কালভাবী হয় (তাহার নাম যুক্তস্বপ্নাববোধ); সেই যুক্তাহারবিহার, কর্ম্ম-নিচয়ে যুক্তচেষ্ট এবং যুক্তস্বপ্নাববোধ যোগীর যোগ দুঃখহা হয়; সকল প্রকার দুঃখকে যে হনন করে, তাহারই নাম দুঃখহা (অর্থাৎ তাহারই) যোগ সকল সংসার দুঃখের ক্ষয়কারী হয় ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোযুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—যদা (যোগিনঃ) বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, (যদা চ (যোগী) সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (ভবতি) তদা (স) যুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—যে কালে যোগীর সংযত চিত্ত নিজের আত্মাতেই স্থিতি লাভ করে, এবং যে সময় যোগী সর্ব্বপ্রকার কাম হইতে নিস্পৃহ হয়, সেই কালে তাহাকে যুক্ত বলা হয় ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—অথাধুনা কদা যুক্তোভবতীত্যুচ্যতে যদা বিনিয়তং বিশেষেণ নিয়তং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—।

76
5
72
5

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(অবতার কথা প্রসঙ্গে)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ঈশানের প্রতি) তুমি কিছু বল না, [illegible] অব-তার মান্‌ছে না।

ঈশান মুখুয্যে। মহাশয়! কি আর বিচার করবো। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, সঙ্গত কথা বল্‌বে না?

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) অহঙ্কারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন সূর্য্য-লোক, চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখলে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাহাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে, যে সে তার গাছে বসে রয়েছে। অহঙ্কার চূর্ণ হলে, তবে কাক ভূষণ্ডী জান্‌তে পারিল যে, রামচন্দ্র দেখ্‌তে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁহারই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁহারই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, আবার জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

(Limited powers of the conditioned.)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত। তিনিই স্বরাট্, তিনিই বিরাট্। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা, যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকীলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যে টুকু ভাল, সে টুকু বিশ্বাস করলুম। ধরা দিলেই চুকে

যায়, আর কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথম দেখ, বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হলো। এতো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নহে।

গিরীশ ঘোষ। মহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার। তারপর, দেখ সীতা-বর্জ্জন।

গিরীশ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বর পারেন, মানুষ পারে না।

(Science, না মহাপুরুষের বাক্য)

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই আপনি বল্লেন, যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন, তিনি নিরাকার। এই বল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর Science এ (ইংরাজি বিজ্ঞান শাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)

"একটা গল্প শোন। একজন এসে বল্লে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে বল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজ খানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে, যে বাড়ী ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, ওহে, ও তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই। ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ঈশ্বর মানতে হবে। আপনাকে মানুষ মানতে দেব না। আপনাকে বলতে হবে, either Demon or God.

(সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হলে, ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর বিষয় বুদ্ধি থেকে অনেক দূর। বিষয় বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে;—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার; মানের অহঙ্কার, এই সব। (ভক্তদের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয় কি বলেন? কুকুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কি কখন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল। একদিন ওখানে (রাসমণীর কালীবাড়ীতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হ্যাঁগা, অতিথ কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক, পাতা, খোসা, ভূষী, জাব, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়, সে গরু হুড়্ হুড়্ করে দুধ দেয়।

"বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, ও তোর দাদা হয়; বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা বলেছেন, জু জু আছে; তো ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জু জু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

ডাক্তার। (ভক্তদের প্রতি) গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাবলুম, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ, আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হল। শেষে বার হাজার টাকা খরচ। (সকলের হাস্য)।

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাক্ পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে ৭ মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—খুঙড়ী কাশি (Whooping cough)। আমি দেখতে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পাল্লুম, গাধা ভিজে ছিল; যে গাধার দুধ সেই মেয়েটী খেত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) কি বলো গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হয়েছে! (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (হাসিতে হাসিতে) জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তাই ডাক্তারেরা পরামর্শ করে, জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (Blister) লাগিয়ে দিল (সকলের হাস্য)।

* * * * * *

(সাধুসঙ্গ ও ভোগ বিলাস ত্যাগ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ

লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কত্তে হয়। শুধু শুনলে কি হবে ? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা কত্তে হবে। পথ্যের দরকার।

ডাক্তার। পথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কিনা, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে! ঔষধ না খেলে, কেমন করে ভাল হবে ? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও', সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না, সে আচার্য্য অধম, যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশ গুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি, উত্তম আচার্য্য।

(স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী ; সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার তেঁতুল। মনে কল্লে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না। কিন্তু এ কথা তোমাদের পক্ষে নয়, এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। তোমরা সংসারী লোক, তোমরা যতদূর পার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে চিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে। ২। ১টী ছেলে হলে স্ত্রীপুরুষ দুই জনে ভাই বোনের মত থাকবে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে-পুলে না হয়।

একজন ভক্ত। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন, কই, রোগীদের চিকিৎসা কতে যাবেন না ?

ডাক্তার। আর ডাক্তারি আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) দেখ, কর্ম্মনাশা বলে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহা বিপদ। ডুব দিলে সব কর্ম্ম নাশ হয়ে যায়, সে আর কোন কর্ম্ম করতে পারে না (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার। (মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর ; তাহলে আমি তোমাদের।

(অহৈতুকী ভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তা হলে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহ-সুখ, এসব কিছুই চাই না। এই বার যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে থাকে দেখেছি, ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকরী করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও, এই সব।

* * * * *

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তোমার যে অসুখ হয়েছে,লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসবো, আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল করে দাও, দেখ, তাঁর নাম গুণ কত্তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান কল্লেই হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝালে, কখন ঝোলে, কখন অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম-গুণ গান করি, কখন বা তাঁর নাম করে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

(অবতার না মানিলে কি দোষ আছে ?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তা ক্ষতি কি ? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা, আর শরণাগত হওয়া, এই দুটী দরকার। মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। একসের ঘটীতে কি ৪ সের দুধ ধরে ? তবে যে পথেই থাক, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি অন্তর্যামী, সে আন্তরিক ডাক শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে। মিছরীর রুটী সিধে করেই খাও, আর আড়্ করেই খাও, মিষ্ট লাগবে।

"তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।"

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমার কোনও শালা চেলা নাই, আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা সকলেরই মামা" (সভাস্থ সকলের হাস্য)।

দুইটী বন্ধু।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

দুই বন্ধু দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; যাইতে যাইতে একটী সাধুর সঙ্গে রাস্তায় উভয়েরই আলাপ হইল। তিন জনে একত্রিত হইয়া হরিদ্বার কুম্ভ-মেলায় যাত্রা করিলেন। সাধুসঙ্গে উভয় বন্ধু পরম আহ্লাদিত; ধর্ম্ম ও দর্শনের নানা প্রসঙ্গে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হইতে লাগিল। বন্ধুদ্বয়ও নির্ম্মলচিত্ত; সাধুসমাগমে তাহারা আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। একজন বন্ধুর তপস্যায় ভারী ঝোঁক; ঈশ্বর লাভে মহা অনুরাগী, ত্যাগশীল ও প্রশান্তচিত্ত। অন্যজনের শরীরে অসীম বল, বুকে অসীম সাহস; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবোপকার-করণেচ্ছু। সাধুসঙ্গে উভয়ের ভাবই স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতে লাগিল। হরিদ্বারে পঁহুছিয়া এক বন্ধু সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া, সাধন ভজনায় মনোনিবেশ করিলেন। অন্য জনের ঐ সকল ভাল লাগিত না; তিনি হরিদ্বারে সেই সাধুর ভিঁড়ে গিয়া দেখিতেন, কাহার ধুনিতে কাঠ বা কয়লা নাই, কাহার

এখনও খাওয়া হয় নাই; এবং তৎক্ষণাৎ ঐ সকল অভাব যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়া দিতেন। প্রথম বন্ধুর ক্রমে বিবেক বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে লাগিল; তিনি দ্বিতীয় বন্ধুকে বলিলেন, "ভাই, আমি আর দেশে যাইব না; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরলাভের চেষ্টায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব।" ২য় বন্ধু তাহাকে কত বুঝাইলেন; বলিলেন,"অনির্দ্দেশ্য, কাল্পনিক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ জগৎ উপেক্ষা করা তোমার ন্যায় জ্ঞানীর পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয়। চল, ভাই,দেশে ফিরে যাই। তোমার মা বাপ তোমার জন্য শোকে অস্থির হইবেন।" কিন্তু ১ম বন্ধু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; ঘোর তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়া ইষ্ট উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন তাঁহার আর সংবাদ পাওয়া গেল না।

২য় বন্ধুটী বন্ধুবিচ্ছেদে শোকাভিভূত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া সন্ন্যাসী বন্ধুর মা বাপের কি অবস্থা হইল, সংসারী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ২য় বন্ধুটী দেশে আসিয়া একটী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন; স্বচ্ছল আয়ে পারিবারিক অবস্থা উন্নত হইল; কিন্তু তিনি পরোপকার-ব্রতটী এখনও ভুলিয়া যান নাই; উদ্বর্ত্ত টাকা দ্বারা তিনি আশে পাশের গরীব দুঃখীকে সাহায্য করেন; অতিথি অভ্যাগতকে নিরতিশয় যত্নে সেবা করেন। লোকের বিপদে নিজকে বিপদান্বিত মনে করেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র; পরদুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত। এই বন্ধুর ব্যবহারে আশে পাশের লোক তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করে; কিন্তু তাঁহার একটা রোগ এই যে, ঈশ্বরের কথা যেখানে হয়, সেখানে তাহার গতি বিধি নাই; যেন হিরণ্যকশিপু; ঈশ্বরনামে তাহার বড়ই অশ্রদ্ধা। অথচ কাহারও বয়স্থা কন্যার বিবাহের সাহায্য করেন, কাহারও উপনয়ন সংস্কার করাইয়া দেন, গাঁয়ের শব পোড়াইতে যান, দুঃখী জানিয়া অজ্ঞাতসারে জানালা দিয়া হয়ত কখনো টাকা পয়সা ফেলিয়া দিয়া আসেন, যেখানে যাহার কোন বিপদ শোনেন, তখনি উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যান, প্লেগ বসন্ত-রোগীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করেন। মান নাই, অপমান নাই, লোকের কথা গ্রাহ্য করেন না। যাহা ভাল মনে হয়, তাই করেন; এ জীবনে তিনি কাহারও কোন অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। এইরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন।

আমাদের ১ম বন্ধু যোগ ধ্যান তপস্যার প্রভাবে অতীব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, তাঁহার সেই সংসারী বন্ধু

মুমূর্ষু দশাপন্ন ; ধ্যানে এ বিষয় অবগত হইয়া গগনপথে মুহূর্ত্তে তিনি বন্ধুর পাশে উপনীত হইলেন। বলিলেন, "ভাই আমায় চিন ?" ২য় বন্ধু সজলনয়নে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, 'ভাই ! আমি সংসার থেকে চলিয়া যাইতেছি ; কোথায় যাব জানি না ; আমি এখনও বিশ্বাস করি না।' বলিতে বলিতে তাঁহার মহাশ্বাস উপস্থিত হইল। যোগসিদ্ধ বন্ধু দেখিতে লাগিলেন, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী নারায়ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন ; বলিতেছেন—মুখে বা আমায় নাই মানিয়াছিলি ; চল, অদ্য হইতে আমার পার্ষদ হইয়া থাকিবি, আয়।

মানবজীবন—উদ্দেশ্য এবং উন্নতি।

(শ্রীঅটল চন্দ্র নাথ।)

প্রাণীজগতে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি। মানসিক বিকাশ বা অনুশীলন সম্বন্ধে মনুষ্য যতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং করিবে, অপর কোন শ্রেণীর প্রাণীর তাহাতে অধিকার দেখা যায় না। কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে মানব জীবনের পরিতৃপ্তি হয়, কিরূপ উন্নতি মানব জীবনের প্রকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিব, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন, বাল্যকালে ধূলা খেলায়, যৌবনে বিষয় ভোগে, প্রৌঢ়ে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনে, বৃদ্ধাবস্থায় জরাদি রোগে, মৃত্যুর করালগ্রাসে মনুষ্য-জীবন-প্রবাহ অবিশ্রান্ত ধাবমান হইতেছে। আলোকে অন্ধকারে, সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায়, রোগে স্বাস্থ্যে, শোকে হর্ষে, অগণন মানবজীবন স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি ? কি এক অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত বস্তু কামনায় মানব-জীবন-স্রোত অবিরাম সবেগে ছুটিতেছে,—এই হাঁসিতেছে, এই কাঁদিতেছে—কত নিবিড় অরণ্য, কত উত্তপ্ত মরুভূমি, কত হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিতেছে ; কিন্তু বৃথা ছুটাছুটী, বৃথা আশা হইতেছে। আজ বিদ্যালিপ্সায়, ধনলিপ্সায়, মানবজীবন-স্রোত তরঙ্গায়িত। পরক্ষণে সম্ভ্রম লাভ-কামনায়, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় তাহা প্রবল ঝটিকায় উদ্বেলিত। মানব জীবনের পরিতৃপ্তি কোথায় ?

মনুষ্যজীবনের প্রসঙ্গ কিরূপ ভাবে করিতে হইবে দেখা যাউক। প্রথম

আমি কি? একটী জীব। জীব কি প্রকার?

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে॥ পঞ্চদশী।

সকলের অধিষ্ঠানভূত পরমব্রহ্ম চৈতন্য, ইন্দ্রিয়গণ, মনঃ ও প্রাণের সমষ্টি স্বরূপ লিঙ্গশরীর এবং সেই লিঙ্গ শরীরে অবস্থিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস, এই সকলের সমষ্টিকে জীব কহে। সুতরাং আমাতেও চৈতন্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। এখন দেখিতে হইবে, সকলের কারণ এবং সকলের অধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মের সহিত আমার যে সম্পর্ক, তাহা আমি হৃদয়ঙ্গম করি কি না? আমার ইন্দ্রিয়গণ সেই "প্রাণস্য প্রাণম্, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্," চৈতন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত, এ আমি বুঝি কি না। যদি তা না বুঝি, তবে আমার মানব জীবন অজ্ঞানান্ধকারে রহিয়া ব্যর্থ কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। কার্য্যস্বরূপ জীব আমার সহিত কারণস্বরূপ ব্রহ্মের সম্পর্ক অপরোক্ষ ভাবে অনুভূতি করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ইহার নাম আত্মজ্ঞান।

যাঁহারা জগতের কল্যাণে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে ব্রতী, আত্মজ্ঞানই তাঁহাদেরও প্রধান সহায়। জগতের কল্যাণ করিতে হইলে, প্রথমে জগতকে ঠিক ঠিক বুঝিতে হয়। নহিলে, হিত করিতে যাইয়া বিপরীতের উৎপত্তি হয়। জগতকে ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে, প্রথমে নিজেকে ভাল করিয়া বোঝা দরকার, কারণ আমরা নিজেকে দিয়াই অপরকে বুঝি। নিজেকে বোঝা আর আত্মজ্ঞান এক কথা।

শান্ত না হইলে দাস্য ভাবের স্ফুরণ হয় না। যে নিজে শান্ত নয়, তার দ্বারা পরের সেবা অসম্ভব। মানুষ যতদিন "আমি কে?" ইহা জানিতে না পারে, ততদিন তার অশান্তি। আত্মজ্ঞান হইলে সে অশান্তি দূর হয়। তখনই যথার্থ দাস্যভাবের আরম্ভ।

সুতরাং স্বহিত বা পরহিত, দুইদিকেই আত্মজ্ঞান মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা মন। মনের অবস্থার সহিত মানব জীবন অনুস্যূত। মনের ভাব অনুযায়ী মানব জীবন সুখী বা দুঃখী, উন্নত বা অবনত।

সাধারণ কথায় বলে, "যেমন মন, তেমনই ধন।" মন ভাল মন্দ যেমন ভাবনা করে, মানুষ তেমনি ভাল মন্দ থাকে। মানবজীবন উন্নত করিতে হইলে, মনে সর্ব্বদা উচ্চ উচ্চ ভাব ও চিন্তা রাখিতে হয়। কার্য্য চিন্তারই পরিণাম। কিছু দিন সৎ ও উন্নত চিন্তা করিলে, আপনা আপনি সৎকার্য্য করিবার প্রবৃত্তি হয়।

সংসারে যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত এবং পূজ্য, তাঁহারা কাহার আরাধনা করিতেন, তাঁহাদের জীবনের ব্রত কি ছিল, এই সকল সাধু চরিত্র যত্ন এবং ভক্তিসহকারে পাঠ করা উচিত। জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে যাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ আছে, তিনি সর্ব্বদা উন্নত মহাপুরুষের চরিত্রে মনোনিবেশ করিবেন। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদ্বিষয় আলোচনা, সৎসঙ্গে সহবাস, সদ্বিষয় চিন্তা, জীবনের গতি যতই কেন বিমুখে ধাবিত হউক না, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেই।

বিষয়ভোগরত চিত্ত সদা চঞ্চল ; বিষয় মনুষ্যকে ক্ষণিক, পরিণামে যাতনাপ্রদ সুখ প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হয়, কাযেই মন অস্থিরতা সহকারে পুনঃ পুনঃ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। এই অনিত্য বিষয় সংযোগ হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা জীবনের পরা উন্নতি। চঞ্চল বিষয় মানবজীবনে অশান্তি ব্যতীত কখনও শান্তি আনয়ন করে না। কত মহাপুরুষ অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রিয় পরিজন, মহামূল্য ধন রত্ন, পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষতলাশ্রয়ী ভিখারী সাজিতেছেন। বহু অর্থ, অলঙ্কারসুসজ্জিত অট্টালিকা, সুন্দরী স্ত্রী, এ সকল বস্তু প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। ধনসঞ্চয়, ইন্দ্রিয়সেবা, জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যদি ধন জীবের সুখ শান্তি বিধান করিত, তবে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি সুখী হইতেন। যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে সুখ থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-নিরোধার্থে নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র অত প্রয়াস পাইত না।—বুদ্ধদেব পিতার সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, সুন্দরী পরিণীতা পত্নী পরিত্যাগ করিতেন না।

মনের সহিত বিষয় সংযোগের কারণ বিষয়-চিন্তা।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

অনিত্য বিষয়ে আসক্ত মনকে একেবারে ইচ্ছামাত্রেই বিষয় হইতে উঠাইয়া লইবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে বিষয়াসক্তি কেটে যায়।

এক কথায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য—"নামে রুচি, জীবে দয়া।" নামে রুচি অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি, হৃদয়ে সৎভাবের মহান্ আদর্শ (ভগবান্) প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়ত তাঁহার ধ্যান, পূজা ও নাম জপ করা ; জীবে দয়া অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ ভগবানের রূপ জ্ঞানে তৎ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করা।

এ উদ্দেশ্য কোনও গণ্ডির ভিতর বদ্ধ নহে ; উহা বিশ্বব্যাপী। এক জন, দুই জন, বা দশ জনের কল্যাণে যথার্থ মানব হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। যাঁর

অনন্ত জীবকে পরমাত্মার জীবন্ত মূর্ত্তি বোধে আলিঙ্গন করিতে ঐকান্তিক আগ্রহ, তিনিই যথার্থ মানুষ নামার্হ।

সদাশিব।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ।)

সদাশিবের বয়েস পঁচিস বৎসর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পাশ করেছেন। স্বভাব অতি নম্র ও সরল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ঠাকুর-পূজা, সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি আছে, জান্‌বার জন্যে তাঁর আগ্রহ হ'তে লাগ্‌লো। তবে, তিনি অন্ধবিশ্বাসীর ন্যায় যা তা মান্‌তে চাইতেন না। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ বিশ্বাস করে এসেছেন বলে, নিজের গ্রামের বা দেশের লোকে বিশ্বাস করে বলে, অমুক বেদ বা শাস্ত্রে লেখা আছে বলে, তিনি সে সব সত্য বলে বিশ্বাস কর্‌তে বা মান্‌তে চাইতেন না। তিনি বল্‌তেন, যখন আমার নিজের মনবুদ্ধি রয়েছে, তখন নিজে তর্ক বিচার করে যা যথার্থ ও ভাল বুঝ্‌বো, তাই বিশ্বাস কর্‌বো, পরের কথায় সায় দিয়ে যাওয়া দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও অজ্ঞ লোকের কাজ। তাঁর ধারণা ছিল, পরের বুদ্ধিতে স্বর্গে যাওয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধিতে নরকে যাওয়া ভাল।

বেদ, বেদান্ত, গীতা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র ও বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে তিনি বুঝ্‌লেন যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে একটা যথার্থ জিনিষ আছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম যে মিছে শূন্য, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও হলো, যে কেবল বই টই পড়ে পণ্ডিত হলেই ধার্ম্মিক হয় না। ধর্ম্ম আপনার জীবনে প্রত্যক্ষ কর্‌তে হয়। তখন ঠিক কর্‌লেন, অনুসন্ধান করে এমন লোকের কাছে যাবেন, যিনি নিজের জীবনে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং, সেই লোকের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে, ধর্ম্ম জিনিষটা যে কি, তা নিজের জীবনে বুঝবেন। মনে মনে ঐ রূপ ঠিক করে, সদাশিব সংসারাশ্রম ত্যাগ করলেন এবং সন্ন্যাসীবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রকৃত সাধু মহাত্মার অন্বেষণ কর্‌তে লাগলেন।

শিলাপতি একজন সনাতন ধর্ম্মের সন্ন্যাসী। কাশীতে থাকেন।

শিলাপতির লেখা পড়া জানা এক রকম ছিল না বল্লেই হয়। গঙ্গার তীরে একটী ছোট ঘরে থাকৃতেন। সদাশিব নানা স্থান ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কাশীতে এসে একদিন শিলাপতির ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। সদাশিব অনেক জায়গায় অনেক সাধু ভক্ত দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের কারুরই উপর সদাশিবের বিশ্বাস হয় নি। আজ তিন মাস হলো, তিনি কাশীতে এসেছেন। কাশীতেও অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা শুনা হয়েছে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে মনে যে একটা ধারণা আছে যে, ধার্ম্মিক লোকের এই এই রকমের স্বভাব ও লক্ষণ হবে, সমস্ত কাশী ঘুরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও, তিনি সেরূপ স্বভাব ও লক্ষণ সম্পন্ন কোন সাধুই দেখ্‌তে পেলেন না। আজ তাঁহার কাশীতে থাকার শেষ দিন ; কাল সকালে কাশী ছেড়ে অন্যত্র যাবেন। গঙ্গার উপরে, শিলাপতির ঘরের ঠিক সাম্‌নে, এক ঘাটে সদাশিব চুপ করে বসে আছেন এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রধান তীর্থ কাশীতে, যেখানে ধর্ম্মের নামে কত সাধু মহাত্মা রয়েছেন, সেখানেও বিকলমনোরথ হলেন দেখে, হিন্দুধর্ম্ম ও নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে। এমন সময় এক সন্ন্যাসী, বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, সদাশিবের কাছে এসে বস্‌লেন এবং বল্লেন, "এ কাশী বিশ্বনাথের লীলার স্থান। আমি দেখ্‌ছি, তোমার উপর বিশ্বনাথের দয়া হ'য়েছে। তোমাকে নমস্কার।" সদাশিব এই অপরিচিত সাধুর অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবের সম্ভাষণে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন। তার পর দু জনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক-ক্ষণ ধরে কথা বার্ত্তা কহিলেন। শিলাপতির সরল প্রীতিমাখা স্বভাব, সাদা কথায় ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব বোঝান,—সদাশিব যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদিন কেবল কাণে শুনে এসেছিলেন মাত্র, আজ্‌ যেন তা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্ল্লেন। সদাশিব ঠিক কব্‌লেন, এই সাধুটীই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করেছেন ; ইঁহার কাছে থেকে ইঁহার উপদেশে আমি আমার ধর্ম্মজীবন তৈয়ার কর্‌বো।

সদাশিব শিলাপতিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "গুরু কি করে হয় ?" শিলাপতি বল্লেন, "শিষ্য গুরুকে বলে, আমি আপনার শিষ্য, আর গুরু শিষ্যকে বলেন, তুমি আমার শিষ্য, তা হলেই গুরু করা হয়।" সদাশিব দু চার বার ইতস্ততঃ করে শিলাপতিকে বল্লেন, "যদি আমি বলি, আমি আপনার শিষ্য।" শিলা-পতি বল্লেন, "তা হলে, তুমি আমার শিষ্য হবে।" সদাশিব একটু চিন্তা করে, যেন নিজের তত ইচ্ছা না থাকৃলেও, প্রাণের আবেগে বলে ফেল্লেন, "তবে আমি আপনার শিষ্য।" শিলাপতিও হাঁসতে হাঁসতে বল্লেন, "তবে

আমি তোমার গুরু।” সদাশিব ফের জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি আমি এখন আপনাকে ত্যাগ করি।” শিলাপতি বল্লেন, “তা হলে তুমি মহানরকে যাবে।”

প্রায় তিন বৎসর হতে চল্‌লো, শিলাপতি ও সদাশিব কাশীতে এক জায়গায় থাকেন। সদাশিব শিলাপতিকে প্রথম প্রথম অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। শিলাপতিও সদাশিবকে বরাবর সাতিশয় স্নেহ করতেন। মধ্যে মধ্যে সদাশিবের মনে হতাশ আস্‌তো, তখন শিলাপতিকে বল্‌তেন, “কই, এতদিন ধরে সাধন তপস্যা করলাম, কোনও বিশেষ ধর্ম্মরাজ্যের সত্য ত দেখ্‌তে পেলাম না।” শিলাপতি আশ্বাস দিয়ে বল্‌তেন, “ক্রমে হবে, আপ্‌নি আপ্‌নিই সব হবে, উতলা হ'তে নেই।” কাশীতে অনেক মহা মহা পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ আছেন। সদাশিব প্রায়ই তাঁদের সহিত দেখা ও জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিচার কর্ত্তেন। শিলাপতির শাস্ত্রাদি কিছুই পড়া ছিল না, তিনি তর্ক বিচার প্রায় ভালবাস্‌তেন না। সদাশিব যে সকল পণ্ডিত লোকের সহিত দেখা কর্ত্তে যেতেন, তাঁরা সকলেই শিলাপতিকে মূর্খ বলে ঘৃণা করতেন। ক্রমে সদাশিবের মনেও আস্তে আস্তে শিলাপতির উপর একটু বিরক্তির ভাব আস্‌তে লাগ্‌লো। শিলাপতিকে প্রথমে যে চখে তিনি দেখ্‌তেন, এখন আর তাঁর সে ভাব নেই।

বিরক্তি থেকে সন্দেহ, সন্দেহ থেকে ক্রমে পূর্ণ অবিশ্বাস এসে গেল। সদাশিব ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন, শিলাপতিকে গুরু করে তিনি আত্ম-প্রতারিত হয়েছেন। একে ত শিলাপতি লেখা পড়ায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ; তার উপর, তাঁর বাহিরে একরকম কোনও লক্ষণই ছিল না, যাতে সাধারণ লোকে তাঁর অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভাব সহসা বুঝতে পারে। সাত পাঁচ ভেবে, সদাশিব শিলাপতিকে ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা কর্‌লেন ও একদিন শিলাপতিকে স্পষ্ট বল্লেন, “আপনার উপর আর আমার বিশ্বাস বা ভক্তি শ্রদ্ধা নেই; আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাব। আপনি যে বলেছিলেন, গুরুত্যাগ কর্‌লে মহাপাপ হয়, তার কি?” শিলাপতি উত্তরে বল্লেন, “যাবে, উত্তম। গুরুত্যাগ করলে মহাপাপ হয়, তাতে ভয় কি? আমি আছি কি কর্ত্তে?”

সদাশিব কাশী ছেড়ে হরিদ্বারে এলেন। জয়লাল ক্ষেত্রী হরিদ্বারের এক ধনাঢ্য জমীদার। সদাশিব জয়লাল ক্ষেত্রীর বাড়িতে অতিথি হলেন। জয়লাল ক্ষেত্রীর গুরুর নাম ঝণ্ডু দাস। যে সময়ে জয়লাল ক্ষেত্রী ঝণ্ডুদাসকে

গুরুত্বে গ্রহণ করেন, তখন ঝণ্ডুদাস এক জন অতি পবিত্র মহাত্যাগী সাধক ছিলেন। ঝণ্ডুদাসকে গুরু করে জয়লাল তাঁহার জন্য হরিদ্বারে একটী আশ্রম তৈয়ের করে দেন এবং গুরুর ও আশ্রমের খরচ পত্রাদির জন্য মাসে মাসে একশত টাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। কিছুদিন পরে, ঝণ্ডুদাস এক যবনীর মোহে পড়ে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাকে বিবাহ করলেন। সে প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। গুরুর এরূপ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জয়লালের গুরুভক্তি পূর্ব্বের মতনই অচল রহিল। তিনি গুরুর আশ্রমে মস্‌জিদ করে দিলেন এবং যেমন টাকা পূর্ব্বে দিয়ে আস্‌ছিলেন, এখনও সেই রকমই দিতে থাক্‌লেন। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে একদিনও স্বপ্নেও জয়লাল ঝণ্ডুদাসকে ঘৃণা করেন নি। অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তেন, "এক বার গুরু বলে তাঁর কাছে মাথা বিকেয়েছি; তিনি যাই করুন না কেন, আমার মাথা তাঁরই।" সদাশিব এ সব দেখ্‌লেন। সে দিন থেকে তাঁর ভিতর এক মহা তোলপাড় হতে লাগ্‌লো।

সদাশিব হরিদ্বারে একদিনের বেশি থাকতে পারলেন না। হরিদ্বার থেকে হিমালয়ের ভিতর আরও উত্তরে যেতে লাগ্‌লেন। সর্ব্বদাই চিন্তা করেন, শিলাপতিকে ত্যাগ করা তাঁর উচিত, কি অনুচিত হয়েছে। একবার মনে করেন, শাস্ত্র পড়ে ধর্ম্ম কি জিনিষ, তা ত' জেনে নিয়েছি, সাধন তপস্যা সম্বন্ধেও নানা সাধু সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটা কর্ত্তব্য ঠিক করেছি, এখন কেন নিজে নিজে সাধন করে যাই না? শিলাপতিকে ভক্তি করি না করি, তাতে কি আসে যায়? একবার ভাবেন, ভগবান্ ত সকলকার ভিতরই রয়েছেন, শিলাপতির ভিতরে যেমন আছেন, আমার ভিতরেও তেমনি আছেন; ধর্ম্ম মানে ত ভগবান্‌কে জানা; তাঁকে জান্‌বার চেষ্টা কর্‌লিই হলো; মাঝে থেকে শিলাপতিকে ভক্তি করে লাভ কি? তিন বৎসর তাঁকে ভক্তি ও সেবা করেও ত দেখ্‌লাম, তাতে হ'লই বা কি? আবার ভাবেন, লাভালাভ হিসেব করে গুরুভক্তি কর্‌বো, আমি কি হীনবুদ্ধি—জয়লাল ক্ষেত্রীর কথা মনে হলো। আবার ভাবেন, সেই উপনিষদের সময় হ'তে পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ, মহাপুরুষগণ সকলেই একবাক্যে গুরুভক্তি ধর্ম্মজীবনের প্রধান সহায় বল্‌ছেন, তাঁদের সকলেরই কি ভুল? একবার ভাবেন, ভক্তি কর্‌বো কাকে? শিলাপতির শরীরটাকে,—সে শরীর ত আজ আছে, কাল নেই, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে; অথবা, শিলাপতির মনটাকে,—সে মনও ত সর্ব্বদাই

চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। একটা স্থির জিনিষ না পেলে, কাকে ধরে ভক্তি হবে? শরীর বা মনের উপর ভক্তি করা হতেই পারে না। যদি ভক্তি কর্‌তে হয়, তবে শরীর মন ছেড়ে, শরীর ও মনের পার সাক্ষীস্বরূপ, নিত্য, বিকাররহিত, শরীরমনদোষাস্পৃষ্ট চৈতন্যকে; সে চৈতন্য শিলাপতির ভিতরেও যেমন, প্রত্যেক মানুষ, ছাগল, গরু, একটা পাথরের মধ্যেও তেমনি, সে চৈতন্য সকল আধারেই সমভাবে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। তাকে ভক্তি কর্‌তে হলে, যে কোন একটা আধার নিলেই হলো; আর সব আধার ছেড়ে দিয়ে, শিলাপতি-রূপ আধারই যে নিতে হবে, তার মানে কি? আবার ভাবেন, যখন প্রথমে শিলাপতিরূপ আধারকে একবার গুরু বলে নিয়েছি, এবং শিলাপতিকে নিলেও যা, অন্য আর যে কোন একটা আধার নিলেও তা, তখন তাঁকে ছেড়ে গুরু-ত্যাগীই বা হই কেন? শিলাপতির অনেক দোষ দেখ্‌ছি, তাতে আমার কি? সে সব দোষ আধারের, আধারাতীত চৈতন্যের ত নয়। যাই, শিলাপতির কাছে ফের ফিরে যাই। তার ভিতর থেকেই চৈতন্যের অনুভূতি করবো।

একবার বিচার—সন্দেহ; আবার—বিচার—বিশ্বাস; পুনরায় সন্দেহ, তার পর, আবার বিশ্বাস; সদাশিব কিছুই ঠিক কর্‌তে পারেন না। একবার তর্ক বিচার করে ঠিক করেন, শিলাপতির কাছে ফিরে যাওয়াই ঠিক; মনে করেন, এবার যে গুরুভক্তি এসেছে, এ আর ভাঙ্‌বে না। পরক্ষণে সন্দেহ এসে সব বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরে দেয়। শেষে এমনি হয়ে দাঁড়াল যে, নিজে ইচ্ছা না করলেও, এই সন্দেহ, তার পর বিশ্বাস, আবার সন্দেহ, আবার বিশ্বাস, যেন কলের পুতুলের মতন তাঁকে নাচাতে লাগ্‌লো। সন্দেহ আর বিশ্বাস, যেন দুটো ভূত,—একবার একটা তার ঘাড়ে চাপে, সেটা ছেড়ে দিলে, অপরটা এসে ঘাড়ে চাপে। মনে করেন, বিচার ক'রবো না, জোর করে কে যেন তাঁকে বিচার করায়; মনে করেন, বিচার করবো, জোর করে কে যেন সরল বিশ্বাস এনে দিয়ে, বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। সদাশিব মহা চিন্তিত হ'লেন, বুঝলেন মাথার ব্যারাম হয়েছে। হিমালয় ছেড়ে হরিদ্বারে নেমে এলেন ও তথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিন মাস ধরে চিকিৎসিত হ'লেন। কিছুতেই কিছুই হয় না। সন্দেহ, বিশ্বাস,—সন্দেহ, বিশ্বাস,—ব্যারামের ক্রমশঃ বৃদ্ধি বই হ্রাস হলো না। ঘুম একবারে বন্ধ হয়ে গেল। যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে ঠিক করলেন, আর সহ্য হয় না, আত্মহত্যা কর্‌বো।

✱

আত্মহত্যায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে বসে সদাশিব ভাবলেন,একটা শেষ উপায় দেখি, যদি কিছু হয়। এবং মনে মনে বল্‌লেন, "যদি শিলাপতি তুমি আমার গুরু হও, আমাকে এ যাতনা থেকে বাঁচাও।" "যদি শিলাপতি তুমি আমার" বল্‌তে বল্‌তে সদাশিবের বোধ হ'তে লাগ্‌লো, যেন তাঁর বুকের উপর থেকে একখানা ভারি কাল পাথর সরে যাচ্ছে ; তিনি বালকের মত কেঁদে ফেল্লেন। খুব কাদ্‌লেন। শরীর মন সব হাল্‌কা হয়ে গেল। এমন শান্তি, এমন স্ফূর্ত্তি, তাঁর জীবনে আর কখনও হয়েছে কি না,মনে পড়ে না ; কাশীর ঘাটে সে রাত্রে আর একবার এই রকম হয়েছিল। সদাশিব তখনই হরিদ্বার ছেড়ে কাশী যাত্রা কর্লেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে, কখনও পায় হেঁটে, কখনও গাড়িতে, যেখানে যেমন সুবিধা, আস্‌তে লাগ্‌লেন। কাল কাশীতে পৌঁছবেন। সদাশিবের আহ্লাদের সীমা নেই। আজ কাশী পৌঁছিয়েছেন। সেই কাশীর ঘাটে, শিলাপতির ঘরের সাম্‌নে উপস্থিত হলেন। দেখেন, দরোজায় চাবি দেওয়া।

এক মাস হলো শিলাপতির শেষ সমাধি হয়েছে।

সেদিন কাশীতে, এক মৌনী সাধু "শিলাপতি, শিলাপতি, শিলাপতি," এই নাম তিন বার উচ্চারণ করে দেহরক্ষা করেছেন। কাশীর লোকে বলে, তাঁর মত সাধু অনেক দিন কাশীতে দেখা যায় নি। তিনি কারো সঙ্গে কথা কহিতেন না ; কিন্তু যার যে সন্দেহ হতো, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রশ্নের উত্তর জান্‌বার দরকার হতো, তাঁর কাছে গিয়ে সুধু কিছুক্ষণ বসে থাক্‌লেই, সব মীমাংসা হয়ে যেত। এখনও তাঁর নামে কাশীর সকল লোকের চখে জল পড়ে।

প্রাপ্তি স্বীকার।—কলিকাতা বড়বাজার নিবাসী সেখ ফসিউল্লার এক শিশি "গোলাপের নির্য্যাস" পাইয়াছি। নির্য্যাস খাঁটী ও সুন্দর। আমরা বড় এক কুঁজা জলে ২০ ফোঁটা উক্ত নির্য্যাস দিয়া দেখিয়াছি—অতি সুন্দর খোসবো হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, এক বোতল গরমজলে ২ আউন্স নির্য্যাস দিলে, ॥০ দামের এক বোতল গোলাপজল প্রস্তুত হয়। ইহাতে যথার্থই কোনও রূপ প্রতারণা নাই দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইলাম। এই পত্রিকায় ইহাঁদের বিজ্ঞাপন আছে ; সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে এই নির্য্যাস সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। মফঃস্বলে লইয়া যাইবার পক্ষে বড়ই ইহা সুবিধা জনক সন্দেহ নাই।

স্থূলরূপ ধারণ করিতেছে, আবার লয় হইয়া সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিতেছে। আবার ঐ সূক্ষ্মভাব হইতে তাহাদের স্থূলভাবে আগমন—কিছুদিনের জন্য তদবস্থায় অবস্থান, আবার ধীরে ধীরে সেই কারণে গমন। যায় কি? না, রূপ, আকৃতি। সেইরূপটী ভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু উহা আবার আইসে। একভাবে ধরিতে গেলে এই শরীর পর্য্যন্ত অবিনাশী। একভাবে, দেহ সকল এবং রূপসকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি। মনে কর, ৬। ৩। ৯ পড়িল। আমরা আবার ফেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত ফেলিতে ফেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, যখন উহা আবার ৬। ৩.৯ এই ক্রমে পড়িবে। আবার ফেলিতে থাক, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে। আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটী পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এই গুলিই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা বারম্বার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা এক প্রকারের সমবায়—পর মুহূর্ত্তেই উহা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন আবার ঠিক এই সমবায় গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যখন তোমরা এখানে থাকিবে, এই কুঁজা এবং অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারও ঠিক তাহাদের যথাস্থানে থাকিবে, আবার যখন ঠিক এই বিষয়েরই আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনন্ত বার এইরূপ হইবে। স্থূল বাহ্য সম্বন্ধে এইরূপ। তবে আমরা পাইলাম কি? না—এই স্থূল বস্তুগণেরও নানারূপ সমবায় পুনঃ পুনঃ হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটী প্রশ্ন আইসে—অনেকে আপনারা হয়ত এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব হইবে? ভূতকালের কার্য্যের ফল ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক একটাতে বসিতেছে। সেটী আবার ঘুরিয়া আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর এক দল আসিল। ক্ষুদ্রতম জন্তু হইতে উচ্চতম মানব পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক রূপটীই যেন এই এক একটী দল, আর প্রকৃতিই এই বৃহৎ

নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটী ঘর স্বরূপ। এক এক দল নূতন আত্মা উহাদের উপর আরোহণ করিতেছে, এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতেছে ও ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা চলিতেছে—সর্ব্বদাই অপরের জন্য প্রস্তুত আছে। এবং যতদিন শরীর এই চক্রে, এই নাগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন ইহা নিশ্চিতভাবে গণিতের ন্যায় সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, উহা কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মাসম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব। অতএব প্রকৃতির ভূত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতরূপে গণিতের ন্যায় সঠিক ভাবে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা পাইলাম, জড় পরমাণুগণ এখন যে ভাবে সংহত রহিয়াছে, সময় বিশেষে পুনরায় তাহাদের তদ্রূপ সংহতি হইয়া থাকে, অনন্তকাল ধরিয়া জগতের প্রবাহরূপে নিত্যতা চলিয়াছে। কিন্তু উহা আত্মার অমরত্ব হইল না। কোন শক্তিরই নাশ হয় না, জড়েরও কখন নাশ হয় না। তবে উহার কি হয়? উহাদের পরিণাম হয়, নানারূপ পরিণাম হয়, যতদিন না উহা-দের যেখান হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইখানে উহারা পুনরায় ফিরিয়া যায়। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ সরলরেখা অনন্তভাবে বাড়াইলে বৃত্তরূপে পরিণত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না। উহা হইতেই পারে না। প্রত্যেক জিনিষই বৃত্তাকারে ঘুরিয়া আবার উহার উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, আমি, আর এই সকল আত্মাগণ কি? আমরা পূর্ব্বে ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ তত্ত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট্ বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ; উহাই ক্রম-সঙ্কুচিত হইয়াছে। আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ানুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে ফিরিয়া যাইব—ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান্, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতীত পদার্থ বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ—উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য—উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ। ইহাতেও কিন্তু অনেক সংশয় রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই, একথা শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু

বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন, যত রূপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তুমি শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টিমাত্র বল, তবে তোমার আমিত্ব থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে উহাদের কারণীভূত পদার্থে লয় হইবে। আত্মা কোন ভৌতিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির স্রষ্টা, কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্ত্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না, কারণ, উহা চৈতন্যবান্ নহে। মৃত ব্যক্তি অথবা কশাইএর দোকানের একখণ্ড মাংস কখন চৈতন্যবান্ নহে। আমরা 'চৈতন্য' শব্দে কি বুঝি? প্রতিক্রিয়াশক্তি। আর একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটী আলোচনা করা যাক। সম্মুখে এই কুঁজাটী আমি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোক কিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটী চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শরীরবিধানবিদ্গণ যাহাদিগকে অনুভবাত্মক স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। কিন্তু তথাপি তখন পর্য্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্য্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ স্নায়ুকেন্দ্র উহাকে মনের নিকট লইয়া যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে ভাষিতে থাকিবে। একটী সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে। মনে কর, তুমি খুব একাগ্র হইয়া আমার কথা শুনিতেছ, আর একটী মশক তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে এতদূর তন্মনস্ক যে, তুমি ঐ মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? মশকটী তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য কতকগুলি স্নায়ু আছে; ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই বস্তুর চিত্র তথায় রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্যদিকে নিযুক্ত থাকাতে প্রতিক্রিয়া করে নাই, সুতরাং তুমি মশকের কামড় টের পাও নাই। যখন আমাদের সম্মুখে কোন নূতন চিত্র আসে, কিন্তু মন যদি প্রতিক্রিয়া না করে, আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই, উহাদের জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে শুনিতে এবং অনুভব প্রভৃতি করিতে সমর্থ

হইব। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত প্রকাশ আসিয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি,শরীর কখন প্রকাশে সমর্থ নহে, কারণ আমরা দেখিতেছি যে, যখন আমার মনোযোগ ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, একজন ব্যক্তি যে ভাষা কখন শিখে নাই, সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন এক জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা সেই ভাষা কহিত—সেই সংস্কার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সেইগুলি তথায় সঞ্চিত ছিল; তৎপরে কোন কারণে মন প্রতিক্রিয়া করিল—তখনই জ্ঞান আসিল, আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইল। ইহাতেই দেখাইতেছে, কেবল মনই পর্য্যাপ্ত নহে—মন কেবল কাহারো হস্তে যন্ত্রমাত্র। ঐ বালকটীর মনের ভিতর সেই ভাষা গূঢ়ভাবে ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহাতে দেখাইতেছে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—বালকটীর শৈশব অবস্থায় সেই 'আর কেহ' ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল, তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তৎপরে মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তৎপরে এই মনের পশ্চাতে সেই আত্মা। আধুনিক দার্শনিক চিন্তাকে মস্তিষ্কস্থ পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনের সহিত অভেদ বলিয়া মানেন, সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ন্যায় ঘটনাবলির ব্যাখ্যায় অসক্ত; সেই জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ ঐ সকল একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং যতবার শরীরের পরিবর্ত্তন হয়, ততবার উহারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মন উহাঁর হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। বাহিরের চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা ভিতরের মস্তিষ্ককেন্দ্রে লইয়া যায়—কারণ, ইহা তোমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র, ভিতরের যন্ত্র, যথা মস্তিষ্ককেন্দ্র প্রভৃতি, তাহারাই কার্য্য করে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্র সকলকে ইন্দ্রিয় বলে—তাহারাই ঐ ছাপগুলি ভিতরে লইয়া যায়; মন আবার উহাদিগকে বুদ্ধির নিকট এবং বুদ্ধি উহাদিগকে আপন সিংহাসনে অবস্থিত মহামহিমান্বিত রাজার রাজা আত্মাকে উহা প্রদান করে। তিনি তখন দেখিয়া যাহা আবশ্যক, তাহার আদেশ করেন। তখন মন ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির উপর কার্য্য করে, আবার উহারা স্থূল শরীরের উপর

কার্য্য করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদায়ের অনুভবকর্ত্তা, শাস্তা, স্রষ্টা, সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীরও নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন? কারণ, যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই হয় আমাদের দর্শনের বিষয়, নয় আমাদের কল্পনার বিষয়। যে জিনিষ আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না, যাহা ভূতও নহে, শক্তিও নহে, যাহা কার্য্য, কারণ অথবা কার্য্যকারণসম্বন্ধ কিছুই নহে, তাহা যৌগিক বা মিশ্র হইতেই পারে না। অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যন্তই মিশ্র পদার্থের অধিকার—তাহার বাহিরে আর নহে। মিশ্র পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে—নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উহা থাকিতেই পারে না। আরো পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। এই গেলাস একটী যোগোৎপন্ন পদার্থ—ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই কারণগুলির সংহতিস্বরূপ গেলাস নামক যৌগিক পদার্থটী কার্য্যকারণনিয়মের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখা যাইবে—সেখানে সেখানেই যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বাহিরে উহার অস্তিত্বের কথা কহা বাতুলতামাত্র। উহাদের বাহিরে আর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খাটিতে পারে না—আমরা যে জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা অথবা কল্পনা করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতরে কেবল নিয়ম খাটিতে পরে। আমরা আরো দেখিয়াছি যে, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমাদের জগৎ—বাহ্যবস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর ভিতরের বস্তু মানস প্রত্যক্ষ বা কল্পনা কবিতে পারি, অতএব যাহা আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এবং যাহা কল্পনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের জগতের বাহিবে। অতএব কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বহির্দ্দেশে স্বাধীন শাস্তা আত্মা রহিয়াছেন। তাহা হইলেই, তিনি নিয়মের অন্তর্গত, সমুদয়ের নিয়মন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, সুতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব; উহা কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারে না—অথবা কোন কারণের কার্য্য হইতে পারে না। উহার কখন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ, বিনাশ অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের তাহার উপাদানগুলিতে পরিণতি। সুতরাং যাহা কখন সংযোগোৎপন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ কি হইবে? উহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। সুতরাং উহার এইখানেই শেষ হয় না।

এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয় ত ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা ভূত, শক্তি এবং চিন্তারূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া একটী মৌলিক পদার্থ—সুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। এইরূপ উহার জীবনও অসম্ভব। যাহার বিনাশ নাই, তাহার জীবনও অসম্ভব। মৃত্যু কি? না, এ পিট; জীবন তাহারই ও পিট। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। এক জীবনের এক বিশেষরূপকে আমরা জীবন বলি, আবার তাহার অপর রূপবিশেষকে মৃত্যু বলি। যখন তরঙ্গ উচ্চে উঠে, তখন উহাকে বলে—জীবন, আর যখন উহা নামিয়া যায়, তখন বলে—মৃত্যু। যদি কোন কিছু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে তাহা জন্মেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তটী এক্ষণে স্মরণ কর—যে মানবাত্মা সেই সর্ব্বব্যাপিনী জগন্ময়ী শক্তি অথবা ঈশ্বরের অংশমাত্র। আমরা এক্ষণে পাইলাম, উহা জন্ম মৃত্যু উভয়েরই অতীত। তোমার কখন জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কখন হইবে না। জন্ম মৃত্যু কি—কাহারই বা হয়? জন্ম মৃত্যু দেহের—আত্মা ত সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। এ কিরূপ হইল? আমরা এই এখানে এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন, আত্মা সর্ব্বব্যাপী। এইটুকু বুঝ যে,যে জিনিষ নিয়মের বাহিরে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? এই গ্লাসটী সসীম—ইহা সর্ব্বব্যাপী নহে, কারণ, চতুর্দ্দিকস্থ জড়রাশি উহাকে ঐরূপ বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে—উহাকে সর্ব্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চতুর্দ্দিকস্থ সমুদয় বস্তুই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সমুদয় নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? উহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। তুমি জগতের সর্ব্বত্র অবস্থিত রহিয়াছ। তবে আমি জন্মাইলাম, মরিব, এসব কি? এ সকল অজ্ঞানের কথা মাত্র, মাথার ভুল। তুমি কখন জন্মাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জ্জন্মও কখন হইবে না। যাওয়া আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামী মাত্র। তুমি সর্ব্বত্রেই রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া আসার অর্থ কি? উহা কেবল সূক্ষ্ম শরীর—যাহাকে তোমরা মন বল, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রসূত ভ্রমমাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয়, আকাশই

চলিতেছে। অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিতেছে; তোমরা মনে কর যে, চাঁদই এখান হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে। আরও দেখ, যখন রেলগাড়ীতে তোমরা গমন কর, তোমাদের মনে হয়, সম্মুখের গাছপালা ভূমি সব যেন দৌড়িতেছে; যখন নৌকায় চলিতে থাক, তখন মনে হয় যে, জলই চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছও না—তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না, তুমি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সকল কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বাজে কথা মাত্র—তোমরা সকলেই সর্ব্বব্যাপী।

কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে আর এক সোপান অগ্রসর হইতে হইবে। বাড়ীর দিকে অর্দ্ধেক গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—তোমরা দার্শনিক,তোমরা যদি খানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বল, "আর পারি না, ক্ষমা করুন,"তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। তবেই যদি আমরা সমুদয় নিয়মের বাহিরে হইলাম, তখন অবশ্যই আমরা সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যানন্দস্বরূপ; অবশ্যই সকল জ্ঞানই, আমাদের ভিতরে আছে, সর্ব্বপ্রকার শক্তি, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ, আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবশ্যই, তোমরা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী হইলে; কিন্তু এরূপ পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি কোটি সর্ব্বব্যাপী পুরুষ থাকিবে কিরূপে? অবশ্যই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের কি হইল? বাস্তবিক এক জনই আছেন, একটী আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছেন আত্মা। এক পুরুষই আছেন,—যিনি একমাত্র সত্তা, যিনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যুরহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে; সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সত্য প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারও পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। যেখানেই দুই, সেখানেই ভয়, সেখানেই বিপদ্, সেখানেই দ্বন্দ্ব, সেখানেই গোল। যখন সবই এক, তখন কাহাকে ঘৃণা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিব, যখন সবই তিনি, তখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবনসমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত

হইয়া যায়। সিদ্ধি বা পূর্ণতা ইহাই এবং ইহাই ঈশ্বর। যখনই তুমি বহু দেখিতেছ, তখনই বুঝিতে হইবে, তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ। এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরমপদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখ যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের ঈশ্বর—তত্ত্বমসি, আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা,যথা,আমি পুরুষ বা স্ত্রী, দুর্ব্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ, অথবা আমি অমুককে ঘৃণা করি, বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প অথবা আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ভ্রমমাত্র। উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তোমাকে কিসে দুর্ব্বল করিতে পারে? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? তুমিই একমাত্র জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমায় ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাখ, যে কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্ব্বল করে,তাহাই একমাত্র অশুভ। যাহাই মানুষকে দুর্ব্বল করে,যাহাই তাহাকে ভীত করে, তাহাই একমাত্র অশুভ; তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি শত শত সূর্য্য জগতে পতিত হয়, যদি কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমিই জগতের আত্মা ঈশ্বর। শিবোঽহং শিবোঽহং,—বল আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ; যেমন সিংহ পাতালতানির্ম্মিত ক্ষুদ্র খাঁচা ভগ্ন করিয়া ফেলে,সেইরূপ এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল ও অনন্ত কালের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে। কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম, আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না, তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্ব্বোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে, তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা হুতাশ কর। এরূপ উপদেশ-দাতাগণের এরূপ উপদেশদানে নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুষ্টামিই প্রকাশ পায়। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। ঈশ্বর না দেখিয়া মানুষ দেখিতেছ? অতএব, যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ, তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের কিছু উপকার যদি কর, তাহা

সংযতমেকাগ্রতাপন্নং চিত্তং বাহ্যং হিত্বা আত্মন্যেব কেবলে অবতিষ্ঠতে স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এক্ষণে কোন্ সময়ে (যোগী) যুক্ত হয়, তাহা বলা হইতেছে; যে সময়ে বিনিয়ত (অর্থাৎ) বিশেষরূপ নিয়ত, সংযত, একাগ্রতাপন্ন চিত্ত, বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ আত্মাতেই অবস্থিত হয় (অর্থাৎ) স্থিরতা লাভ করে। সকল কাম হইতে (যে সময় যোগী) নিস্পৃহ হয়, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় হইতে যাহার "স্পৃহা" তৃষ্ণা নির্গত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বকাম হইতে নিস্পৃহ, সেই যোগী সেই সময়ে "যুক্ত" সমাহিত (বলিয়া) কথিত হয় ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—নিবাতস্থঃ দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে যতচিত্তস্য আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—নির্ব্বাতদেশে দীপ যেমন বিচলিত হয় না, প্রযতচিত্ত আত্ম-সমাধিপর যোগীর চিত্তের সেই উপমা শাস্ত্রে স্মৃত থাকে ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য।—তস্য যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমা উচ্যতে। যথা দীপঃ প্রদীপঃ নিবাতস্থো নিবাতে বাতবর্জ্জিতে দেশে স্থিতো নেঙ্গতে ন চলতি, সোপমা উপমীয়তেঽনয়া ইত্যুপমা যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ স্মৃতা চিন্তিতা। যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগমনুতিষ্ঠত আত্মনঃ সমাধি-মনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যোগীর যে সমাহিত চিত্ত, তাহার উপমা বলা হই-তেছে। নিবাত (অর্থাৎ) বায়ুবর্জ্জিত দেশে অবস্থিত দীপ, যেমন বিচলিত হয় না, তাহাই উপমাস্বরূপে, যোগজ্ঞ (অর্থাৎ) চিত্তপ্রচারদর্শীগণ কর্ত্তৃক স্মৃত (অর্থাৎ) চিন্তিত হইয়া থাকে; যাহার দ্বারা উপমিত হয়, তাহাই এ স্থলে উপমা শব্দের অর্থ। (উপমেয় কি? তাহাই প্রদর্শন করা হইতেছে যে) যতচিত্ত, (অর্থাৎ) সংযতান্তঃকরণ এবং আত্মার সমাধির অনুষ্ঠাতা যোগীর (চিত্তই উপমেয় ইহাই তাৎপর্য্য) ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০॥

অন্বয়।—যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং যত্র উপরমতে, যত্র আত্মনি আত্মানং আত্মনা পশ্যন্ তুষ্যতি এব। ২০॥

মূলানুবাদ।—যোগ সেবা দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় উপরতি লাভ করে এবং যে অবস্থায় আত্মাকে আপনিই দর্শন করিয়া যোগী আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়॥ ২০॥

ভাষ্য।—এবং যোগাভ্যাসবলাৎ একাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ যত্র যস্মিন্ কালে উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি, নিরুদ্ধং সর্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন। যত্র চৈব যস্মিংশ্চকালে আত্মনা সমাধিপরিশুদ্ধেন অন্তঃকরণেন আত্মানং পরং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপং পশ্যন্ উপলভমানঃ স্বে এব আত্মনি তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার যোগাভ্যাসবলে একাগ্রীভূত (অতএব) নিবাত-দীপ সদৃশ হইয়া চিত্ত, যে কালে যোগসেবা (অর্থাৎ) যোগানুষ্ঠানের দ্বারা অন্য সকল বিষয়ে নিবারিতপ্রচার হইবে, এবং যে কালে সমাধিবিশুদ্ধ অন্তঃ-করণের দ্বারা সেই চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে পাইয়া নিজের আত্মাতেই পরিতোষ লাভ করে॥ ২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

অন্বয়।—যত্র, বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ং আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি, (যত্র চ) স্থিতঃ অয়ং তত্ত্বতঃ ন চলতি॥ ২১॥

মূলানুবাদ।—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, যাহা অনন্ত এবং একমাত্র সমাহিত বুদ্ধি দ্বারা যাহা গ্রাহ্য, সেই সুখকে যে অবস্থায় অনুভব করিতে পারে এবং যে অবস্থায় স্থিত যোগী আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না॥ ২১॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ সুখমাত্যন্তিকমত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকমনন্তমিত্যর্থঃ। যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যৈব ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়-গোচরাতীতমবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ। বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি যত্র যস্মিন্ কালে ন চ এব অয়ং বিদ্বান্ আত্মস্বরূপে স্থিতস্তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও, সুখ (যাহা) "আত্যন্তিক", অন্তকে অতিক্রম করিয়া যাহার সত্তা হয়, তাহার নাম আত্যন্তিক অর্থাৎ অনন্ত। (এবং) যে সেই (সুখ) বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বুদ্ধি দ্বারা যাহার অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাই বুদ্ধিগ্রাহ্য, অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ের সমাগম হইতে যাহা উৎপন্ন হয় না, সেই এই প্রকার সুখ যে সময় অনুভব করিতে পারে, এবং যে কালে এই আত্মস্বরূপে অবস্থিত বিদ্বান্ সেই আত্মতত্ত্বস্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না, ইহাই অর্থ॥ ২১॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২॥

অন্বয়।—যং লব্ধ্বা অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে॥ ২২॥

মূলানুবাদ।—যাহাকে লাভ করিয়া, অন্য কোন লাভকেই তাহা হইতে অধিক বলিয়া বোধ করে না, যাহাতে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ দ্বারাও (যোগী) বিচালিত হয় না॥ ২২॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ যং লব্ধ্বা যং আত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চ অপরমন্যল্লাভান্তরং ততোঽধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি। কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাঽপি ন বিচাল্যতে॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও, যাহাকে লাভ করিয়া (অর্থাৎ) যে আত্মলাভকে প্রাপ্ত হইয়া, অন্য (অর্থাৎ) লাভান্তরকে এই লাভ হইতে অধিক বলিয়া চিন্তা করে না, আরও যে আত্মতত্ত্বে অবস্থিত (ব্যক্তি) শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণ মহা দুঃখের দ্বারাও বিচালিত হয় না॥ ২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা॥ ২৩॥

অন্বয়।—তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। অনির্ব্বিণ্নচেতসা স যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ॥ ২৩॥

মূলানুবাদ।—সেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগকেই যোগ বলিয়া জানিবে, নির্ব্বেদশূন্যচিত্ত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে সেই যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ২৩॥

ভাষ্য।—যত্রোপরমতে চিত্তমিত্যাদ্যারভ্য যাবদ্ভির্বিশেষণৈর্বিশিষ্ট আত্মা-

বস্থাবিশেষঃ যোগ উক্তঃ তং বিদ্যাদ্ বিজানীয়াদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগস্তেন বিয়োগস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ ইত্যেব-সংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বারম্ভেণ যোগস্য কর্ত্তব্যতোচ্যতে, নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োর্যোগসাধনতাবিধানার্থং। স চ যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়েন অধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা ন নির্ব্বিণ্ণমনির্ব্বিণ্ণং কিং তৎ? চেতঃ। তেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেন ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"যত্রোপরমতে" (যেখানে চিত্ত উপরত হয়) ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যাবদ্ বিশেষণের দ্বারা বিলক্ষণ আত্মাবস্থা-বিশেষকে যোগ বলা হইয়াছে, সেই যোগকে "দুঃখসংযোগবিয়োগ" বলিয়া জানিবে; দুঃখের সহিত সংযোগ দুঃখসংযোগ, তাহার সহিত (অর্থাৎ দুঃখ-সংযোগের সহিত) বিয়োগই দুঃখসংযোগবিয়োগ, সেই দুঃখসংযোগ-বিয়োগকেই যোগ এই সংজ্ঞাযুক্ত বলিয়া বিপরীত লক্ষণার সাহায্যে জানিবে। যোগের ফল কথন প্রস্তাব শেষ পূর্ব্বক আবার আরম্ভ করিয়া যোগের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, নিশ্চয় ও নির্ব্বেদাভাব এই দুইটী বস্তুতে যোগের সাধনতা আছে, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য (এই পুনরারম্ভ করা হইয়াছে)। সেই যথোক্তফলসম্পন্ন যোগ, নিশ্চয় (অর্থাৎ) অধ্যবসায়ের সহিত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। (এবং সেই যোগের অনুষ্ঠান) অনির্ব্বিণ্ণচেতঃ (দ্বারা করিতে হইবে); নির্ব্বেদ (নৈরাশ্য) যাহার আছে, তাহাকে নির্ব্বিণ্ণ কহে, যে নির্ব্বিণ্ণ নহে, তাহার নাম অনির্ব্বিণ্ণ, কে সে? চেতঃ, (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ, যে চিত্ত অনির্ব্বিণ্ণ, তাহাকেই অনির্ব্বিণ্ণচেতঃ বলা যায়, ইহাই অর্থ॥ ২৩॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪॥

অন্বয়।—সর্ব্বান্ সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা মনসৈব ইন্দ্রিয়-গ্রামং সমন্ততো বিনিয়ম্য॥ ২৪॥

মূলানুবাদ।—সংকল্পপ্রসূত সকল কামকে অশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকলপ্রকারে নিয়মিত করিয়া॥ ২৪॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ সংকল্পপ্রভবান্ সংকল্পঃ প্রভবোযেষাং কামানাং তে সঙ্কল্প-

প্রভবাঃ কামাস্তান্ ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বান্ অশেষতো নির্লেপেন। কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইন্দ্রিয়গ্রামং ইন্দ্রিয়সমুদায়ং বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা সমন্ততঃ সমস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আরও সংকল্পই যাহাদিগের উৎপত্তিহেতু, সেই সংকল্প-প্রভব কামসকলকে অশেষতঃ (অর্থাৎ) নির্লিপ্তভাবে পরিত্যাগ করিয়া এবং বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিচয়কে সকল বিষয় হইতে নিয়মন করিয়া ॥২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয় ।—ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ। মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিদপি (অন্যৎ) ন চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ ।—ধীরে ধীরে ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে উপরতি অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মাতে অবরুদ্ধ করিয়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করিবে না ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য ।—শনৈঃ শনৈঃ ন সহসা উপরমেৎ উপরতিং কুর্য্যাৎ,কয়া বুদ্ধ্যা কিং-বিশিষ্টয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যেণ যুক্তয়া ইত্যর্থঃ। আত্মসংস্থমাত্মনি সংস্থিতমাত্মৈব ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবং আত্ম-সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ এষ যোগস্য পরমোবিধিঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—শনৈঃ শনৈঃ (অর্থাৎ) সহসা নহে, ধীরে ধীরে উপরতি করিবে, (কাহার সাহায্যে ?) বুদ্ধির দ্বারা ; কি প্রকার বুদ্ধি ? ধৃতিগৃহীতা, ধৃতি শব্দের অর্থ ধৈর্য্য, ধৃতিগৃহীত অর্থাৎ ধৈর্য্যসম্পন্ন। এবং মনকে আত্মসংস্থ অর্থাৎ আত্মাতে সংস্থিত করিয়া ("আত্মাই সর্ব্ব, তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু কিছুই নাই, এই ভাবনাযুক্ত হইলেই মনঃ আত্মসংস্থ হয়"), এই প্রকার আত্মসংস্থ মনঃ করিয়া অন্য কোন বস্তুর চিন্তা করিবে না, ইহাই যোগীর পরম বিধি ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় ।—চঞ্চলং (অতএব) অস্থিরং মনঃ যতো যতো নিশ্চরতি, ততস্ততঃ নিয়ম্য এতৎ (মনঃ) আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ ।—ক্রিয়াশীল অস্থির মন যে যে বিষয়রূপ নিমিত্তের বশে বিক্ষেপ

প্রাপ্ত হয়, (যোগী) সেই সেই বিষয় হইতে নিয়মিত করিয়া মনকে আত্মাতে বশীভূত করিবে॥ ২৬॥

ভাষ্য।—তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তো যোগী, যতো যতো যস্মাদ্ যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্নিশ্চরতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষান্মনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলং অতএবাস্থিরং ততস্ততস্তস্মাত্তস্মাচ্ছব্দাদেঃ নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তং যাথাত্ম্যনিরূপণেন আভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চ এতন্মন আত্মন্যেব বশং নয়েদ্বশ্যতামাপাদয়েৎ। এবং যোগাভ্যাসবলাদ্যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ॥ ২৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই অবস্থাতে মনকে আত্মসংস্থিত করিতে প্রবৃত্ত যোগী (কি করিবে, তাহাই বলা হইতেছে) যে যে শব্দাদিরূপ নিমিত্তবশে মনঃ নির্গত হইয়া থাকে, (মনঃ কি প্রকার?) স্বভাবদোষনিবন্ধন অত্যন্ত চল, এই জন্য অস্থির। সেই সেই বিষয় হইতে নিয়মিত করিয়া (অর্থাৎ) আত্মার প্রকৃতস্বরূপ নিরূপণ দ্বারা সেই সকল শব্দাদি নিমিত্তকে কল্পিত বস্তু, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া এই মনকে আত্মাতে বশীভূত করিবে। এই প্রকার যোগাভ্যাস বলে যোগীর মনঃ আত্মাতেই শান্তিলাভ করিয়া থাকে॥ ২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭॥

অন্বয়।—প্রশান্তমনসং শান্তরজসং অকল্মষং ব্রহ্মভূতং এনং হি যোগিনং উত্তমং সুখমুপৈতি॥ ২৭॥

মূলানুবাদ।—প্রশান্তচিত্ত শান্তরজোবৃত্তি নিষ্পাপ ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিযুক্ত এই যোগীকে পরমসুখ আশ্রয় করিয়া থাকে (অর্থাৎ এইরূপ যোগী জীবন্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকে)॥ ২৭॥

ভাষ্য।—প্রশান্তমনসং প্রশান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনাস্তং প্রশান্তমনসং হি এনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈতি অভ্যুপগচ্ছতি। শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসং ইত্যর্থঃ ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যেবং নিশ্চয়বন্তং ব্রহ্মভূতমকল্মষং অধর্ম্মাদিবর্জ্জিতম্॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—"প্রশান্তমনাঃ", যাহার মনঃ প্রকৃষ্টরূপে শান্ত, সেই প্রশান্তমনাঃ, সেই প্রশান্তমনা এই যোগীকে "উত্তম" নিরতিশয় সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে। (সেই যোগীর বিশেষণ প্রদর্শন করিতেছেন যে) "শান্তরজাঃ", যাহার মোহাদি ক্লেশরূপ রজোবৃত্তি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে শান্তরজাঃ কহা

যায়। "ব্রহ্মভূত", জীবন্মুক্ত, সকল বস্তুই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় যাহার আছে, সেই ব্রহ্মভূত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "অকল্মষ" অধর্ম্মাদিবর্জ্জিত॥ ২৭॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮॥

অন্বয়।—(অনেন প্রকারেণ) সদা আত্মানং যুঞ্জন্ যোগী বিগতকল্মষঃ (সন্) সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮॥

মূলানুবাদ।—এই প্রকারে আত্মসমাধিনিরত যোগী বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে, ব্রহ্মসংস্থ নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া থাকে॥ ২৮॥

ভাষ্য।—যুঞ্জন্ এবং যথোক্তক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়বর্জ্জিতঃ সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ বিগতপাপঃ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শং সুখমত্যন্তমন্তমতীত্য বর্ত্তত ইত্যত্যন্তমুৎকৃষ্টং নিরতিশয়ং সুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি॥ ২৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই যথোক্তক্রমে যোগান্তরায়বর্জ্জিত যোগী সর্ব্বদা আত্ম-বিষয়ক যোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিগতকল্মষ (অর্থাৎ) নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শ ও অত্যন্ত সুখলাভ করিয়া থাকে; পরব্রহ্মের সহিত যাহার সম্যক্ সম্বন্ধ আছে, তাহার নাম ব্রহ্মসংস্পর্শসুখ; যাহা অন্তকে অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ যাহা নিরতিশয়, তাহাকেই অত্যন্ত বলা যায়॥ ২৮॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯॥

অন্বয়।—যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সন্) আত্মানং সর্ব্বভূতস্থমীক্ষতে (তথা) সর্ব্বভূতানি আত্মনি (ঈক্ষতে)॥ ২৯॥

মূলানুবাদ।—সমাহিতচেতা (যোগী) সর্ব্ববস্তুতেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে দেখিয়া থাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে প্রতি-ষ্ঠিত দেখিয়া থাকে॥ ২৯॥

ভাষ্য।—ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসারবিচ্ছেদ-কারণং তৎ প্রদর্শ্যতে। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ব্রহ্মাদীনিস্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্ব্বভূতানি আত্মনি একত্বং গতানি ঈক্ষতে পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদি-

স্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সর্ব্বভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে সকল সংসারের বিচ্ছেদকারণ, যোগের ফল যে ব্রহ্মৈকত্ব-জ্ঞান, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। "সর্ব্বভূতস্থ", সকল ভূতেতেই অবস্থিত নিজের আত্মাকে, এবং নিজ আত্মাতে, ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া দর্শন করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে। (কে দেখিয়া থাকে ?) "যোগযুক্তাত্মা" সমাহিতহৃদয়, (এবং) "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ", সর্ব্বত্র (অর্থাৎ) ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যাবৎ বিষম প্রাণিনিচয়ে, "সম" (অর্থাৎ) নির্ব্বিশেষ, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক "দর্শন" জ্ঞান যাহার আছে, সেই সর্ব্বত্র সমদর্শন ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—যঃ সর্ব্বত্র মাং পশ্যতি, ময়ি চ সর্ব্বং পশ্যতি, তস্য অহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকেও আমাতে দেখিয়া থাকে, তাহার নিকটে আমি (কখনই) অদৃষ্ট থাকি না, সেও আমার অদৃষ্ট হয় না ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য।—আত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং সর্ব্বস্য আত্মানং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বং চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি, তস্য এবং আত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহং ঈশ্বরঃ ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ বিদ্বান্ মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষীভবতি, তস্য চ মম একাত্মকত্বাৎ। স্বাত্মা হি নাম আত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি। যস্মা-চ্চাহমেব সর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই আত্মৈকত্বদর্শনের ফল বলা যাইতেছে, আমি বাসুদেব, এবং সকলেরই আত্মা, আমাকে যে ব্যক্তি সকল ভূতে দেখিয়া থাকে এবং সকলের আত্মস্বরূপ আমাতে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলভূতকে দর্শন করিয়া থাকে, সেই আত্মৈকত্বদর্শীর নিকট আমি ঈশ্বর প্রণষ্ট হই না (অর্থাৎ) অদৃশ্য হই না এবং সেই বিদ্বান্ও আমার নিকট (কদাপি) প্রণষ্ট হয় না (অর্থাৎ)

17. SEP. 19

আজ্ঞাপালন।

রোবানের অদ্ভুত আজ্ঞাপালন।

নিউ ইয়র্ক হইতে "দি ফিলিস্‌টাইন" নামক একটী ক্ষুদ্র 'মাসিক' বাহির হয়। উহার গতবর্ষীয় মার্চ মাসের সংখ্যায় সম্পাদক এক অদ্ভুত আজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্তর উপর একটী উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটী পশ্চাত্য-প্রদেশে প্রায় যাবতীয় কার্য্যক্ষেত্রের অধ্যক্ষগণের মন আকর্ষণ করে। প্রবন্ধের নাম "A message to Garcia" অর্থাৎ "গার্শীয়ার নিকট সংবাদ প্রেরণ"।

গার্শীয়া একজন সৈন্যাধ্যক্ষের নাম। গত মার্কিন ও স্পেনের লড়াইএর সময় জেনেরাল গার্শীয়া স্পেনরাজ্যের অন্তর্গত কিউবা নামক দ্বীপে কোন এক ভয়ানক পার্ব্বতীয় জঙ্গলের মধ্যে, অবস্থান করিতেছিলেন--এই মাত্র জন-রব। সেই যে জঙ্গল, দ্বীপের কোন্ স্থানে অবস্থিত, এবং সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বা গার্শীয়া বিচরণ করিতেছিলেন, এবং কি উপায়ে, বা কোন্ পথ দিয়াই বা সেই সমর-কালে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিয়া তথায় যাইতে হয়—এসমস্ত মার্কিন বা স্পেনের কেহ ত জানিতেনই না, কিউবাদ্বীপেরই যে সকলে জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। রেল, ডাঁক, বা তার, কিছুই তথায় নাই।

এখন, কয়েক দিবস ধরিয়া ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময় এক দিন হঠাৎ, মার্কিণ-অধিপতি ম্যাকিনলি সাহেব বলিলেন—"গার্শীয়া যেখানেই থাকুন, তাঁহার নিকট এখনিই এই সংবাদ লইয়া যাইতে হইবে, বড়ই প্রয়োজন; কি হবে—কে যাইতে পারে শীঘ্র বল"। সকলেই ভাবিয়া অস্থির। সে ভয়ঙ্কর কাহারও-না-জানিত স্থানে তৎক্ষণাৎ যাইতে সকলেই নারাজ। মার্কিণ-অধিপতি তৎক্ষণাৎই সেই সংবাদ প্রেরণের জন্য অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন—"রোবান নামে একটী লোক আছে; যদি কেহ যাইতে পারে ত, সেই রোবান্ (Rowan)।—"কে রোবান্—ডাকো তাহাকে"। রোবান্ আসিলেন। যাঁহার বড় আর নাই, এমন যে মার্কিণ-অধিপতি, তাঁহার নিকট আজ কি কার্য্যে যে আহূত হইয়াছেন রোবান তাহা কিছুই জানেন না। ম্যাকিনলি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত; রোবান,

পৌঁছিবা মাত্রই রোবানের হাতে তিনি এক পত্র দিলেন। কেবল মাত্র বলিয়া দিলেন, "গার্শীয়ার হস্তে প্রদান করিবে, এখনই যাইতে হইবে।" [illegible] বাস্, এই পর্যন্ত। এই দুইটা কথা; আর রোবানের সহিত তৃতীয় কথা কহিবার মার্কিণ [illegible] না।

রোবানও বিরক্তি করিলেন না। রোবান জানিতেন না গার্শীয়া কে বা কোথায়। জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে কি ব্যাপার।

অমনি ছুটিলেন। পত্র খানি এক টুকরা পাতলা চামড়ার থলিতে সিলাই করিয়া নিজের বক্ষঃস্থলে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। শুনিলেন গার্শীয়া কিউবা-দ্বীপে, এইমাত্র। তারপর, গার্শীয়া যে কি অবস্থায়, বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে, আছেন; কি উপায়ে যাইতে হইবে; শত্রুগণ কোথায় কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছে; ইত্যাদি সমস্তের সন্ধান কিছুই জানেন না। এক তিলও সময় নষ্ট করিতেছেন না। কেবল চলিতেছেন। পথে যাইতে যাইতে রাস্তায় যাহা কিছু অনুসন্ধান পাইতেছেন, তাহারই উপর মাত্র নির্ভর করিয়া চলিতেছেন।

অবশেষে, চারি দিন অনবরত পরিশ্রমের পর, নিশাকালে, একখানি অনাচ্ছাদিত ছোট নৌকা হইতে, রোবান কিউবাদ্বীপে নামিলেন। নামিয়াই সেই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন, কেহই ঠিক পাইল না; পরে তিন সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া অনবরত পদব্রজে সেই শত্রু-সমাকীর্ণ প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করার পর, একদিন হঠাৎ দ্বীপের অপর সীমান্তে গার্শীয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিজ বক্ষঃস্থলস্থিত অতি যত্নে রক্ষিত সেই পত্র খানি রোবান, গার্শীয়ার হস্তে দিলেন। এই পত্র খানি গার্শীয়াকে দেওয়াতে মার্কিণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কারণ, যতদিন না, মার্কিণ-সৈন্যদল আসিয়া স্যান্টিয়াগো দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ততদিন কম-বেশ বিশ হাজার স্প্যানিশ সৈনাকে স্যান্টিয়াগো হইতে সুদূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইতে হয়।

"ফিলিসটাইন", রোবান বা গার্শীয়ার কথা আর কিছুই বলেন নাই। কেবল, রোবানের অদ্ভুত আজ্ঞাপালন করিবার ক্ষমতা যে কতদূর ছিল; এবং সেই যে গুণ কতদূর প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় তাহাই কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলকার হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "ফিলিসটাইনের" সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। আমেরিকা ও ইয়ুরোপে সেই প্রবন্ধটী এত বিক্রয় হইয়াছিল যে, শুনিলে অবাক্ হইবেন। ৯ মাসের মধ্যে ৭,৫০,০০০

সংস্করণ হইয়া গিয়াছে! এক এক সংস্করণে এক লক্ষ দুই লক্ষ পর্য্যন্তও ছাপা হইয়াছিল!!

যথার্থই,রোবান যে কতদূর কষ্ট সহ্য করিয়া কিউবাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কত শত আপদ বিপদের ভিতর দিয়া গার্শীয়ার নিকট উপনীত হইয়াছিলেন, সে সকল সম্বন্ধে আমাদের জানিবার তত আবশ্যক নাই; কেবল আমাদের কর্ত্তব্য, জগতের আবালবৃদ্ধ যাবতীয় নর নারীকে, এইটুকু স্পষ্টাক্ষরে দেখানো যে, আজ্ঞাপালন কিরূপভাবে ঠিক ঠিক করিতে হয় তাহা রোবানই প্রকৃত বুঝিয়াছিলেন। ম্যাকিন্‌লি চিঠী খানি দিলেন গার্শীয়াকে প্রে·· করিতে, আর রোবানও চিঠিখানি গ্রহণ করিয়াই চলিলেন। রোবান দ্বিরুক্তি করিলেন না, একবারও বুঝিবার জন্য, তাঁহার ইচ্ছাও হইল না যে তাঁহাকে আজ কি ভয়ানক কার্য্য করিতে দেওয়া হইল!!

কিউবা কোথা? গার্শীয়া কে? কিউবার কোন্ স্থানে গার্শীয়া আছেন? কিকি উপায়ে এবং কোনি কোন্ পথ দিয়া তথায় উপস্থিত হইব? শত্রুগণ সে সকল পথ অবরোধ করিয়া নাই ত? আমি একা সে সকল পথ দিয়া যাইতে পারিব কি? সমভিব্যাহারে কোনও প্রকার সৈন্যবল লইয়া যাওয়া আবশ্যক কি? পত্রখানি কতদূর আবশ্যকীয়? আমার শরীরটা আজ খারাপ, দিন দুই পরে রওনা হইলে হয় না ভাল? ডাকে বা আর কাহারও হাত দিয়া পত্র খানি কি পাঠাইতে পারি না? বেশী যদি আবশ্যকীয় হয় ত 'তার' করিয়া দিতে বলিব? পত্র খানি হাতে দিয়া আর কিছুই বলিতে হইবে না? যদি তাঁর না দেখা পাই, আর কাহারও হাতে দিয়া আসিলে ত চলিতে পারে? জবাব আনিতে হইবে কি?—ইত্যাদি কোনও প্রকারের প্রশ্ন বা সন্দেহ বা ভয়, রোবানের অন্তরে প্রবেশ করিল না। প্রবেশ করিল না কেন?

মনে করিবেন না যে, রোবান পাগল ছিলেন; মনে করিবেন না যে, রোবান অবিবেচক অথবা হিতাহিত বা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য ছিলেন, তাই তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই আজ্ঞা প্রাপ্তির সময় কোনও প্রশ্ন করেন নাই। তবে কেন, অতবড় দুরূহ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, কোনও প্রশ্ন, সন্দেহ বা ভয়, রোবনের অন্তরে উদয় হইল না?

—রোবানের অন্তরে, সন্দেহ, ভয়, বা প্রশ্ন উদয় হইতে সমর্থ হইল না। রোবানের হৃদয়ের বলে, রোবানের অন্তর্নিহিত তেজে, সন্দেহ বা ভয় প্রভৃতি সুদূরে পলাইতে পথ পাইল না। আজ্ঞা যে কি মহৎ ব্যাপার তাহা রোবান

বিশেষরূপ বুঝিয়াছিলেন। রোবান বুঝিতেন আজ্ঞা অতি পবিত্র, আজ্ঞার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই অতি ক্ষুদ্র। আজ্ঞা-প্রাপ্তির সময়ে রোবানের আর আর যাবতীয় ইন্দ্রিয়দ্বার যেন বন্ধ হইয়া যাইত, মস্তিষ্ক যেন স্তব্ধ হইয়া যাইত। তিনি যে জড় হইয়া যাইতেন, তাহা নহে। শিকারী যেমন শিকার ধরিবার সময় স্থির ও একাগ্রচিত্ত হইয়া যায়, আজ্ঞাপ্রাপ্তির কালে রোবানও সেইরূপ হইয়া যাইতেন। শিকারের উপর পড়িলেই যেমন শিকারীর আর কোনও জ্ঞান থাকে না, নিজের জীবন রক্ষা পর্যন্তও ভুলিয়া যায়; সেই শীকারকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য যেমন অত্যন্ত তৎপর ও ক্রীয়াশীল হয়; তেমনি, আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রই রোবান কিসে সেই আজ্ঞাপালন করিতে পারিবেন তাহাই লইয়া সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, তাঁহাতে আর তিনি যেন থাকিতেন না, সমস্ত ইন্দ্রিয়-পথ যেন তখন তাঁর, সেই আজ্ঞাপালনের দ্বার স্বরূপ হইয়া যাইত; মস্তিষ্ক তখন কেবল সেই আজ্ঞাপালনেরই উপায় উদ্ভব করিত। আজ্ঞাপ্রাপ্তির পর, সুতরাং, আজ্ঞাপালন ব্যতীত রোবানের অন্তরে আর দ্বিতীয় বস্তু প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। বনমধ্যে, মধুচক্র-অন্বেষক, একটী-মধুমক্ষিকা উড়িয়া যাইতেছে দেখিলেই, যেমন আত্মহারা হইয়া উর্দ্ধদিকে একদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে সেই মক্ষিকাকে দ্রুত অনুসরণ করিতে থাকেন; আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেই রোবান সেই আজ্ঞা পালন করিবার জন্য, যেন তেমনি বা তদপেক্ষাও আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তিনি কখনও আজ্ঞাপালন করিতে অকৃতকার্য্য হন নাই।

আজ্ঞাপালনে তাঁহার তৎপরতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন, এবং তাঁহার সে পবিত্র কার্য্যে সকলেই তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, এরূপ লোককে সাহায্য করিতে বোধ হয় স্বয়ং ভগবান্‌ও ছদ্মবেশে আসিয়া থাকেন।

সকল দেশেই এবং সকল সময়েই কিউবা দ্বীপেরও অভাব নাই, মার্কিণ-পতি ম্যাকিন্‌লী সাহেবরও অভাব নাই, এবং গার্শীয়ারও অভাব নাই; সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা অভাব হইতেছে কেবল—রোবানের।

আজ্ঞাপালনের আবশ্যকতা।

সকল কার্য্যালয়েই, সকল কার্য্যক্ষেত্রেই, কর্ম্মচারিগণের পক্ষে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি কেহ, কোনও কার্য্যালয়ের

অধ্যক্ষ কখনও হইয়া থাকেন, যদি কেহ, কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে কখনও নেতৃত্ব করিয়া থাকেন, যদি কেহ কখনও নিজের অধীনে দশজন মাত্র লোককে লইয়াও কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, অধীনস্থ লোকগণের পক্ষে রীতিমত আজ্ঞাপালন করা কত আবশ্যক। কার্য্যের আবশ্যকীয়তা, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে কার্য্যের সুসম্পন্নতা, এবং কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব, যতদূর পরিমাণে অধিক হইবে, জানিবেন, ততদূর পরিমাণে আজ্ঞাপালনের প্রয়োজনীয়তাও বর্দ্ধিত হইবে; ততদূর পরিমাণে, স্থল বিশেষে এমন কি, যৎক্ষণাৎ-তৎক্ষণাৎ—"কাঁটায়-কাঁটায়", সম্যক্‌ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে, আজ্ঞাপালন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই জন্যই, সৈনিক বিভাগে, আজ্ঞাপালনের এত প্রয়োজনীয়তা এবং এত এত কঠিন নিয়ম। এই জন্যই ধর্ম্মজীবনে, আজ্ঞাপালনের এত আদর, এত গৌরব। এই জন্যই আমাদের গুরুগৃহে, আজ্ঞাপালন করা এত প্রধান কর্ত্তব্য। যেখানে, যে বিভাগে, যে কার্য্যালয়ে, দেখিবেন, আজ্ঞাপালন করার নিয়ম ও পদ্ধতি কম, সেইখানেই জানিবেন, কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা বেশী। যতদূর পরিমাণে উহা কম হইবে, ততদূর পরিমাণেই ইহা বেশী হইবে।

আজকালকার আজ্ঞাপালন!

মনে করুন, আপনারই একটী আফিস আছে। আফিসে আপনার তাঁবে শতাধিক কেরাণী খাটেন; তবু, আপনাকেও হয় ত সমস্ত দিবসই ভূতগত পরিশ্রম করিতে হয়। একদিন অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, কার্য্যের উপর কার্য্য চারিদিক্ হইতে আসিয়া পড়িতেছে; এক মুহূর্ত্তও, চেয়ার হইতে উঠিবার সময় পাওয়া দূরে থাক, চেয়ারেই পা-মুড়ে বসিবার সময় পাইতেছেন না, এমন সময় হঠাৎ কোনও কার্য্যবশতঃ সম্মুখস্থ একটী কেরাণীবাবুকে তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'যাও ত হে, চট্ ক'রে ইষ্টারণ ট্রেডিং কোম্পানীর গ্রেহাম সাহেবের কাছ থেকে এই জিনিষটার দরটা জেনে এসো ত"। মনিব তখন হাজারই ব্যস্ত থাকুন, কেরাণীবাবু হয় ত, অবাধে বিনা কিছু-না-কিছু প্রশ্ন, এবং সেই সকল নির্ব্বোধ প্রশ্নের দ্বারা মনিবের মাথা একটু-না-একটু গরম না করিয়া, কোনও মতে যাইতে পারিবেন না।

—ইষ্টারণ ট্রেডিং কোম্পানির আফিস কোথা? ফটকে দরওয়ান ঢুকতে দেবে ত? সেখানকার নিয়ম কি?—জুতো টাতো কি বাইরে দরওয়ানের

কাছে রেখে যেতে হয়? গ্রেহাম সাহেবকে ত আমি চিনি না? গ্রেহাম সাহেব কোন্ ঘরে বসেন? গ্রেহাম সাহেবের চেহারা কি রকম? প্রথমে কার্ড পাঠিয়ে দোবো? এখন গেলে গ্রেহাম সাহেবের দেখা পাব ত? যদি না দেখা পাই, জিনিষটা রেখে আসবো কি? যদি না দেখা পাই, তখুনি চলে আসবো ত? যদি না দেখা পাই, খানিকক্ষণ বসবো সেখানে? যদি তাঁর না দেখা পাই, সেখানে আর কাহারও কাছ থেকে দরটা জেনে আসবো কি? যদি না দেখা পাই ত, কি করবো? যদি না দেখা পাই, কখন আসবেন জিজ্ঞাসা ক'রে আসবো? যদি না দেখা পাই, সেখানে কারুকে ব'লে আসবো—এলে আপনার কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দিতে? যদি না দেখা পাই, ব'লে আস্‌বো, এলেই আপনাকে খবর দিতে? গাড়ি ক'রে যাব, না—ট্রামে যাব? অন্য জায়গা থেকে দরটা জেনে এলে হয় না? মুখে জেনে আসবো, না—লিখিয়ে আনবো? আপনি একটু চিঠী লিখে দিলে হয় না? যদি বলেন পরে দর পাঠাব, তা হ'লে কি বলব? যদি বলেন, কে পাঠালে, তা হ'লে কি বলবো? যদি বলেন, কেন দর জিজ্ঞাসা করেছেন; তা হলে কি বলবো? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেরাণী বাবু অত বোকা মানুষ না হইতেন যদি, তাহা হইলে খোদ কর্ত্তাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া, আফিসের অপর কাহারও নিকট হইতে স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে, মনিবের সময় বেশী মূল্যবান্; মনিবের সহিত সকল প্রশ্নোত্তর করিতে নাই, মনিবের আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ বিনা প্রশ্নোত্তরে গ্রহণীয়। যাহা হউক, বড়ই ভালমানুষ বলিয়া কেরাণী বাবু উপরি-উক্ত সহজ সহজ প্রশ্ন করিয়া আপনাকে রেহাই দিয়াছেন; যদি তিনি মাব্বারী ধাতের লোক হইতেন, তাহা হইলে হয়ত অবাধে এই এই রকমের কোন না কোন উত্তর দ্বারা আপনার মাথা আরও গরম করিয়া দিতেন—

আমার হাতে এখন বড় কায র'য়েছে। আমার শরীরটা এখন বড় খারাপ। রোদ্দুরে, মশাই, আমার যেতে বড় কষ্ট হয়। আর কারুকে যদি পাঠান বড় ভাল হয়। আমি কোথাও গেলে, মশাই, বড় কেরাণীবাবু বড়-ব্যাজার হন। একটু বাদে যাচ্ছি। এখন যে আমাদের টিফিনের সময়! অমুককে পাঠান্ ত বড় ভাল হয়। গ্রেহাম সাহেব আমার উপর বড় চটা! আর কোথাও পাঠান্ ত যাই; গ্রেহাম সাহেবের কাছে আমি যেতে পারবো না।

আমাকে এখুনি আজ ছুটী নিয়ে বাড়ি যেতে হবে, বড় দরকার। ইত্যাদি।

আর, কেরাণী বাবু যদি একটু কড়া ধাতের হইতেন, তাহা হইলে ত আর কথাই ছিল না; হয় ত এইরূপ কোন এক তীব্র উত্তরের দ্বারাই মনিবকে চটাইয়া আগুন ক'রে দিতেন—

আমি ত আপনার ব্যায়রা নই। বড় দরকার থাকে, আপনি টেলিফোঁ করতে পারেন। আমি আপনার এ কার্য্যের জন্য মাহিনা খাই না। আজ বলবেন দরটা জেনে এসো, কাল বল্‌বেন বাজারটা ক'রে আনো, পরশু বল্‌বেন তামাকটা সাজো, তারপর দিন বল্‌বেন জুতোটা ঝাড়ো; মশাই, মাফ কর্‌বেন, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে।

এই সকল স্থলে, আপনি নিজে যদি মনিব হইতেন, আপনার সেই কর্ম্মচারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, মনে করিয়া দেখুন। যে সকল আফিসে, বা যে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে, এইরূপ কর্ম্মচারীর দল লইয়া কার্য্য চালাইতে হয়, সে সকল স্থানের কার্য্য ও কত সুসম্পন্ন হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। এমন আফিস বা এমন কার্য্যক্ষেত্র কোনও দেশে নাই, যে আফিস বা যে কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিলে, এইরূপ কর্ম্মচারী এক জনও না বাহির হয়।

আবার হয় ত ইহাও হইতে পারে। বেলা ১১টার সময় কেরাণীবাবুকে আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া পাঠাইয়া দিলেন; বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন—এক্ষুণি আসিবে, দেরী না হয়, বড় আবশ্যক। কেরাণীবাবুর গুণের ঘাট নাই; তিনি সেই বেলা ১১টার সময় বাহির হইয়া সমস্ত দিবস তাঁহার এ-আড্ডা সে-আড্ডা সব ঘুরিয়া, তার পর দিন ১১টার সময় আসিয়া, যেন কতই ব্যস্ততার সহিত, নিজের কার্য্য করিতেছেন। আপনি নিজে হইতে তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন—মশায়, কালকে রাস্তায় যেতে যেতে আপনি কি সব অত কথা বলে দিলেন, সমস্তই ভুলে গেলুম; আজকে আবার ব'লে দিন, আবার যাচ্ছি। আপনি অবাক্ হইয়া মনে করিলেন— বাঃ অদ্ভুত আজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত বটে!!

আজকালকার কর্ম্মচারিগণ!!

আজকাল, সকল দেশেরই কথা বলিতেছি, এমন কর্ম্মচারী, আপনি যথেষ্ট দেখিতে পাইবেন (বিশেষ, নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে) যাহারা

মনিবের ছুঁশো নিন্দা করিয়া থাকেন। মনিব—বড় খীট্‌খীটে, বড় গালাগাল দেয়; মুখ দিয়া রক্ত উঠাইয়া খাটাইয়া লয়; কখনও এক পয়সা বক্সিসের সঙ্গে খোঁজ নাই; কখনও তাঁর মুখ দিয়া একটা মিষ্টি কথা আজও বাহির হইতে দেখিলাম না, মনিবটা চ'লে গেলে বাঁচি। আর! চাকরি করা দায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!! এবার হয় কোন ব্যবসা ক'রবো; না হয়, নিদেন, চাস ক'রব—সেও স্বীকার, তবুও চাকরী আর কা'রো করছি না। এইরূপ নানা প্রকারে অনেকেই মনের মালিন্য ও খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজেদের গায়ে একবারও হাত দিয়া দেখেন না। মনিব কি, সাধ ক'রে খীট খীটে হ'য়ে পড়েন?—না শুধু শুধু গালাগাল দেন? চাস করবার জো কি? মুদীখানার দোকান খোলবার জো কি? যে বুদ্ধির দোষে মনিবের গালাগাল খাইতেছি, সেই বুদ্ধি লইয়াই ত চাস বা মুদীখানার দোকান করিতে যাইব? এখানে মনিবকে মাত্র খীট খীটে ক'রে তুলেছি, সেখানে "গরু মনিষ", ভৃত্য, ও খরিদ দারগণকে পর্য্যন্তও খীটখীটে ক'রে তুলবো!! ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে!!! আজ মনিবকে বরং একগুণ খীটখাটে করেছি, তখন তাঁহাদিগকে হয় ত বিশগুণ আরও খীটখীটে ক'রে তুলবো। তখন এই বুদ্ধি থাকিলে হয় ত ধরাখানাকে সরা দেখবো। সহিশ কখনও ভাল কোচমান হ'তে পারে না; উড়ি কখনও ভাল মাঝী হ'তে পারে না। এবং ভৃত্যও কখন ভাল মনিব হ'তে পারে না।

বেশ জানিবেন, যদি কোন ভৃত্যের ভিতর মনিব হইবার গুণ থাকে, সে কখনও ভৃত্য-গিরিতে অসন্তুষ্ট হইবে না; তার মনিব কখনও খাটখীটে হইতে পারেন না; গালাগালও তাহ'কে কখনও খাইতে হয় না। পাকা ইঞ্জিনীয়ার হ'তে গেলে, আগে লোহা পীটি'তে হয়। পাকা উকিল হ'তে গেলে, আগে উকিলের কেরাণীগিরি করতে হয়। পাকা গুরুগিরি করতে গেলে, আগে শিষ্যগিরি ভাল ক'রে শিখতে হয়। ভাল মনিব যদি হইতে ইচ্ছা করেন, এখন ভাল করিয়া ভৃত্যগিরি শিক্ষা করুন। [ক্রমশঃ]

(আগামী সংখ্যায় ৪১৭শ পৃষ্ঠা দেখুন)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

[শ্রীম—কথিত।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম দর্শন।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। মাষ্টার দেখিলেন, এক ঘর লোকে নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরি কথা বলিতেছেন; ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আসেন।

[কর্ম্মত্যাগ কখন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন, আর সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রামনাম কর্‌লে রোমাঞ্চ হয়,আর অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপ্‌লেই হলো।" আবার বলিলেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার বরাহনগরে এ বাগান ও বাগান বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন; সিধুর * সঙ্গে এ বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এসেছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে তাই এসেছেন। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটী চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন,

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ী।

"আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসব।

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘণ্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে। মাষ্টার, দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, "এটী রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা হয়। আর অনেক অতিথি-কাঙ্গাল আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা সাধুটী কি এখন এর ভিতর আছেন?"

বৃন্দে। হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন। এই মাত্র ধুনা দেওয়া হোলো।

মাষ্টার। ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে। তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার। আচ্ছা ইনি কি খুব বই টই পড়েন?

বৃন্দে। আর বাবা বই টই! সবই ওঁর মুখে!

মাষ্টার সবে পড়া শুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার। আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করছেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে। তোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে বোসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর কেহই নাই। ঠাকুর

রামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ", ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না, ঠিক সে এইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন একেবারে বাহ্য-শূন্য হইতেন। এরই নাম ভাব-সমাধি।

মাষ্টার বলিলেন, আপনি বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করিবেন, তা হলে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না—সন্ধ্যা—এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথা-বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এসো।

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন 'এ সৌম্য কে'— যাঁহার কাছে আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে?—বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো। কাল কি পরশু সকালে আবার আসিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দর্শন।

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে moleskin এর র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা এখানে বসো।

একথা দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত; সেই বারাণ্ডায় তিনি কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ র‍্যাপার; পায়ে চটী জুতা; সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞে, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার। এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওহ্‌ ঈশেনের বাড়ী।

[শ্রীকেশবচন্দ্র সেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁগা, কেশব কেমন আছে? শুনেছিলুম, বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার। আমিও শুনেছিলুম বটে; এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম; বলতুম, মা কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাক্‌লে আমি কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

(মাষ্টারের প্রতি) হাঁগা কুক্‌সাহেব না কি একজন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছল, সেই জাহাজে কুক্‌সাহেবও ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে এই রকম শুনেছিলুম বটে; কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

[গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজ-কর্ম্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাক্‌ব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুর-বাড়ীতে রেখেছে। অনেক গুলি ছেলে পিলে। আমি বকলুম। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ দেখি, ছেলে পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে—মাগছেলেদের আর

একজন খাওয়াচ্ছে, তাদের শ্বশুর বাড়ী ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বক্‌লুম, আর কর্ম্ম কাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

রামকৃষ্ণ (শিহরিয়া, রামলালের প্রতি)। ওরে রামলাল! * যাঃ—বিয়ে করে ফেলেছে!

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ?

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হয়েছে?

মাষ্টারের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল; বলিলেন—আজ্ঞে ছেলে হয়েছে। তখন ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন— যাঃ ছেলে হয়ে গেছে!

মাষ্টার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মাষ্টারের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল, আমি কপাল চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি। তোমার চক্ষু বেশ ছিল। * * * * আচ্ছা, তোমার স্ত্রী কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যা শক্তি?"

[জ্ঞান কাহাকে বলে?]

মাষ্টার। আজ্ঞে ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। সে অজ্ঞান? আর তুমি জ্ঞানী? তোমার জ্ঞান হয়েছে?†

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে

---

* শ্রীযুত রামলাল—ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারী।

† মাষ্টারের বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাইস।

জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল; তখন শুনিলেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর যখন বলিলেন -'তুমি কি জ্ঞানী', তখন মাষ্টারের আবার অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস না 'নিরাকারে' বিশ্বাস ?

(প্রতিমা-পূজা।)

মাষ্টার আবার অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি আবার নিরাকারে বিশ্বাস হয় ? না ঈশ্বর নিরাকার—এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার—এ বিশ্বাস হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিষ, যেমন দুধ, সে কি আবার কালো হতে পারে ?

মাষ্টার (অনেক চিন্তার পর)। আজ্ঞে নিরাকার, আমার এইটী ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটা বিশ্বাস থাক্‌লেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাত ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এই সত্য, আর সব মিথ্যা। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস সেইটীই ধরে থাক্‌বে।

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। একথা ত তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই! মাষ্টারের অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাস্টার। আচ্ছা মহাশয়! তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হইল। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত নন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটী কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আর তাদের প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করা উচিত; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

[Lecture ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক্!

কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, মানুষ জীব জন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায় করেছেন, পালন করবার জন্য মা বাপ করেছেন, মা বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? যদি বোঝাবার দরকার হয়, তিনিই বোঝাবেন। তিনি ত অন্তর্য্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

এইবারে মাষ্টারের অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি যা বলছেন তাতো ঠিক! আমার বোঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি, না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।" কিছু জানি না, শুনি না, পরকে বোঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ সন্দেহ নাই! একি অঙ্ক শাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য, যে পরকে বুঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বলছেন, আমার মনে বেশ লাগছে।"

মাষ্টারের ঠাকুরের সহিত এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটীরই হয়, সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করছেন—যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। আবার কাহারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্‌চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটী যার ভাল লাগে। যেটী যার পেটে সয়।—বুঝলে?"

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

সমূহের মধ্যে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন না।' এখানেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট হইল যে, সসীমবস্তুপূর্ণ বাহ্যজগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা। অনন্তকে অনন্তেই অন্বেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্বর্ত্তী আত্মাই এক মাত্র অনন্তবস্তু। শরীর, মন, যে জগৎপ্রপঞ্চ আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিন্তারাশি, কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলগুলিরই কালে উৎপত্তি এবং কালে বিলয়। যে দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ ঐ সকলগুলিকে দেখিতেছেন, অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, জগতের কারণ স্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে তথায়ই যাইতে হইবে- সেই অনন্ত আত্মাতেই আমরা জগতের কারণকে দেখিতে পাইব। 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি,' কঠ-ঐ। 'যিনি এখানে, তিনিই সেখানে, যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যিনি নানারূপ দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।' সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্য্যগণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যখন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন স্বভাবিকই তাঁহাদের এমন একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে দুঃখ সম্পর্কশূন্য, কেবল সুখ। এই স্থানগুলির নাম হইল স্বর্গ—সেখানে কেবল আনন্দ, শরীর অজর অমর, মনও তদ্রূপ, তাঁহারা সেখানে চিরকাল পিতৃদিগের সহিত বাস করিবেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 'অনন্ত একদেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান', এই বাক্যই যে স্ববিরোধী হইল। কোন স্থানবিশেষের অবশ্যই কালে উৎপত্তি ও স্থিতি, সুতরাং তাঁহাদিগকে অনন্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই সকল স্বর্গনিবাসী দেবগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হয়ত কোন সৎকর্ম্মবশে দেবতা হইয়াছেন; সুতরাং এই দেবত্ব বিভিন্ন পদের নামমাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে।

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উহারা বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে, যিনি পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি আর ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এক্ষণে আর ইন্দ্রত্বপদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়া সেই পদ অধিকার করিয়াছে। এইরূপ সকল দেবতার সম্বন্ধেই। যে সকল মানুষ কর্ম্মবলে দেবত্ব প্রাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইহাঁদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন

ঋগ্বেদে দেবগণ সম্বন্ধে এই 'অমরত্ব' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন ভৌতিক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেই বস্তু যতই সূক্ষ্ম হউক। উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ, আকারের উৎপত্তির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ ব্যতীত আকারের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। আকার নির্ম্মাণ করিবার দেশই একটী বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মায়ার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মত দেশকালে সীমাবদ্ধ, এই ভাবটী উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে,—'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ', 'যাহা এখানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এখানে।' যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম সেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে, আর সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য—বিনাশ ও অবশেষে পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদয় জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পুনঃ সেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন হইবে।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্ব্ব প্রকার সুখের ছায়াস্বরূপ কোন না কোনরূপ দুঃখ রহিয়াছে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্ব্বদা এক সঙ্গেই থাকে, কারণ উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উহারা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্নরূপ, সেই এক বস্তুই জীবন মৃত্যু, দুঃখ সুখ, ভালমন্দ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ এই দুইটী যে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু আর উহারা যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ—একটী ভাল রূপে, অপরটী মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের প্রভেদ বাস্তবিক মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই স্নায়ুপ্রণালী ভাল মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটী বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তবে তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে

না, আবার দুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। এই সুখ দুঃখ কখনই পৃথক্ নয়, উহারা সর্ব্বদাই যেন একত্রে রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখন সুখ, কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে। মাংস ভোজনে ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু যাহার মাংস খাওয়া হয়, তাহার ত ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকেই সমানভাবে সুখ দিয়াছে। কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অসুখী হইতেছে। এইরূপই চলিবে। অতএব স্পষ্টতই দেখা গেল, এই দ্বৈতভাব বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? আমি পূর্ব্ববক্তৃতায় যেমন বলিয়াছি, জগতে এমন অবস্থা কখন আসিতে পারে না, যখন সবই ভাল হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, উহা সত্য, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন না বুঝিতে পারিতেছি, ততদিন আমি কিরূপে উহা বলিব?

আমার এই বাক্যের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত এই এক তর্ক আছে যে, ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি, সব চলিয়া যাইবে,—ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অশুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা আপাততঃ খুব অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটী দোষ আছে তাহা এই যে, উহা শুভ ও অশুভ এই দুইটীর পরিমাণ চির নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতেছে। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে,ধর তাহা যেন ১০০,আবার এইরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর এই অশুভটী ক্রমশঃ কমিতেছে ও কেবল শুভটী অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের ন্যায় অশুভও একটী ক্রমবর্দ্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কথা ধর—সে জঙ্গলে বাস করে, তাহার ভোগ সুখ অতি অল্প, সুতরাং তাহার দুঃখও অল্প। তাহার দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয় বিষয়েই আবদ্ধ। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, তবে সে অসুখী হয়। তাহাকে প্রচুর

খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শীকার করিতে দাও, সে সম্পূর্ণরূপ সুখী হইবে। তাহার সুখ দুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার সুখ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ে যে সুখ পাইত, এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই সুখ পাইতেছে। সে এখন একটী সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদন করে। গণিতের যে কোন সমস্যার মীমাংসায় তাহার জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করে নাই, তাহার স্নায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্থ হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে। একটী খুব সোজা উদাহরণ লও। তিব্বত দেশে বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্ষাও নাই, কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিব্বতীয়েরা নিষ্কলঙ্ক স্বামী ও নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীর বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের সুখ জানে না। কিন্তু তাহারা একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে যে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ভয়ানক অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়, তাহাও জানে না।

* * * * তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই অসুখ। একটী যেন অপরটীর ছায়াস্বরূপ। অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভ চলিয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক যেমন দুঃখ একদিকে কমিতেছে, তেমনিই কি আবার অপর দিকে কোটি গুণ বাড়িতেছে না? বাস্তবিক কথা এই, সুখ যদি যোগখড়ির * নিয়মানুসারে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে দুঃখ গুণখড়ির * নিয়মানুসারে বাড়িতেছে, বলিতে হইবে। ইহার নামই মায়া। ইহা কেবল সুখবাদও নহে, কেবল দুঃখবাদও নহে। বেদান্ত কহেন না যে, জগৎ কেবল দুঃখময়। এরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ সুখে সচ্ছন্দে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। বালকদিগকে এই জগৎ কেবল মধুময়—

(১) যোগখড়ি ও গুণখড়ি। যোগখড়ি যেমন ৩+৫+৭+৯+ইত্যাদি; এখানে এই শ্রেণীটীর মধ্যে প্রত্যেক পরবর্ত্তী অঙ্ক প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক হইতে দুই দুই করিয়া অধিক। গুণখড়ি যেমন ৩+৬+১২+২৪+ইত্যাদি; এখানে প্রত্যেক পরবর্ত্তী অঙ্ক প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কের দ্বিগুণ।

এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল মধু, এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল। আমরা সারা জীবনটাই এই ফুলের স্বপ্ন দেখিতেছি। আবার কোন একজন ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিয়াছে বলিয়া সবই দুঃখময় বলাও তেমনি ভুল। জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ, ভাল মন্দের খেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর এক কথা বলেন। মনে কারও না যে, ভাল মন্দ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু; সেই এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপাদন করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্য্যই এই, এই আপাতভিন্নপ্রতীয়মান বাহ্য জগতে একত্ব বাহির করা। পারসীকদের মত যে, দুইটী দেবতা মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এ মতটী অবশ্য অতি অনুন্নত মনের পরিচায়ক। ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব সুখ বিধান করিতেছেন, আর অসৎ দেবতা সব অসৎ বিষয় বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা ত স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটী করিয়া অংশ থাকিবে,—কখন একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই একত্বের নিয়মই আমাদিগকে আমাদের খাদ্য দিতেছে, আবার তাহাই দৈব দুর্ব্বিপাক দ্বারে অনেক লোককে সংহার করিতেছে। এখন এই মুস্কিল আসিল যে দুজনেই এক সময়ে কার্য্য করিতেছেন আর দুজনেই আপনাদের মধ্যে মিল রাখিতেছেন, একজনের অনিষ্ট করিয়া এবং অপরের উপকার করিয়া। অবশ্য এ মত খুব অশিক্ষিত মানসোদ্ভব সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব উন্নত দর্শনেও ত ঐ কথাই বলিতেছে—জগতের কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও সুতরাং অসম্ভব হইয়া গেল।

অতএব, দেখিতেছি, এই জগৎ কেবল সুখপূর্ণও নহে, দুঃখপূর্ণও নহে। উহা এই উভয়ের মিশ্রণস্বরূপ। ক্রমশঃ আমরা ইহাও দেখিব, সমুদয় দোষ প্রকৃতির ঘাড়ে না চাপাইয়া আমাদের নিজেদের উপর দেওয়া হইতেছে। আবার বেদান্ত আমাদিগকে বিশেষ আশা দিতেছে। বেদান্ত বাস্তবিক অমঙ্গল অস্বীকার করে না। উহা জগতের সমুদয় ঘটনার সর্ব্বাংশ বিশ্লেষণ করে—কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না। উহা একেবারে মানুষকে নিরাশা সাগরে ভাসাইয়া দেয় না। উহা অজ্ঞেয়বাদীও নহে। উহা এই সুখ দুঃখ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু বেদান্তবাদীরা তাহা দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপন

কেবল ছেলের মুখ বন্ধ করিয়া এবং স্পষ্ট অসত্যের দ্বারা তাহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া নহে—বালক যাহা শীঘ্রই বুঝিয়া ফেলিবে। আমার স্মরণ আছে, যখন আমি বালক ছিলাম, কোন যুবকের পিতা মরিয়া গেল, তাহাতে সে অতি দরিদ্র হইয়া গেল, অনেক পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই বাস্তবিক তাহার প্রধান শত্রু। একদিন একজন ধর্ম্মব্যবসায়ী তাহাকে এই সান্ত্বনা দিলেন, 'যাহা হইতেছে সবই মঙ্গল, যাহা কিছু হয় সব ভালর জন্যই হয়।' ইহাই সেই পুরাতন ক্ষতকে সোনার কাপড় দিয়া মুড়িয়া রাখারূপ প্রাচীন উপায়। উহা দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। ছয়মাস বাদে সেই ধর্ম্ম-যাজকের একটী সন্তান হইল, তদুপলক্ষে যে উৎসব হইল, তাহাতে সেই যুবাটী নিমন্ত্রিত হইল। ধর্ম্মযাজকটী ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।' তখন যুবকটী উঠিয়া বলিলেন,'সে কি বলিতেছেন—'তাঁর কৃপা কোথা? এ যে তাঁর ঘোর অভিশাপ।'ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞা-সিলেন, 'সে কিরূপ?' যুবক উত্তর দিল, 'যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও মঙ্গল বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার সন্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গল বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা মহা অমঙ্গল।' এইরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখ নিবারণের উপায়? নিজে ভাল হও এবং যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ কর। জোড়া তাড়া দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে ভব রোগ আরোগ্য হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।

এই জগৎ সর্ব্বদাই ভাল মন্দের মিশ্রণ। যেখানে ভাল দেখিবে, অমনি তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এই সমুদয় বিরোধীভাবের পশ্চাতে বেদান্ত সেই একত্বকে প্রাপ্ত হন। বেদান্ত বলেন, মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকি কি রহিল? বেদান্ত বলেন, শুধু ভাল মন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিষ বাস্তবিক রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা বাস্তবিকই তুমি, যাহা সর্ব্ব প্রকার শুভ ও সর্ব্ব প্রকার অশুভের বাহির—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও—তখন, কেবল তখনই, তুমি পূর্ণসুখবাদী হইতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যক্তভাব

গুলিকে আপনার আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্য বস্তুকে যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে শুভরূপেই হউক, আর অশুভরূপেই হউক, যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজে নিজের প্রভু হইতে হইবে—উঠ, আপনাকে মুক্ত কর, এই সমুদয় নিয়মের রাজ্যের বাহিরে যাও, কারণ, এই নিয়মগুলি প্রকৃতির সর্ব্বাংশ-ব্যাপী নহে, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্যই প্রকাশ করে মাত্র ; প্রথমে নিজে জ্ঞাত হও যে, তুমি প্রকৃতির দাস নহ, কখন ছিলে না, কখন হইবেও না—প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সসীম, উহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র, তুমিই বাস্তবিক সমুদ্রস্বরূপ, তুমি চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বুদ্‌বুদমাত্র। ইহা জানিলে তুমি ভালমন্দ উভয়ই জয় করিবে। তখনই তোমার সমুদয় দৃষ্টি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে, 'মঙ্গল কি সুন্দর এবং অমঙ্গলও কি অদ্ভুত !'

বেদান্ত ইহাই করিতে বলেন। বেদান্ত বলেন না, সোণার পাতে মুড়িয়া ক্ষত স্থান ঢাকিয়া রাখ, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরো অধিক সোণার পাত দিয়া মুড়। এই জীবন এক শক্ত সমস্যা সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বজ্রবৎ দুর্ভেদ্য প্রতীত হয়, তথাপি যদি পার, সাহসপূর্ব্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণ শক্তিমান। বেদান্ত তোমার কর্ম্মফলের জন্য অপর দেবতার উপর দায়িত্ব নিক্ষেপ করেন না, কিন্তু বলেন, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নিয়াতা। তুমিই নিজ কর্ম্মফলে ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চক্ষে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়া লও—আলোক দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃ-স্বরূপ—তুমি পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ। এখন আমরা 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব ? এই মন, যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুর্ব্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হয়, এই মনকেও সবল করা যাইতে পারে—যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের, সেই একত্বের আভাস পায়, এবং তখন উহা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। 'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানু বিধাবতি।' জল উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্ট হইলে যেমন পর্ব্বতসমূহ দিয়া বিকীর্ণভাবে ধাবিত

সর্ব্বদাই সে আমার নিকট বিদ্যমান থাকে, এইজন্য কোন কালেও অদৃষ্ট থাকে না; ইহার কারণ তাহার ও আমার আত্মার ঐক্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ যে আত্মা আত্মার প্রিয়ই হইয়া থাকে, কারণ সর্ব্বাত্মৈক্যদর্শী আমা হইতে ভিন্ন নহে॥ ৩০॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ।—একত্বমাস্থিতঃ যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ময়ি (এব) বর্ত্ততে॥ ৩১॥

মূলানুবাদ।—জীব ও ব্রহ্মের একত্বদর্শী যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করিয়া থাকে, সেই যোগী (এই জগতে) যে কোন অবস্থাতে থাকুক্ না কেন, (প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বদা) সে আমাতেই বিদ্যমান থাকে (অর্থাৎ সে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকে)॥ ৩১॥

ভাষ্য।—ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্দ্ধেন সম্যগ্‌দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষোঽভিধীয়তে, সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানোঽপি সম্যগ্‌দর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত্ততে নিত্যমুক্ত এব সঃ। ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বশ্লোকার্দ্ধে উক্ত সম্যগ্‌ দর্শনের পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া এই শ্লোকটীতে সম্যগ্‌ দর্শনের ফল কীর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্বথা (অর্থাৎ) সর্ব্ব প্রকারে বিদ্যমান থাকিয়াও সেই সম্যগ্‌দর্শী যোগী আমাতে (অর্থাৎ) পরম বৈষ্ণব পদেই বিদ্যমান থাকে, (অর্থাৎ) সে ব্যক্তি নিত্যমুক্তই, তাহার মুক্তিলাভের প্রতি কেহ প্রতিবন্ধ করিতে পারে না॥ ৩১॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! যঃ সর্ব্বত্র আত্মৌপম্যেন সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২॥

মূলানুবাদ।—হে অর্জ্জুন, সকল ভূতেই আত্মার (অভেদনিবন্ধন) ঔপম্য আছে ইহা জানিয়া (পরের) সুখ বা দুঃখ সকল বস্তুকেই (আপনার) সম বলিয়া বুঝিয়া থাকে সেই যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ৩২॥

ভাষ্য।—কিঞ্চান্যৎ আত্মৌপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়তে (অনয়া) ইত্যুপমা তস্যা উপমায়া ভাব ঔপম্যং তেন আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমং তুল্যং পশ্যতি যোহর্জ্জুন স চ কিং সমং পশ্যতীত্যুচ্যতে যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলং, বা শব্দশ্চার্থে যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলং ইত্যেবং আত্মৌপম্যেন সুখ-দুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি ন কস্যচিৎ প্রতি-কূলমাচরত্যহিংসক ইত্যর্থঃ। যএবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টোমতোহভিপ্রেতঃ সর্ব্বযোগিনাম্ মধ্যে ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও কিঞ্চিৎ (এই বিষয়ে বলা যাইতেছে যে) যাহার দ্বারা বস্তু উপমিত হয়, তাহার নাম উপমা; সেই উপমার ধর্ম্মের নাম ঔপম্য; আত্মা নিজেই যাহার দ্বারা উপমিত হয়; তাহার নাম আত্মোপমা; তাহার ধর্ম্মের নাম আত্মৌপম্য; সেই আত্মৌপম্যের সহিত সকল ভূতেতেই যে ব্যক্তি সমত্ব দর্শন করিয়া থাকে; কোন বস্তুকে সম বলিয়া দর্শন করে? তাহাই বলা হইতেছে যে, আমার যেমন সুখ অভিলষিত,সেই প্রকার সকল প্রাণিরই সুখ অভিলষিত। এই শ্লোকে যে 'বা' শব্দ আছে, তাহার অর্থ সমুচ্চয়। এবং যেমন আমার দুঃখ অনিষ্ট (সুতরাং) প্রতিকূল, সেই প্রকার সকল প্রাণিরই দুঃখ অনভিলষিত এবং প্রতিকূল,এই প্রকার আত্মোপমা সহকারে সকল ভূতেতেই অনুকূল ও প্রতিকূল সুখ ও দুঃখকে সমভাবে যে দেখে, হে অর্জ্জুন। যাহারও প্রতিকূলাচরণ না করে অর্থাৎ অহিংসক, এই প্রকার বিশেষণ বিশিষ্ট সেই যোগী সকল যোগীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—হে মধুসূদন, অয়ং যঃ সাম্যেন যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ (মনসঃ) অহং ন পশ্যামি ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি এই যে সাম্য যোগের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে মনের চঞ্চলতাবশতঃ আমি ইহার স্থির মর্য্যাদা দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য।—এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃখসম্পাদ্যতামা-লক্ষ্য শুশ্রূষুর্ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন সমত্বেন

হে মধুসূদন এতস্য যোগস্য অহং ন পশ্যামি নোপলভে চঞ্চলত্বান্মনসঃ কিং স্থিরামচলাং স্থিতিং প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইসম্যাগ্ দর্শনরূপ যথোক্ত যোগ, দুঃখের দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়, ইহা দেখিয়া ইহার নিশ্চিত প্রাপ্তির উপায় শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় (অর্জ্জুন বলিলেন) হে মধুসূদন ! এই যে তুমি সমত্বরূপে (দর্শনরূপ) যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, মনের চঞ্চলতাপ্রযুক্ত আমি, হে মধুসূদন, এই যোগের অচল স্থিতি (মর্য্যাদা) দেখিতে পাইতেছি না, ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ। প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—হে কৃষ্ণ হি (যস্মাৎ) মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ং (চ) অহং তস্য বায়োরিব নিগ্রহং সুদুষ্করং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ (যে কারণ) মনঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপক-প্রবল এবং দৃঢ়, (এই কারণে) আমি বায়ুর ন্যায় তাহার নিগ্রহকে সুদুষ্কর বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য।—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণেতি কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপং ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ। ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ প্রমথনশীলং ; প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি। কিঞ্চ বলবৎ ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যং। কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যং। তস্যৈবং ভূতস্য মনসঃ অহং নিগ্রহং নিরোধং মন্যে বায়োরিব যথা বায়োর্দুষ্করো নিগ্রহস্ততোঽপি মনসো দুষ্করং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—চঞ্চলং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। কারণ মনঃ চঞ্চল, হে কৃষ্ণ ; বিলেখন যাহার অর্থ, সেই কৃষ ধাতু হইতে কৃষ্ণ এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, ভক্তজনের পাপাদিরূপ দোষ সকলের আকর্ষণ করেন বলিয়া (তিনি) কৃষ্ণ (শব্দের প্রতিপাদ্য) ; মন যে কেবল চঞ্চল তাহাই নহে, তাহা প্রমথনশীল, (অর্থাৎ) শরীর ও ইন্দ্রিয় নিচয়কে তাহা বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে অর্থাৎ পরবশ করিয়া দেয়। আরও তাহা বলবৎ, কেহ তাহাকে নিয়মিত করিতে পারে না ; আরও তাহা দৃঢ়, তন্তুনাগের (কচোরজলজন্তুবিশেষ) ন্যায় অচ্ছেদ্য। সেই এই প্রকার মনের নিগ্রহকে আমি বায়ুর (নিগ্রহের ন্যায়) বোধ করিয়া থাকি।

বায়ুর নিগ্রহ যেমন দুষ্কর তাহা হইতেও মনের নিগ্রহ আরও দুষ্কর ইহাই অভিপ্রায় ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (ইতি এতৎ) অসংশয়ং তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় (তৎ) অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে মহাবাহো, মন যে চঞ্চল এবং দুর্নিগ্রহ এই বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই মনকে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য।—এবমেতদ্ যথা ব্রবীষি অসংশয়ং নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চলমিত্যত্র হে মহাবাহো, কিন্তু অভ্যাসেন অভ্যাসোনাম চিত্তভূমৌ কস্যাং চিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য। বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্ বৈতৃষ্ণ্যং তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে। বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্যৈবং তন্মনঃ গৃহ্যতে নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এই প্রকারই, মন যে দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল এই বিষয়ে সংশয় নাই। হে মহাবাহো! কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এই চিত্তের নিরোধ হইতে পারে; যে কোন চিত্তভূমিতে এক জাতীয় বৃত্তির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে অভ্যাস বলা যায়। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসমূহে দোষদর্শননিবন্ধন বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য বলা যায়, সেই প্রচারযুক্ত চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, ইহাই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগোদুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। তু (কিন্তু) যততা (যতমানেন) বশ্যাত্মনা উপায়তঃ (যোগঃ) অবাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ।—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুর্লভ, ইহাই আমার মতি। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রযত্নপরায়ণ সে উপায়ের দ্বারা যোগলাভ করিতে পারে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্য।—যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন অসংযতাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম-

সংযত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসংযতাত্মা তেন অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ দুঃখেন প্রাপ্যতে মে মতিঃ। যস্ত পুনর্বশ্যাত্মা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যতামাপাদিত আত্মা মনো যস্য তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ উপায়তঃ যথোক্তাদুপায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি কিন্তু অসংযতাত্মা, সে ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ অর্থাৎ বিশেষ ক্লেশের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে, ইহাই আমার মতি। আত্মা শব্দের অর্থ (এই স্থলে) অন্তঃকরণ; অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সেই অন্তঃকরণ যাহার বশীকৃত হয় নাই, সেই অসংযতাত্মা। যে বশ্যাত্মা সে পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন করিলে যথোক্ত উপায়ের সাহায্যে যোগলাভ করিতে পারে; (এখানেও) আত্মা এই শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সেই অন্তঃকরণ যাহার বশীভূত হইয়াছে সেই বশ্যাত্মা ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ যোগাৎ চলিতমানসঃ (সন্) যোগসংসিদ্ধিং অপ্রাপ্য হে কৃষ্ণ! কাং গতিং গচ্ছতি? ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—অর্জ্জুন বলিলেন। হে কৃষ্ণ! যাহার যোগমার্গে বিশ্বাস আছে, অথচ তাদৃশ যত্নপরায়ণ নহে, সেই যোগীর মানস (অন্তকালে) যদি যোগ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সুতরাং সে যোগসিদ্ধিও প্রাপ্ত হয় না, এরূপ স্থলে তাহার (দেহান্তে) কীদৃশ গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য।—এবং যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মাণি সংন্যস্তানি যোগসিদ্ধিফলং চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্য (অর্জ্জুন উবাচ), অযতিরপ্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা চ উপেতো যোগমার্গাদন্তকালেঽপি চলিতং মানসং মনো যস্য স চলিতমানসঃ ভ্রষ্টস্মৃতিঃ সোঽপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার যোগাভ্যাসের অঙ্গীকরণ নিবন্ধন পরলোক এবং ইহলোকের সাধন সকল কর্ম্মই সন্ন্যস্ত হইয়াছে, অথচ মোক্ষের সাধন, যোগসিদ্ধির ফল যে সম্যগ্দর্শন তাহাও পাওয়া গেল না, এইরূপ ভাবিয়া যে যোগীর মানস যোগমার্গ হইতে অন্তকালে চালিত হয়, সে ত একেবারে নাশই

পাইল, এই প্রকার শঙ্কা করিয়া (অর্জ্জুন বলিলেন), অযতি (অর্থাৎ) অপ্রযত্নবান্, (অথচ) আস্তিক্যবুদ্ধিরূপ শ্রদ্ধা সম্পন্ন এবং অন্তকালেও যোগ হইতে বিচলিত মানস (অর্থাৎ) ভ্রষ্টস্মৃতি (এই প্রকার যে যোগী) সে "যোগসিদ্ধি" যোগফল সম্যগ্ দর্শন না পাইয়া, হে কৃষ্ণ! কোন গতিকে পাইয়া থাকে ?। ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

অপ্রতিষ্ঠোমহাবাহো বিমূঢ়োব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো ব্রহ্মণঃ পথি অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব বিমূঢ়ঃ সন কচ্চিৎ ন নশ্যতি ? ।। ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় কর্ম্মমার্গে অপ্রতিষ্ঠ এবং মোক্ষপথেও বিমূঢ় সেই ব্যক্তি কি (একেবারে) বিনষ্ট হয় না ? ।। ৩৮ ॥

ভাষ্য।—কচ্চিদিতি কচ্চিৎ কিং ন উভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাদ্ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সংছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠঃ নিরাশ্রয়ঃ হে মহাবাহো বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

ভাষানুবাদ।—কচ্চিদিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। কচ্চিৎ (এই শব্দটী) কিং (এই অর্থে প্রযুক্ত), উভয়বিভ্রষ্ট (অর্থাৎ) জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ হইতে বিভ্রষ্ট (হইয়া) সংছিন্ন মেঘের ন্যায় (সেই যোগী) কি নষ্ট হয়, অথবা নষ্ট হয় না ? (কারণ) অপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ) নিরাশ্রয় এবং ব্রহ্মের পথে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বিষয়ে (সে ব্যক্তি) বিমূঢ় (হয়) ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণচ্ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নহ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—হে কৃষ্ণ মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ (ত্বং) ছেত্তুমর্হসি অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ত্বদন্যঃ ন উপপদ্যতে হি (যস্মাৎ) ॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয়টী তুমিই সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে পার, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার সংশয়ের নিরাকরণ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য।—এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণচ্ছেতুমপনেতুমর্হসি অশেষতঃ

ত্বদন্যস্ত্বত্তোঽস্য ঋষির্দেবো বা চ্ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্য অস্য নহি যস্মাদুপপদ্যতে সম্ভবত্যতস্ত্বমেব চ্ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—এতদিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এই আমার সংশয় হে কৃষ্ণ অশেষরূপে অপনয়ন করিতে (তুমি) সমর্থ হও, যে কারণ তুমি ভিন্ন অন্য কোন ঋষি বা দেব আমার এই সংশয়ের অপনযন করিতে সমর্থ হইবে, ইহা সম্ভব নহে। (অতএব) একা তুমিই এই সংশয়ের অপনয়ন করিতে পার, ইহাই অর্থ॥ ৩৯।

শ্রীভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহনামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০॥

অন্বয়।—হে পার্থ তস্য ইহ নৈব বিনাশঃ বিদ্যতে (তথা) অমুত্র (পরলোকে) নৈব (বিনাশঃ বিদ্যতে) হে তাত! কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি হি (যস্মাৎ)॥ ৪০॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বহিলেন, হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার বিনাশ হইতে পারে না, কারণ হে তাত! বল্যাণের অনুষ্ঠাতা কোন জন (কখনও) দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না॥ ৪০॥

ভাষ্য।—পার্থেতি। হে পার্থ নৈবেহলোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি নাশো নাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ স যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি। ন হি যস্মাৎ কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে তাত! তনোতি আত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে, পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে, শিষ্যোঽপি পুত্র উচ্যতে, গচ্ছতি॥ ৪০॥

ভাষ্যানুবাদ।—পার্থ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হে পার্থ, এই লোকে অথবা পরলোকে তাহার বিনাশ নাই, নাশ শব্দের অর্থ পূর্ব্ব জন্ম হইতে নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্তি, তাহা যোগভ্রষ্টের হয় না, কারণ কল্যাণকৃৎ (অর্থাৎ) শুভকারী (জন) দুর্গতি (অর্থাৎ) কুৎসিতগতি প্রাপ্ত হয় না, হে তাত! আত্মাকে পুত্ররূপে যে পরিণত করে, তাহাকে তাত বলা যায়; পিতাই পুত্র; এই কারণে পুত্রও তাত শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়; শিষ্যকেও পুত্র বলা যায় (এই কারণে তাত শব্দের দ্বারা শিষ্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ সম্বোধন করিয়াছেন)॥ ৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য (তত্র) শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা যোগ-ভ্রষ্টঃ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ।—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন করিয়া (সেই থানে) অনেক বৎসর বাসপূর্ব্বক, পবিত্র অথচ শ্রীমান্‌দিগের গৃহে জন্মলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্য।—কিন্তস্য ভবতি ?। যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ, প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্, তত্র চ উষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীঃ নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরান্ তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার তবে কি হয় ? (এই জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে যে) "যোগমার্গে প্রবৃত্ত সন্ন্যাসী" (এইটুকু না থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা-বশতঃ বুঝা যাইতেছে) (যদি যোগভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে সেই) যোগভ্রষ্ট, পুণ্য-কারী (অর্থাৎ) অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতাদিগের (গন্তব্য) লোকে গমন করিয়া সেখানে নিত্য (অর্থাৎ বহুতর) বৎসর বাস করিয়া, সেই সুখ ভোগের ক্ষয়কালে শুচি (অর্থাৎ) যথোক্তকারী শ্রীমান্ (অর্থাৎ) সম্পত্তিযুক্ত মনুষ্য-গণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—অথবা (সঃ) ধীমতাং যোগিনাং এব কুলে ভবতি (জন্ম লভতে) ঈদৃশং যৎ জন্ম তদেতৎ লোকে দুর্লভতরং ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ।—অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলে (সেই যোগভ্রষ্ট) জন্ম লাভ করিয়া থাকে, মনুষ্য লোকে এই প্রকার যোগীগণের কুলে জন্ম (যোগ ভ্রষ্টগণের) দুর্লভতর ॥ ৪২ ॥

ভাষ্য।—অথেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাম্ কুলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাং। এতদ্ধি জন্ম যদ্ দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে ॥৪২॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। অথবা ধনীদিগের কুল ব্যতি-

১৪৫১৪

আজ্ঞাপালন।

গতসংখ্যা ৩৯২ পৃষ্ঠার পর।]

(আজকালকার কর্ম্মচারিগণ !!)

অনেক দেশের অনেকস্থলে, সময়ে সময়ে পাঁচ-দশজন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য মিলিয়া একটা কর্ম্মচারী বা ভৃত্যসম্প্রদায় গঠিত করেন। গঠিত করিয়া উহাদিগের স্বাধীনতা (স্বেচ্ছাচার) সম্বন্ধে, এবং মনিবগণকে যাহাতে শাসনে রাখা যাইতে পারে-সে সম্বন্ধে, এবং যাহাতে অল্প পরিশ্রমে, অল্প বা বিনা বুদ্ধি খরচে, মনিবের নিকট হইতে বেশী পয়সা আদায় হয়—সে সমস্ত সম্বন্ধে, নানাপ্রকার চর্চ্চা, কথোপকথন এবং উপায় অবলম্বন করেন। এই সকল সম্প্রদায়ের বা এইরূপ প্রকৃতির লোক হয়ত এইরূপ বলিতে পারেন—

ত্রিশটে টাকা বেতন দিয়ে কি মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন? যখন যা হুকুম করবেন, তৎক্ষণাৎ তাই করতে হবে? সমস্ত দিন মুখে রক্ত উঠে খেটেও কি বিরাম নাই? শেষকালে কি ছোটলোকের কায গুলা পর্য্যন্তও করতে হবে?—না যাচ্ছে তাই গালাগাল খেয়েও উহাঁর কাছে কায করতে হবে? যত সহিয়া থাকিব, যত কিছু না বলিব, ততই ত উহাঁরা আস্কারা পাইয়া যাইবেন, এবং আমাদিগের উপর আরও বদিয়াদি করিবেন। দুই চারিদিন মুখের উপর সমান উত্তর করিলেই ঢিড্‌ বনিয়া যাইবেন, আর ওরূপ যখন তখন যা তাই হুকুম চালাইতে পারিবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য।

যে সকল কর্ম্মচারী, কেরানী, বা ভৃত্য সর্ব্বদা এইরূপ মনিবের উপর অসন্তুষ্ট চিত্তে এবং ব্যাগারঠেলা কায করেন, তাঁহারা কখনই জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সমস্ত জীবনই তাঁহাদের এইরূপ অসন্তুষ্টচিত্তে অতিবাহিত হয়; সমস্ত জীবনও যদি তাঁরা মুখ দিয়া রক্ত তুলে খাটেন, তবুও তাঁদের কর্ম্মক্ষয় হয় না। কি করিবেন? তাঁহাদের অদৃষ্টই এইরূপ। যদি একটী মনিবকে তাঁরা জব্দ করিয়া দেন, বা একটী মনিবের নিকট হইতে কায ছাড়িয়া দেন; আবার আর একটী মনিব এমনধারা জুটিবে যে, তখন বলিতে হইবে, "বাবা! আগেকার মনিব বরং ছিল ভাল, আগেকার আফিস বা কায ইহা অপেক্ষা যে শতগুণে ছিল ভাল!" হয়ত সে কায ছাড়িয়া দিয়া আবার আর

একটী নূতন আফিসে বা নূতন মনিবের নিকট প্রবেশ করিলেন, [illegible] দেখেন সেখানেও সেইরূপ পূর্ব্ববৎ, বরং বেশী ত কম নয়; সেইরূপ [illegible] যন্ত্রণা, সেইরূপ আক্ষেপ, সেইরূপ অসন্তোষ, আবার আরম্ভ হইল। লাভে হ'তে—কেবল বদ্‌নাম কেনা। এক জায়গায় টেঁকে থাকতে পারে না, কায ভাল ক'রে করে না, কেবলই মন গরম ক'রে থাকে, মনিবকে মনিব জ্ঞান করে না, ভারি উগ্র মেজাজের লোক, প্রভৃতি রূপ নানা প্রকারের অপযশ বাজারে বেজে উঠে।

এরূপ স্থলে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কি? না—সকল অবস্থায়, সকল মনিবেরই নিকট, মস্তক অবনত করিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে সকল কার্য্যই করা; ঈশ্বর যে কার্য্য তাঁর নিকট প্রেরণ করিবেন, সেই কার্য্যই অতি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর করা কর্ত্তব্য। মনে করা উচিত—নিজ অদৃষ্ট বশতঃই তাঁকে এইরূপ করিতে হইতেছে। কি করিবেন?—ইহা ছাড়া আর তাঁর গতি নাই। লোকে কথায়ই বলে "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।" যদি অদৃষ্ট না মানেন, কিছু ক্ষতি নাই। "অদৃষ্ট" না বলিতে চান; বলুন—কর্ম্মফল। বলুন—এইরূপ জগৎ-সংসারের নিয়ম। যা হয়, একটা নাম দিন। আপনি যে দিক দিয়াই যান, ফলে, সেই একই দাঁড়ায়। যে সহিশী করে, সে চিরকাল সহিশীই করিবে, কোচম্যানী তাহার আর অদৃষ্টে ঘটে কি না সন্দেহ; যে ডাঁড়িগিরি করে, তাহার অদৃষ্টে মাঝিগিরী করা হয় কি না সন্দেহ। যিনি কেরাণী, তাঁকে চিরকালই প্রায় সেই কেরাণীগিরি কার্য্যে জীবন কাটাইতে হয়; যিনি পূজারী, তাঁকে সমস্ত জীবন পূজা করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমরা ভাল করিয়া এইরূপ অনেকানেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি যে, এইরূপ লোকের এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তবে যে, কেহই উন্নতি করিতে পারে না, তাহা নহে। যিনি যে কার্য্য উপস্থিত পাইয়াছেন, সেই কার্য্য তিনি অতি অন্তরের সহিত সম্পন্ন করিতে থাকুন। ঈশ্বর যাঁহাকে যে কার্য্য জুটাইয়া দিয়াছেন সেই কার্য্যই যদি তিনি অতি সন্তোষের সহিত ও অতি ধৈর্য্যের সহিত নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, ঈশ্বরই, এক সময়ে না এক সময়ে, তাঁর প্রতি সদয় হইয়া, মনিবের দ্বারাই হউক, বা অন্য কাহারও দ্বারাই হউক, *তাঁর উন্নতি করাইয়া দিবেনই দিবেন।* যিনি উপস্থিত কার্য্যে অমনোযোগ করিয়া অন্যথা আচরণ করিতে যান, নিশ্চয়ই জানিবেন, তাঁর পক্ষে যে বড় মঙ্গল, তাহা নয়, তাঁর জীবনে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান

ভাঙ্গে”—এই প্রবাদটির সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, যদি কোন ঢেঁকি সরল মনে সকলকারই পদাঘাত অকাতরে সহ্য করিয়া যায়, এমন এক সময় নিশ্চয়ই তার আসিবে, যখন সে সকলকার পদাঘাত খাইতে খাইতে নিজগুণে একবার রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ করিতে পারিবে। তখন সে ঢেঁকি স্বর্ণময় হইয়া যাইবে; আর তাহাকে ঢেঁকির কার্য্য করিতে হইবে না। তখন সকলে সেই ঢেঁকিকেই আবার পূজা করিবে, তখন সেই ঢেঁকির আবার কত আদর বাড়িবে। সময়ে সবই হয়। অধীর হইলে, কোনও কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলে, কিছু ফল হয় না। নিজের কর্ম্মফল নিজ কর্ম্মেরই দ্বারা ক্ষয় করুন। যতদিন না সে কর্ম্মফল নষ্ট হয়, যতদিন আপনি সে কর্ম্মের একটুও মাত্র বাকি রাখিয়া দিবেন, ততদিন আপনার উচ্চতর কর্ম্ম পাইবার অধিকার হইবে না।

আজ্ঞাপালনের বিশেষ নিয়ম।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, এমন অনেক স্থল আছে, যে সকল স্থলে আজ্ঞাপালন অতশীঘ্র করিলে হয় ত আজ্ঞাকর্ত্তার পক্ষে অনেক অনিষ্ট হইতে পারে। মনে করুন মনিব হঠাৎ একটা আজ্ঞা করিলেন; ভৃত্য সেই আজ্ঞাটী তৎক্ষণাৎ না পালন করিয়া, ধীরভাবে এমন ২।১টী প্রশ্ন করিলেন যে তাহাতে মনিব বেশ বুঝিলেন যে, তাঁর সেই আজ্ঞা যদি ভৃত্য তৎক্ষণাৎ পালন করিত, তাহা হইলে তাঁহাকে হয় ত নানাপ্রকার বিপদে পড়িতে হইত। এই ত গেল এক প্রকারের দৃষ্টান্ত। আবার এমনও অনেক স্থল আছে, যে সকল স্থলে আজ্ঞা-পালন অত নিখুঁত ও অন্ধভাবে করিলে আজ্ঞাদাতার নিকট হয় ত পরে তিরস্কৃত হইতে হয়; আজ্ঞাপালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত নিজেরও কিছু বুদ্ধি খাটাইয়া আরও ২।১টা আনুসঙ্গিক কার্য্য করিয়া লইতে হয়। মনে করুন, মনিব তাঁর কেরাণীবাবুকে বলিলেন, “এই দলিল খানা আমার এটার্ণি সাহেবকে দিয়া ভাল করিয়া দেখাইয়া আনুন। বড় দরকার, শীঘ্র যান।” কেরাণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “এটার্ণি সাহেব আফিসে নাই।” মনিব বলিলেন, “একটু কোন্ ব’সে থেকে, তাঁর সঙ্গে দেখা ক’রে, এটা দেখিয়ে নিলেন? ব’লে দিলুম—বড় দরকার! কোথায় গেছেন, কখন্ আসবেন—কিছু জিজ্ঞাসা ক’রে এয়েছেন?” কেরাণীবাবু বলিলেন—“মহাশয়, আপনি এসকল কথা ত কিছু ব’লে দেননি”!

আজ্ঞাদাতাদিগের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে, এসকল আপত্তি ধর্ত্তব্য নহে। সকল বিষয়েরই বিশেষ নিয়ম আছে। এসকল আপত্তি আজ্ঞাপালন সম্বন্ধীয় বিশেষ নিয়মের অন্তর্গত। এ স্থলে, বুদ্ধি খাটাইবার জন্য আর একটী বিশেষ আজ্ঞা, সেই আজ্ঞার সহিত, প্রদান করা মনিবের কর্ত্তব্য। আজ্ঞা করিলে যদি সকল স্থলেই আজ্ঞাপালন-কারিগণ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন, অথবা নিজের নিজের বুদ্ধি খাটাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই ত মুস্কিল। তাহা হইলে সৈন্যবিভাগে ত আরও মুস্কিল।

ভাল করিয়া বিচার করিতে গেলে, আজ্ঞাপালন সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিশেষ নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য নয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে আজ্ঞাদাতাদিগের দোষ; অর্থাৎ, যাঁহারা আজ্ঞাপালন করেন, তাঁহাদিগের দোষ নয়; দোষ—যাঁহারা আজ্ঞা প্রদান করেন, তাঁহাদের। যাঁহারা আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তাঁহাদের এটা বিশেষ জানা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা আজ্ঞা পালন করিবেন তাঁহাদের বুদ্ধি কিছু বেশী থাকা আশা করা যাইতে পারে না। কর্ম্মচারিগণ আজ্ঞাই যাহাতে বিশেষ রূপে পালন করিতে পারেন, তাহাই কেবল আজ্ঞাদাতাগণ দেখিবেন। তাহার সঙ্গে বুদ্ধি খাটাইবার ভার তাঁহাদের উপর দেওয়া কর্ত্তব্য নয়; সে সকল মন্ত্রিগণের বা কার্য্যাধ্যক্ষগণের অথবা উচ্চশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্য। এমন যদি কোন আজ্ঞা থাকে, যে আজ্ঞাপালন করিতে গেলে বুদ্ধি খাটাইতে হইবে; সে সকল আজ্ঞা বিশেষ-বুদ্ধিমান্ লোকদিগকেই দেওয়া কর্ত্তব্য। আজ্ঞাপালন করা যেমন দুরূহ, পবিত্র, এবং মহৎ কার্য্য; আজ্ঞা প্রদান করাও আবার তেমনই দুরূহ, পবিত্র এবং মহৎ। আজ্ঞা প্রদান করার পূর্ব্বে বিশেষরূপ অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হয় ত, তাঁহার আজ্ঞা প্রদানের উপর একটী সমগ্র পরিবারের, বা একটী সমগ্র ব্যবসার, বা একটী সমগ্র রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিতে পারে। আজ্ঞাপালন কেমন করিয়া করিতে হয় যেমন শিক্ষা করিতে হয়; আজ্ঞা প্রদানও আবার কেমন করিয়া করিতে হয় তেমনি শিক্ষা করিতে হয়। শাস্ত্রে শিষ্যের যেমন লক্ষণ আছে, গুরুরও আবার তেমনই লক্ষণ আছে।

যাহা হউক, আমরা এখানে গুরুর লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবর্ত্ত হই নাই। আজ্ঞাপালনকারীদিগেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চর্চ্চা করিতেছি। গুরুর লক্ষণ

লক্ষণ আমাদিগের চর্চ্চা করা তত আবশ্যক নয় এবং কর্ত্তব্যও নয়। কেননা শিষ্য ভালরূপ প্রস্তুত হইলেই, প্রকারান্তরে ভবিষ্যৎ-গুরুকেই প্রস্তুত করা হইল। পুত্রকে ভালরূপে শিক্ষিত করিতে পারিলেই, সেই পুত্রই আবার ভবিষ্যৎ-সৎপিতারূপে পরিণত হইবেন। যাহাতে সকলে, রোবানের ন্যায় আজ্ঞাপালন করিতে পারেন,জনসাধারণে এইরূপ শিক্ষাই প্রদান করা কর্ত্তব্য।

আজ্ঞাপালন-শিক্ষা—সাধারণ কর্ত্তব্য।

এরূপ, যেন কেহ মনে না করেন যে, আজ্ঞাপালন করা ভৃত্যেরই কার্য্য, অতি নীচ বা হীন লোকের কার্য্য; আর, আজ্ঞা করাই কেবল ভদ্রলোকের কার্য্য, বড় বা বাবু লোকের কার্য্য। নিম্ন কর্ম্মচারিগণকেই আজ্ঞাপালন করিতে হয়, তাহাদিগকেই কেবল আজ্ঞাপালন করা শিক্ষা বিশেষরূপ দেওয়া কর্ত্তব্য; আর যাঁহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে আর ওসমস্ত শিক্ষা করিতে হইবে না। এটা বেশ জানিবেন, ঠিক্২ আজ্ঞাপালন করা—ভীরু বা নীচ প্রকৃতির, স্বার্থপর বা হীনবুদ্ধির কার্য্য নহে। অতি বীর অতি স্বার্থত্যাগী, অতি সৎগুণ-শালী না হইলে কেহ সর্ব্বপ্রকারের আজ্ঞা ঠিক্২ পালন করিতে পারেন না। যিনি সর্ব্বদাই ঠিক্২ আজ্ঞাপালন করিতে রত বা পারগ, ভৃত্যই হউন, বা মনিবই হউন, নীচই হউন বা ভদ্রই হউন, দরিদ্রই হউন বা ধনাঢ্য হউন, মূর্খই হউন বা পণ্ডিতই হউন, তিনি সকলকারই নিকট অতি প্রশংসনীয়, আদরণীয়, মাননীয়, এবং সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়। তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে জগৎশুদ্ধ লোক প্রস্তুত। তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে, এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্তও ছদ্মবেশে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

আজ্ঞাপালন যে কি রূপ মহৎ কর্ত্তব্য, তাহা নিম্ন বা উচ্চ—সকল পদস্থ ব্যক্তিগণেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যিনি উচ্চপদস্থ, তাঁহাকেও আবার তাঁহা-অপেক্ষা কোন-না-কোন উচ্চতর পদস্থ ব্যক্তির আজ্ঞা পালন কোন-না-কোনও রকমে করিতেই হয়। এইরূপ, পর পর, সকলকেই কাহারও-না-কাহারও আজ্ঞা পালন করিতে হয়। যদি বলেন, সম্রাট্ আবার কাহার আজ্ঞা পালন করিবেন?—সম্রাটের উপর এ জগতে কেহ নাই বটে। কিন্তু তত্রাচ, আজ্ঞাপালন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। তিনি যদি নিজে আজ্ঞাপালন করিতে বালককালে ভালরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন, তবেই বেশ জানিবেন যে, তাঁহার রাজ্যেও সকলে ভালরূপ আজ্ঞাপালন করিতে জানেন।

যিনি নিজে ভালরূপ আজ্ঞাপালন করিতে জানেন, তিনিই ভালরূপ আজ্ঞা পালনের শিক্ষা অপরকে ঠিক্‌ দিতে পারেন। নিজে ভালরূপ সৈন্যগিরি না জানিলে, ভাল সেনাপতি কখনও হইতে পারা যায় না। মনে করুন দিকিন, আজ রোবানের মত যে রাজ্যে সকলেই আজ্ঞা পালন করিতে তৎপর, সে রাজ্যের কোনও বিভাগে কি, কখনও অশুভ ঘটিতে পারে ?

আজ্ঞাপালন শিখাইবার উপায়।

এক্ষণে কথা হইতে পারে, রোবানের মত আজ্ঞাপালন করা কি সকলকার পক্ষে সম্ভব ? যখন ছাত্র, শিক্ষকের মঙ্গলকারী আজ্ঞা পদে পদে লঙ্ঘন করিতে, কিছু মাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত বোধ করেন না। পিতা মাতা আজ্ঞা করিতে না-করিতেই যখন, তাহা লঙ্ঘন করিবার জন্য যেন স্বতঃসিদ্ধ অভিরুচি এবং সাহস, কন্যাপুত্রের মুখাগ্রে অমনি অগ্রসর হইয়া থাকে। ইষ্ট-গুরুও আজ্ঞা করিলে তাহা পালন করিতে যখন, শিষ্য কতই অপমান বোধ করেন। যখন দেশের এরূপ অবস্থা—যখন লোকের এমন ধারা মতি-গতি, তখন আর কেমন করিয়া সকলকার ভিতরে, সেরূপ অবিচলিত চিত্তে আজ্ঞাপালন করিবার রুচি, প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ? কি উপায়েই বা, লোকের অন্তরে, সেরূপ "কঠোরাৎ কঠোরোপি" আজ্ঞা, বিনা তিলার্দ্ধ চিন্তা বা বিচার, তৎক্ষণাৎ পালন করিতে রত হইবার ক্ষমতা ও তেজ, (dint of implicit obedience) উদ্ভূত হইতে পারে ?

বোধ হয়, ইহার দুইটী প্রধান উপায় আছে।—শিক্ষা ও অভ্যাস। প্রথম— আজ্ঞাপালন সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর নানাপ্রকারের উপদেশ দেওয়া। দ্বিতীয়, আজ্ঞাপালন সম্বন্ধীয় কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ প্যারেড্‌, ওঠ্‌-বোস্‌, প্রভৃতি রকমের অনুষ্ঠান দ্বারা—আজ্ঞাধীনত্ব (discipline) অভ্যাস করানো।

অভ্যাসে, মানুষের প্রকৃতি পর্য্যন্তও বদলাইয়া যায় ; অভ্যাসে লোকের কত জন্মজন্মান্তর হইতে প্রাপ্ত রাশি রাশি বদ্ধমূল সংস্কার পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া যায়। শিক্ষায় অতি হিংস্রক ভয়ানক পশুকেও অদ্ভুত আজ্ঞাধীন করা যাইতে পারে ; শিক্ষায় ক্ষুদ্র পক্ষীও প্রায় মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে। শিক্ষা ও অভ্যাসে বদ্ধও মুক্ত হইতে পারে, জীবও শিব হইতে পারে। শিক্ষা ও

অভ্যাসে, অনেক অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। যাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিবেন—যেরূপ অভ্যাস করাইবেন, সেইরূপই সে প্রস্তুত হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন অভ্যাস সকলে করিতে পারে না; অভ্যাস করিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। —ইহা ভুল। সকলকারই অভ্যাস করিবার ক্ষমতা আছে; তবে কম আর বেশী, লুক্কায়িত আর ব্যক্ত, নির্ব্বাণোন্মুখ বা উদ্দীপিত। শিক্ষা-প্রণালীর গুণে এই তারতম্যকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে; যাহার কম আছে, তাহার বেশী হইতে পারে, যাহার লুক্কায়িত আছে, তাহার প্রকাশিত হইতে পারে, যাহার নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল, তাহার পুনরুদ্দীপিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ যদি না হইত, তাহা হইলে আর, চাষাকে চাষ হইতে লাঙ্গল ছাড়াইয়া, ঘেসেড়াকে মাঠ হইতে খুর্পি ছাড়াইয়া, অদ্ভুত সৈনিক-আজ্ঞাপালন পর্য্যন্ত অভ্যাস করাইতে পারা যাইত না। যেখানে দেখিবেন অভ্যাস-শক্তি মলিন, সেইখানেই শিক্ষাপ্রণালীর প্রখর শাণ-যন্ত্র ধারণ করিবেন; দেখিবেন—সেই ধারবিহীন অভ্যাস-শক্তি অমনি তীক্ষ্ণ হইয়াছে।

সকল কার্য্যালয়ে সকল আফিসে এবং সকল কারখানায় সকল কর্ম্মচারী-কেই লইয়া প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়াও, আজ্ঞাপালনের উপর নানাপ্রকার উপদেশ দিবার নিয়ম করিলে বোধ হয় বড়ই ভাল হয়। সকল বিদ্যালয়েও, যাবতীয় ছাত্রগণকে প্রত্যহই রীতিমত প্যারেড্, ওঠ বোস, প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা আজ্ঞাপালন করিবার মতি অভ্যাস করানো অতি আবশ্যক। যৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎই, যাহাতে আজ্ঞাপালন করিতে, বালকগণের, শরীর মন মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমস্তই যন্ত্রের স্বরূপ প্রস্তুত হয়, এইরূপ কার্য্যতঃ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে, বিদ্যালয় হইতে যদি ছাত্রগণ বালককাল অবধি বরাবর এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ সৈনিক আজ্ঞা পর্য্যন্ত পালন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ত আর আমাদের একতার জন্য চিন্তা থাকেনা। এবং তাহা হইলে আমাদের দেশের, আমাদের রাজার, এবং আমাদের নিজেদের প্রভূত মঙ্গল সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে। সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে আজ্ঞাধীনত্বও (discipline), একটী প্রধান শিক্ষার বিষয় স্বরূপে, প্রতি বিদ্যালয়ে, প্রবর্ত্তন করিলে বড়ই ভাল হয়। লোকের বাটীতেও, কন্যাপুত্র-গণকে ৪।৫ বৎসর বয়স হইতেই ওঠ্ বোস্ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা, আজ্ঞাধীনত্ব শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কন্যাপুত্রগণকে ত অনেক খেলা শেখান, সেই সঙ্গে যদি

প্রত্যহ আজ্ঞাধীনত্বের খেলা অভ্যাস করাইয়া দেন, তাহা হইলে আর কখনই কন্যাপুত্রগণের নিদারুণ অবাধ্যতা-বশতঃ পিতামাতাগণকে আর অত সন্তাপিত হইতে হয় না। ইহা শিক্ষা করিতে শিশুদিগের আমোদ বই আর কিছু হইবে না। যদিও কোন শিশু নারাজ হয় ত,তাহাকে তাহার মনোমত আমোদের ভিতর দিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকার কৌশলে, অনায়াসেই আজ্ঞাধীনত্বের সহজ সহজ শারীরিক প্রক্রিয়া কিছু কিছু প্রত্যহ অভ্যাস করানো যাইতে পারে। শৈশব-কালে যাহা অভ্যাস করাইয়া দিবেন, যাহা ধারণা করাইয়া দিবেন, তাহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকাশ ও বৃদ্ধি সহজেই হইবে।

আজ্ঞাপালন—ধর্ম্মের অঙ্গ।

আজ্ঞাপালন যে কেবল কর্ম্মক্ষেত্রেই আবশ্যক তাহা নহে। ধর্ম্মক্ষেত্রেও ইহার প্রধান ও প্রথম আবশ্যক। বিনা আজ্ঞাপালন ধর্ম্মশিক্ষার প্রথম সোপানেও পদক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। আমাদের দেশে ধর্ম্ম সর্ব্বঘটে, ধর্ম্ম সর্ব্ব বিষয়ে। ধর্ম্মই সমস্ত। "কর্ম্ম" বলিয়া কিছু নাই। আর যদি থাকে, সে কর্ম্মের—মূলে ধর্ম্ম; সে কর্ম্মের—মধ্যে ধর্ম্ম, সে কর্ম্মের—অন্তে ধর্ম্ম। ধর্ম্মগত প্রাণ সে কর্ম্ম। ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিন, "কর্ম্ম" বলিয়া আর কোনও পদার্থ খুঁজিয়া পাইবেন না। যদি পান, সে কর্ম্ম—কর্ম্ম নয়, 'অকর্ম্ম'। যে কর্ম্মের ভিতর ধর্ম্ম নাই, সে কর্ম্ম ত—দুষ্কর্ম্ম; সে কর্ম্ম—পাপকর্ম্ম। অতএব সকল কর্ম্মেরই আদিমূল—ধর্ম্ম। এমন যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মেরও আদি হইতেছে—আজ্ঞাপালন। আজ্ঞাপালন না করিলে আপনি অধর্ম্ম আচরণ করিয়া ফেলিবেন, আপনি অধার্ম্মিক হইবেন। আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, এমন কি, লোকে মহাপাতক পর্য্যন্তও হয়। যিনি যতদূর পরিমাণে আত্মত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন করিতে পারেন, তিনি ততদূর পরিমাণে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত বলিয়া পরিগণিত হন, ও ততদূর পরিমাণে তিনি, তাঁর দেশের, এবং নিজেরও, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করেন। সে-কালে আমাদের দেশে, শিষ্যকে পরীক্ষা করিতে হইলেই, প্রায় আজ্ঞাপালন-বিষয়েই অগ্রে পরীক্ষা লওয়া হইত।

উপসংহার।

যে সকল কার্য্যক্ষেত্রে রোবানের মত একজনও লোক থাকেন, সে সকল কার্য্যক্ষেত্রের উন্নতি ও সফলতা সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না। সকল

ক্ষেত্রেরই অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে রোবানের ন্যায় যেন এক জনকেও প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারেন। যাবতীয় কার্য্যালয়ে, যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে, আজ্ঞাপালনের শিক্ষা প্রদান একান্ত আবশ্যক। এত ত শিখাইতেছেন, এত ত পড়াইতেছেন, এত ত খরচ করিতেছেন, এত চেষ্টা করিতেছেন, কৈ, রোবানের মত একজনকে, প্রস্তুত করিতে, কোন্ দেশ, কোন্ শিক্ষালয়, কোন্ বিদ্যালয়, আজও পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছেন? প্রতি গৃহে, প্রতি কলেজে, প্রতি স্কুলে, প্রতি আফিসে, প্রতি কার্য্যক্ষেত্রে, রোবানের মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপনা করা হউক। যাবতীয় কন্যাপুত্র, যাবতীয় ছাত্র ছাত্রিকা, যাবতীয় কর্ম্মচারীর হৃদয়ে রোবানের অদ্ভুত আজ্ঞাপালন-কীর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হউক; সকলকার ভিতর যেন-তেন-প্রকারেণ, সেই অদ্ভুত আজ্ঞাপালন-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হউক;—দেখুন সর্ব্বত্র সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় কি না; সর্ব্বত্র যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য চলে কিনা; দেখুন প্রতি কার্য্যক্ষেত্র আবার সিদ্ধভূমি হয় কি না; প্রতি শিক্ষালয়, প্রতি গৃহ—প্রতি আবাসভূমি আবার দেবমন্দির-সম হয় কি না; দেখুন পৃথিবী আবার আপদশূন্য হয় কি না, আবার ভূতল সেই সত্যযুগের ন্যায় স্বর্গোপম হয় কি না।

বিলাতে যেমন প্রায় প্রতি কার্য্যালয়েই "মেসেজ টু গার্শীয়া" নামক আজ্ঞাপালন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ক্রয় করিয়া, অধ্যক্ষগণ যাবতীয় কর্ম্মচারীকে বিতরণ করিতেছেন; তেমনি আমাদের দেশেও এইরূপ আজ্ঞাপালন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লইয়া প্রতি বিদ্যালয়ে, প্রতি কার্য্যালয়ে, প্রতি বাটীতে, ছাত্রগণকে কর্ম্মচারিগণকে এবং কন্যাপুত্রগণকে, ভালরূপ পাঠ করাইলে যে কিছুমাত্রও উপকার হয় না—এরূপ বোধ হয় না।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৩৩৬ পৃষ্ঠার পর।

তমেবৈনং অহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্॥
চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাপেনোপাধিনা বনে।
অনেন নিহতা রাম রাজানঃ পাপরূপিণা॥
অস্য মায়াবিদো মায়ামৃগরূপমিদং কৃতম্।
ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্ব্বপুরসন্নিভম্॥

মৃগোহ্যেবং বিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ ॥

হে পুরুষব্যাঘ্র, আমার বোধ হয় যে এই মৃগ রাক্ষস মারীচ ভিন্ন আর কেহ নহে। রাজগণ বনোদ্দেশে হৃষ্টচিত্তে মৃগয়া করিতে যাইলে, এই পাপ-রূপী দুষ্টচিত্ত নিশাচর নানাবিধ মায়িকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করতঃ বিনষ্ট করে। এই যে গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ সমুজ্জ্বল মায়ামৃগরূপ সম্মুখে পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা সেই মায়াবীর মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে জগতীপতে রামচন্দ্র, পৃথিবীতে এরূপ স্বর্ণপ্রভাবিশিষ্ট বিচিত্র মৃগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, সুতরাং, ইহা যে মায়া তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সীতাসহিত রামচন্দ্রের সেবাই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনের একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। রাবণবধের পর দেবগণের সহিত পিতা দশরথ আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে,

অবাপ্তং ধর্ম্মাচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া।
এবং শুশ্রূষতাব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া ॥

হে বৎস, তুমি বৈদেহী সীতার সহিত এই রামচন্দ্রের অব্যগ্রচিত্তে সেবা করিয়া ধর্ম্ম ও বিপুল যশ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছ।

শ্রীরামানুজেরও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীযুক্ত-নারায়ণ সেবা। যখন তমঃ প্রকৃতিক সমাজের নেতৃগণ, অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া, রাবণ যেরূপ সীতাকে হরণ করে, সেইরূপ মানব হৃদয় হইতে ভগবদ্ভক্তি অপহরণ করিয়াছিল, তখন শ্রীরামানুজ প্রকৃত রামানুজের ন্যায় ভক্তিরূপ সীতা উদ্ধারের জন্য আজীবন পাষণ্ডকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধমনোরথ হয়েন। তিনি নারায়ণের অঙ্কে শ্রীকে উপবিষ্ট করাইয়া শ্রীহীন ভারতে পুনরায় সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বিকাশ করেন। শ্রীর সহিত নারায়ণের নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণ করিয়া তিনি মহর্ষি বাল্মিকীর অভিপ্রায়ই সুব্যক্ত করিয়াছেন। আদি কবি বন্দিমুখে গাহিয়াছেন,

শ্রীশ্চ ধর্ম্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।

হে কাকুৎস্থ, ধর্ম্ম ও শ্রী তোমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাত্মা স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি বলে, ও অনবদ্য যুক্তি সহকারে ইহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ বিগ্রহবান্ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রীরামানুজও যে সেইরূপ ধর্ম্মৈকপ্রাণ ছিলেন, ইহা তাঁহার জীবন লীলা পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে

বুঝা যাইবে। সৌমিত্রির ন্যায় তিনিও ভীতি এবং প্রলোভনের অগম্য স্থানে বাস করিতেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যাদবপ্রকাশ।

সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শ্রীরামানুজ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া তদীয় পিতা শ্রীমদাসুরি কেশবাচার্য্য তাঁহাকে উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অনতিবিলম্বে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। পিতা, মাতা, আত্মীয় ও প্রতিবেশিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। দীন দরিদ্রেরা প্রচুর আহার পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল। সপ্তাহ কাল ধরিয়া উৎসব চলিতে লাগিল। নব বধূর বদন দর্শন করিয়া দেবী কান্তিমতী ও তাঁহার ভর্ত্তা পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। মাসাবধি সকলে এইরূপে সাংসারিক আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বিধাতার চিরন্তন নিয়মানুসারে সুখের পর দুঃখ দেখা দিল। বৃদ্ধ কেশবাচার্য্য সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মানবলীলা সম্পন্ন করিলেন। আচার্য্য-পরিবার মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় শোক-পরিম্লান হইল। বিপুল আনন্দের মধ্যে আকস্মিক দুঃখ-সম্পাত সাতিশয় তীব্রতর হইয়া উঠিল। কবিগুরু-বাল্মিকীমর্ম্মদাহিকা ক্রৌঞ্চবধূর ন্যায় কান্তিমতী একান্ত অধীরা হইলেন। পিতৃহীন রামানুজও কিয়ৎকাল শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন; কিন্তু প্রজ্ঞাবলে ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরে শোকের আকার প্রকাশ না করিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন এবং মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে আত্মীয় সাহায্যে তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। ইহার পর তিনি কিছুদিন শ্রীপেরেম্বুত্বরে রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ও তিনি তথায় শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া কাঞ্চিপুরে বাস উঠাইয়া লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে রামানুজ উক্ত নগরীতে এক আবাস বাটি নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং তথায় গিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শোকাবেগ শান্ত হইল।

উক্ত সময়ে কাঞ্চি নগরীতে যাদবপ্রকাশ নামক এক সুবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী অধ্যাপক বহুশিষ্যসমাকীর্ণ হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে সকলেই

মুগ্ধ হইয়া যাইত। বিপুল বিবিদিষা রামানুজকে অনতিবিলম্বে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিল। নবশিষ্যের রূপলাবণ্য, বদনমণ্ডলে প্রতিভাচ্ছটা দেখিয়া যাদবপ্রকাশ বড়ই প্রীত হইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই রামানুজ তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন, ও তাঁহার সাতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এই প্রীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। যাদবপ্রকাশ অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ছিলেন। তৎকথিত অদ্বৈতবাদ অদ্যাপি "যাদবীয় সিদ্ধান্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি এক প্রকার শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের সাকাররূপ স্বীকার করিতেন না। জগৎ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তনশীল, নিত্য-নশ্বর, বিরাট্ মূর্ত্তি। এই বিরাট্মূর্ত্তির পশ্চাতে যে দেশকালনিমিত্তাতীত, অক্ষর সচ্চিদানন্দসত্বা আছে, তাহাই তাঁহার স্বরাট্ সত্তা, তাহাই উপাদেয় এবং জ্ঞেয়। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনি বিরাট্‌কে মায়া বা রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত্ত, একে অন্য জ্ঞান, এরূপ বলিতেন না। জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে মরীচিকার ন্যায় অলীক এবং সর্ব্বতোভাবে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইত না। ইহা ঈশ্বরেরই এক প্রকার স্বরূপ—যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সতত অস্থির বলিয়াই হেয়, এবং সতত স্থির বলিয়াই স্বরাট্ স্বরূপ উপাদেয়। বিরাট্‌দর্শী আত্মা জীব, স্বরাট্ আত্মাই ব্রহ্ম।

ভক্তিময় বিগ্রহ শ্রীরামানুজ ভগবদ্দাস্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। যাদবীয় সিদ্ধান্ত সুতরাং তাঁহার কথনই প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু গুরুর গৌরবরক্ষা করিবার জন্য তিনি কখনই তাঁহার শিক্ষার দোষ দর্শাইতে সাহস করিতেন না। ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা অনেক সময়ে দমন করিয়া ফেলিতেন।

একদা প্রাতঃকালের পাঠপরিসমাপ্তির পর শিষ্যবর্গ মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিবার জন্য স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে, যাদবপ্রকাশ স্বীয় প্রিয়তম শিষ্য রামানুজকে, স্বীয় অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে আদেশ করিলেন। তখনও একটি শিষ্য পাঠের দুরূহার্থ বিশদ করিয়া লইবার জন্য গুরুকে প্রশ্ন করিতেছিলেন। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতেন। উহার প্রথমাধ্যায়স্থ ষষ্ঠ খণ্ডের সপ্তমমন্ত্রের পূর্ব্বাংশে যে "কপ্যাসং" শব্দ আছে, তাহার অর্থ শিষ্যটির সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। মন্ত্রাংশটি এই, "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।" যাদব পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের অর্থানুসারে "কপ্যাসং" শব্দে বানরের পৃষ্ঠান্তভাগ বা অপানদেশ এইরূপ অর্থ করিয়া, মন্ত্রাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন ; "সেই সুবর্ণবর্ণ পুরুষের চক্ষুদ্বয় বানরপৃষ্ঠান্তের ন্যায় লোহিত-

পদ্মতুল্য।" এই বিসদৃশ, হীনোপমাযুক্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যঙ্গব্যাপারনিরত রামানুজের স্বভাবকোমল, ভক্তিমধুর হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং অশ্রু আকারে চক্ষুঃ প্রান্ত দিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় যাদবের ঊরুদেশে পতিত হইল। জ্বলন্ত অঙ্গার তুল্য উত্তপ্ত অশ্রুধারা স্পর্শে যাদব চকিতের ন্যায় সহসা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে ইহা অঙ্গার নহে, তাঁহার প্রিয়শিষ্য রামানুজের অত্যুষ্ণ অশ্রুধারা। তিনি সবিস্ময়ে প্রিয়তমকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামানুজ কহিলেন, "ভগবন, আপনার ন্যায় মহানুভবের নিকট এই বিসদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। সর্ব্বকল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর, সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ পরাৎপর ভগবানের সহিত বানরের অপানদেশের তুলনা করা যে কতদূর অসম্ভবপর এবং পাপজনক তাহা একমুখে কি বলিব? আপনার ন্যায় প্রাজ্ঞের মুখারবিন্দ হইতে এরূপ দূরর্থ কথনও আশা করি নাই।" যাদব কহিলেন, "বৎস, তোমার দাম্ভিকতাতে আমিও যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলাম। ভাল, তুমি ইহাপেক্ষা কি উত্তম ব্যাখ্যা করিতে পার?" রামানুজ কহিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই সম্ভব হয়।" ঈষৎ ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া গুরু কহিলেন, "ভাল, ভাল, তোমার নূতন অর্থ বল, শুনা যাক। তুমি দেখিতেছি যে শঙ্করাচার্য্যের উপরে উঠিতে চাও।" অতি বিনীত ভাবে রামানুজ পুনরায় কহিলেন, "ভগবন্, আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই সম্ভব হইতে পারে। "কপ্যাসং" শব্দে "বানরের অপানমার্গ" এরূপ অর্থ না করিয়া, কং জলং পিবতীতি কপিঃ সূর্য্যঃ এবং অস্ ধাতু বিকসনার্থক বলিয়া, "আস" শব্দে "বিকসিত", এইরূপ অর্থ সিদ্ধ করিলে ভাল হয়। তাহাতে সমগ্র "কপ্যাসং" শব্দের অর্থ "সূর্য্য বিকসিতং" হইতেছে। সুতরাং মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ হইবে, 'সেই সুবর্ণবর্ণ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় সূর্য্যবিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভাশালী।'"

এরূপ অর্থ শুনিয়া যাদব কহিলেন, "ইহা মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ মাত্র। যাহা হউক ইহাতে তোমার সবিশেষ ব্যাখ্যানকৌশল আছে।"

এই ঘটনার পর হইতে অধ্যাপক রামানুজকে একজন মহা দ্বৈতবাদী ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তদুপরি তাঁহার প্রীতিরও কিঞ্চিৎ লাঘব হইল।

আর একদিন, তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের অর্থে যখন যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অনন্তস্বরূপ বলিয়া

ব্যাখ্যা করিলেন, শ্রীরামানুজ তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন যে, "ব্রহ্ম সত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, অসত্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, জ্ঞানই তাঁহার ধর্ম্ম, অজ্ঞান নহে; এবং তিনি অনন্ত, সান্ত নহেন। তিনি সত্য, জ্ঞান, এবং অনন্ত গুণের গুণী। ইহাদিগকে তাঁহার স্বরূপ বলা কোনও রূপে যুক্তিযুক্ত নহে। এ গুলি তাঁহার, কিন্তু তিনি নহেন। যেমন দেহ আমার, আমি দেহ নহি।" ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক তপ্তৈলে প্রক্ষিপ্ত বার্ত্তাকুর ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং সরোষে কহিলেন, "ওহে ধৃষ্ট বালক, তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শুনিতে না চাও, কেন বৃথা এখানে আগমন কর? স্বগৃহে যাইয়া নূতন টোল খুলিয়া ফেল না কেন?" পরে কিছু স্থির হইয়া কহিলেন, "তোমার ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করের মতানুযায়ী নয় বা অন্য কোনও পূর্ব্ব গুরুর মতানুযায়ী নহে। সুতরাং দ্বিতীয়বার এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিও না।" রামানুজ স্বভাবতঃই সাতিশয় নম্র এবং গুরুভক্ত। তিনি পাঠকালে যথাসাধ্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। প্রতিবাদ করা তাঁহার একবারেই অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কি করিবেন, যখন বুঝিতেন যে অধ্যাপকের ব্যাখ্যায় সত্যের অপলাপ হইতেছে, তখন সত্যপ্রাণতার বশবর্ত্তী হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রতিবাদ করিতে হইত। যাদব যদিও তাঁহার প্রতিবাদ গুলিকে অন্যান্য শিষ্য সমক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, তথাপি ক্রমে ক্রমে রামানুজের উপর তাঁহার এক প্রকার ভীতি জন্মাইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "হয় তো এই বালক কালে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত স্থাপন করিবে। ইহার হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? সনাতন অদ্বৈতমত রক্ষার জন্য ইহার প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত করা উচিত।" তিনি যে অদ্বৈতমতের প্রতি নিরতিশয় প্রীতি নিবন্ধন এই পাশব সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা নহে। প্রবল ঈর্ষাই ইহার কারণ। কবি বলিয়াছেন যে,

প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সাং
সহতে নান্যসমুন্নতিং যয়া।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
নতু গোমায়ুরুতানি কেশরী॥

"অন্যের উন্নতি সহ্য না করাই মহাত্মাদিগের প্রকৃতি। কারণ অত্যুন্নত দেশচারী মেঘ গর্জ্জন করিলেই সিংহ তাঁহার প্রতিনাদ করেন, শৃগালের রবে করেন না।" অবশ্যই ইহা প্রকৃত মহাত্মার লক্ষণ নহে। সে মহাত্মা "তুল্য-

নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।" তাঁহার অরি মিত্র কেহই নেই। তিনি সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন। তিনি নিত্য সন্তুষ্ট, সর্ব্বতঃ পূর্ণ। কবি লৌকিক মহাত্মার কথা বলিয়াছেন। আমরা যাঁহাদের "বড় লোক" আখ্যা দিয়া থাকি। যাঁহারা তমোগুণপ্রণোদিত হইয়া ভাবিয়া থাকেন, "কোহ ন্যো হস্তি সদৃশো ময়া।" যাদবপ্রকাশ এই সম্প্রদায়ের "বড় লোক" ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হৃদয় যে রামানুজের বধ কামনা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও তিনি অদ্বিতীয় ধীশক্তি সহায়ে বেদান্তের কূট তর্ক সমূহ সম্যক্ আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন; যদিও "ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা," ইহা সুস্পষ্টরূপে তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিতে পারিতেন, যদিও তাঁহার যশঃ প্রভায় কাঞ্চীপুর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যদিও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় শঙ্করমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিতেন, তথাপি সাধনহীনতার দোষে তাঁহার জ্ঞান কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি অশনায়া, পিপাসা প্রভৃতি বাসনার দাসত্ব হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

একদিবস গোপনে অন্যান্য শিষ্যবর্গকে ডাকিয়া যাদব কহিলেন, "দেখ, তোমরা সকলে আমার ব্যাখ্যার কোন দোষ দেখিতে পাও না। কিন্তু এই ধৃষ্ট রামানুজ যখন তখনই আমার অর্থের প্রতিবাদ করে। বুদ্ধিমান্ হইলে কি হইবে, উহার মন দ্বৈতবাদরূপ পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। এ পাষণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?" ইহাতে জনৈক শিষ্য কহিল, "মহাশয়, উহাকে পাঠমণ্ডপে না আসিতে দিলেই হইল।" অপর শিষ্য তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "তাহা হইলে, যাহার জন্য অধ্যাপক মহাশয় ভীত হইতেছেন, তাহাই হইবে, অর্থাৎ, রামানুজ স্বয়ং এক টোল খুলিয়া তথায় দ্বৈতবাদ প্রচার করিবে। ইতি পূর্ব্বেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের এক সুবিস্তৃত টীকা লিখিয়া তাহাতে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছে, তুমি কি শোন নাই?" বাস্তবিকই রামানুজ সেই সময়ে উক্ত মন্ত্রের এক বিশদ, সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া বুধমণ্ডলীর সাতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর সকলে স্থির করিল যে, রামানুজের প্রাণনাশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইহা স্থির হইলে কিরূপে তাহা সকলের অজ্ঞাতসারে এবং সহজে সংসাধিত হইতে পারে সেই বিষয়ে মন্ত্রণা হইতে লাগিল। শেষে যাদব কহিলেন, "চল আমরা সকলে কলুষবিনাশিনী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া সমুদায় মালিন্য দূর করিবার জন্য তীর্থ যাত্রা করি। তোমরা সকলে রামানুজকে এই অভিপ্রায়

স্থাপন কর এবং যাহাতে সেও আমাদের সঙ্গে আইসে সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হও। কারণ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল ঐ পাষণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। পথিমধ্যে উহাকে বিনাশ করিয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের হস্ত হইতে সকলে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব, এবং অদ্বৈতমতের কণ্টকও উৎপাটিত হইবে।"

শিষ্যগণ অধ্যাপকের এই সদ্যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইল, এবং তদনুসারে তাহারা রামানুজকে পুণ্যজনক ভাগীরথী স্নানের প্রলোভন দেখাইতে চলিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোবিন্দ নামে রামানুজের এক মাতৃস্বস্রীয় ছিলেন। তিনি রামানুজকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। শ্রীপেরেম্বুদুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যপরিবার যখন কাঞ্চিপুরে আসিয়া বাস করিলেন, তৎসঙ্গে গোবিন্দও তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। রামানুজ ও তিনি উভয়ে সমবয়স্ক। সুতরাং কেশবনন্দন যাদবপ্রকাশের শিষ্য হইলে, গোবিন্দও তাঁহার শিষ্য হইলেন। উভয়ে প্রায়ই একত্র অধ্যয়নমণ্ডপে গমন করিতেন, ও তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। যাদবশিষ্যগণ যখন রামানুজকে ভাগীরথী স্নানে সম্মত করিল, সুতরাং বলা বাহুল্য যে গোবিন্দও আগ্রহাতিশয় সহকারে তীর্থযাত্রায় সম্মত হইলেন। (ক্রমশঃ।)

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

(প্রাপ্ত পত্র।)

"উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু,—

নিবেদন এই আমরা স্বামী স্বরূপানন্দের উদ্যোগে কয়েক দিবস যাবৎ সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত, হরিদ্বার সমীপবর্ত্তী কন্খল নামক স্থানে একটী আশ্রম স্থাপিত করিয়াছি। আশ্রমের উদ্দেশ্য নিরাশ্রয় ও পীড়িত সাধু ও গরীবদিগের সেবা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা।

এখানে হাসপাতাল কিম্বা কোন ডাক্তার নাই, সুতরাং নিরাশ্রয় সাধু ও গরীবদিগের অসুখ হইলে কষ্ট সহজেই অনুভবনীয়; বিশেষতঃ এটী তীর্থ স্থল এবং সাধুদিগের একটী প্রধান আড্ডা, অতএব নানাদেশ হইতে অনেক দরিদ্র যাত্রী ও সাধু এখানে আসিয়া বাস করে ও ভিক্ষা এবং মাধুকরি-বৃত্তি দ্বারা কোন মতে জীবন ধারণ করে, কিন্তু অসুখ হইলে তাহাদের ঔষধ, পথ্য ও সেবা করিবার কেহই নাই; অতএব এরূপ একটী আশ্রম এখানে অতীব প্রয়োজনীয় বিধায় পূজনীয় স্বামীজির উপদেশানুসারে এই আশ্রমটী স্থাপিত করা হইয়াছে। আশ্রমের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থী। সংপ্রতি আমরা ২টী রোগী দেখিতেছি। কার্য্য বিবরণ মাসান্তে পাঠাইব। ইতি।

দাস

১৩ই জুলাই, ১৯০১। কল্যাণানন্দ।"

হয়, সেইরূপ যে গুণ সমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে, সে তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করে।' কঠ-৪র্থী বল্লী-১৪-১৪ শ্লোক। বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে পড়িয়া বহু হইয়াছে। বহুর জন্য ধাবমান হইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও। "হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ।" 'তিনি (সেই আত্মা) আকাশবাসী সূর্য্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী অগ্নি ও কলসবাসী সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন; তিনি সত্য ও মহান্।' 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। বায়ুর্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।' কঠ-৫মী বল্লী ৯ ও ১০ শ্লোক। 'যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তু ভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সেই এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেইরূপ হইয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।' যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। ইহাই প্রকৃত সুখবাদ—সর্ব্বত্র তাঁহার দর্শন! এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত আত্মা এই সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখদুঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি অপবিত্র হইয়া দুঃখভোগ করেন? উপনিষদ্ বলেন, তিনি দুঃখানুভব করেন না। 'সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।' কঠ-৫মী বল্লী ১১ শ্লোক। 'সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হয়েন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎসম্বন্ধী দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না।' আমার ব্যারাম থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না। 'একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।' কঠ-৫মী বল্লী ১২ শ্লোক। 'যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় একরূপকে বহুপ্রকার

করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে।' 'নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।' কঠ-৫মীবল্লী-১৩ শ্লোক। 'যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনবান্‌দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।' বাহ্য জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সূর্য্য চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।' কঠ ৫মীবল্লী-১৫ শ্লোক। 'সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎ সমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায়? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।' 'ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ।' কঠ-৬ষ্ঠী বল্লী-১শ্লোক। ঊর্দ্ধমূল ও নিম্নগামী শাখাযুক্ত এই চিরন্তন অশ্বত্থবৃক্ষ (অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ) রহিয়াছে। তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হয়েন। সমুদয় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।'

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের মত এই যে, এই স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন্দ্রলোক, বরুণলোকে গেলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই এই ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্টরূপে হইয়া থাকে। 'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে, ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥' কঠ-৬ষ্ঠী বল্লী-৫ম শ্লোক। 'যেমন আরসিতে লোকে আপনার প্রতিবিম্ব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্ট রূপে অনুভব করা যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন জলে লোকে আপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্ব্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়, যেমন আলোক ও ছায়া পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু তথাপি পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না।' অতএব বেদান্ত

বলেন,সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ আমাদের নিজ আত্মা,পূজার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির মানবাত্মা, উহা সর্ব্বপ্রকার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেরূপ সেই সত্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট অনুভব হয় না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয় তাহা নহে। ভারতবর্ষে যখন ছিলাম, তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়ত খুব স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হইবে, তারপর দেখিলাম, তাহা নহে তারপর ভাবিলাম হয়ত বনে গেলে সুবিধা হইবে, তারপর কাশীর কথা মনে হইল। সব স্থানেই একরূপ, কারণ, আমরা নিজেরাই নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদয় জগৎ আমার পক্ষে অসাধু প্রতীয়মান হইবে। উপনিষদ্ ইহাই বলেন। আর সেই একই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিবে। যদি আমার এখানে মৃত্যু হয় এবং যদি আমি স্বর্গে যাই, সেখানেও সেই একই রূপ দেখিব। যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা, অরণ্য, বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তুমি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্ম্মল করিতে পার, তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে। অতএব এখানে ওখানে যাইয়া শক্তিক্ষয় বৃথা-মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্ম্মলতাসাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

'ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। কঠ-৬বল্লী-৯ শ্লোক।

'ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।' ইহার পরেই জ্ঞানযোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রাজযোগ হইতে ইহা কিছু ভিন্ন রকমের। যখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়, মানুষ যখন ঐগুলিকে আপনার দাসের মত করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী চরমগতি লাভ করেন।

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্।'

কঠ ৬-১৫ শ্লোক।

'যে সকল কামনা মর্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় ও এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়, এইমাত্র উপদেশ।'

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, বেদান্ত শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্ম্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা দুর্ব্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগকে স্বর্গনরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু আত্মাই বাস্তবিক একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় হিন্দুরাও সব হাতে হেতেড়ে করিতে চান; তবে উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। একজন বলিলেন, বেশ ভাল একখানি বাড়ী কর, উত্তম ভোজন, উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তিনি খুব কাযের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জগতের জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান—তিনি সেই আত্মজ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন। আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা আছেন—তিনি খুব ভাল লোক এবং একজন সুন্দর বক্তা। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, ধর্ম্মের কোন আবশ্যকতা নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপমাটী প্রয়োগ করিয়াছিলেনঃ—এই কমলালেবুটী রহিয়াছে, উহার সব রস আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়—আমি তাঁহাকে বলি, 'আপনার সঙ্গে আমার একমত। আমারও নিকট এই ফল রহিয়াছে—আমিও ইহার রস-টুকু লইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটী কি, এই বিষয় লইয়া। আপনি মনে করিতেছেন উহাকে কমলালেবু—আমি ভাবিতেছি আম। আপনি বোধ করেন, জগতে আসিয়া বেশ করিয়া খাইতে পরিতে পারিলে এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই বাস, চূড়ান্ত হইল, কিন্তু আপনার

বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া আর কর্ত্তব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে অকিঞ্চিৎকর।

যদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরূপে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই জীবনের একমাত্র কার্য্য হয়, তবে আমি তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করি। আমি বস্তুর মর্ম্মস্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্য জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই। আমি এই জীবনেই সমুদয় রসটী শুষিয়া লইতে চাই। আমার দর্শনে বলে, জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে—স্বর্গ নরক সব কুসংস্কারক তাড়াইয়া দিতে হইবে, যদিও তাহাদের এই পৃথিবীর মত ব্যবহারিক সত্তা থাকে। আমি এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—উহা কি তাহা জানিব, শুধু উহা কিরূপে কার্য্য করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি কি, তাহা নয়। আমি সকল জিনিষের 'কেন' জানিতে চাই—'কেমন করিয়া হয়', এই অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি? তোমাদেরই একজন বড়লোক বলিয়াছেন, 'সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে,তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে।' অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে—ঈশ্বর ইঁহাদিগকে ইঁহাদের অনুসন্ধানে সহায়তা ও আশীর্ব্বাদ করুন; কিন্তু যখন কেহ বলে, ইহাই সর্ব্বস্ব, তখন সে নির্ব্বোধের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে বুঝিতে হইবে, সে কখন জীবনের রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত বস্তু কি, সে সম্বন্ধে সে কখন আলোচনা করে নাই। আমি অনায়াসেই তর্ক করিতে পারি যে, তোমার যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। তুমি প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ কি, তুমি বলিবে, আমি জানি না। অবশ্য তোমার যাহা ভাল লাগে তাহার উপর তোমার কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও।

কিন্তু আমি আমার নিজের ভাব যেটী, সেটী কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকি। অতএব এই যে বাক্য, অমুক কাযের লোক নয়, অমুক কাযের লোক, এ সব বাজে কথামাত্র। তুমি কাযের লোক একভাবে, আমি আর এক ভাবে। এক প্রকৃতির লোক আছেন,তাঁহাদিগকে যদি বলা যায়, এক পায় দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্য পাইবে, তবে তিনি এক পায়েই দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আর এক

প্রকৃতির লোক আছেন—তাঁহারা শুনিয়াছেন, অমুক যায়গায় সোণার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দ্দিকে অসভ্য লোকের বাস। তিনজন লোক যাত্রা করিল। দুইজন মারা গেল—একজন কৃতকার্য্য হইল। সেই ব্যক্তি শুনিয়াছে আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু সে পুরোহিতবর্গের উপর উহার মীমাংসার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি সোণার জন্য অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নন। তিনি বলেন, উহাতে বিপদাশঙ্কা আছে, কিন্তু যদি তাঁহাকে বলা যায়, এভারেষ্ট পর্ব্বতের শিখরে, সমুদ্র সমতলের ৩০০০০ ফিট উপরে এমন একজন আশ্চর্য্য সাধু আছেন, যিনি তাঁহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি তিনি কাপড় চোপড় অথবা কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত। এই চেষ্টায় হয়ত ৪০০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন কিন্তু সত্য লাভ করিল। ইহারাও একদিকে খুব কাযের লোক—তবে ভুল এইটুকু যে, তুমি যেটুকুকে জগৎ বল, সেই টুকুই সব, এই চিন্তা করা। তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা ক্রমাগত উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে। আমার পথে অনন্ত শান্তি—তোমার পথে অনন্ত দুঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাযের পথ বলিতেছ, তাহা ভ্রম! তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে—লোকের মহৎ হিত হইবে—কিন্তু তাহা বলিয়া আমার পথে দোষারোপ করিও না। আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্য্যকরী পথ। এস, আমরা সকলে নিজ নিজ প্রণালীতে কার্য্য করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই একরূপ কাযের লোক হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল ছিল। আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব উভয় দিকেই কাযের লোক—আর আমি আশা করি, কালে সমুদয় মানবজাতি এই সকল বিষয়েই কাযের লোক হইবেন। মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে—সে সময় কি হইতেছে, তাহা যদি তুমি লক্ষ্য কর, তুমি দেখিবে এক কোণে একটী বুদ্বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটী উঠিতেছে। এই বুদ্বুদগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার পাঁচটী একত্র হইল, অবশেষে সকলগুলি একত্র হইয়া ভয়ানক এক গতি আরম্ভ হইল। এই জগৎও এইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটী বুদ্বুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্বুদ-সমষ্টি-স্বরূপ। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে সম্মিলিত হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, একদিন এমন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে

না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ভাল বাসি বা না বাসি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক স্বভাবতঃ আমাদের ভ্রাতৃসম্বন্ধ—কিন্তু আমরা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাযের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই সম্মিলন, জগতে প্রকাশিত হইবে। তখন সমুদয় জগৎ জীবন্মুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ষা, ঘৃণা, সম্মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটী প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, খড় কুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে। উহারা এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি আমি, এমন কি, সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার ন্যায় সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আমরাও এদিক্ ওদিক্ যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরা সেই প্রাণ ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পঁহুছিব।

সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের জীবনের অধিকাংশই অবশ্য দুঃখপূর্ণ হইবে—আমরা যতই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করি না কেন। আর এই দুঃখরাশি বাস্তবিক আমাদের পক্ষে একরূপ অনন্ত। আমরা অনাদি কাল হইতে এই দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনিই রহিয়াছে। আমরা যতই দুঃখ প্রতীকারের উপায় বাহির করি, ততই দেখিতে পাই জগতের ভিতর আরো কত দুঃখ গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আমরা আরো দেখিয়াছি, সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন, এই দুঃখ চক্রের বাহিরে যাইবার একমাত্র উপায় ঈশ্বর। সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন, আজকালকার প্রত্যক্ষবাদীদের মতানুযায়ী জগৎকে যেমন দেখা যাইতেছে তেমনি লইলে, ইহাতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্ম্মই বলেন—এই জগতের অতীত আরো কিছু আছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, এই ভৌতিক জীবন, ইহাই কেবল পর্য্যাপ্ত নহে—উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ

মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থূল ব্যাপার মাত্র। ইহার পশ্চাতে, ইহার অতীত প্রদেশে সেই অনন্ত রহিয়াছেন—যেখানে দুঃখের লেশমাত্রও নাই, উঁহাকে কেহ গড, কেহ আল্লা, কেহ জিহোভ, কেহ জোভ, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। কিন্তু জগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ কথা সত্য হইলেও, আমাদিগকে এই জগতে জীবন ধারণ করিতে ত হইবে। এক্ষণে ইহার মীমাংসা কোথায়?

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে, সকল ধর্ম্মের এই উপদেশে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদয় হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই, জীবনের দুঃখরাশির প্রতীকার কি, আর তাহার উত্তর যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাতে আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, জীবনত্যাগ করা। ইহাতে একটী প্রাচীন গল্পের কথা মনে উদয় হয়। একটি মশা একটি লোকের মাথায় বসিয়াছিল, তাঁহার একটী বন্ধু ঐ মশাটীকে মারিতে গিয়া তাঁহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটীও মারা গেল, মশাটীও মরিল। পূর্ব্বোক্ত প্রতীকারের উপায়ও যেন ঠিক সেইরূপ প্রণালীর উপদেশ দিতেছে। জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ, তাহা যে ব্যক্তি জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু সকল ধর্ম্ম ইহার প্রতীকারের উপায় কি বলেন? তাঁহারা বলেন, জগৎ কিছুই নহে। এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহা প্রকৃত সত্য। এই খানেই বাস্তবিক বিবাদ। এই উপায় যেন সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তবে উহা কি করিয়া প্রতীকারের উপায় হইবে? তবে কি কোন উপায় নাই? প্রতীকারের আর একটী উপায় যাহা কথিত হইয়া থাকে, তাহা এই। বেদান্ত বলেন, বিভিন্ন ধর্ম্মে যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু উহা প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে উল্টা বুঝিয়া থাকে, আর ধর্ম্ম সকলও এ সম্বন্ধে বড় স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন না। আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই আবশ্যক। হৃদয় অবশ্য খুব শ্রেষ্ঠ—জীবনের অনুপ্রাণিত সত্য সকলই আমরা হৃদয় হইতে পাইয়া থাকি। হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক হইতে যদি আমার কিছুমাত্র মস্তিষ্ক না থাকে, অথচ একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শত শত বার পছন্দ করি। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি সম্ভব, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র হৃদয় নাই, কিন্তু কেবল মস্তিষ্ক, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।

'ঐ ঊ' প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণেও বর্ণের একাংশ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সেই স্থলেও আমরা এইরূপে প্রয়োগ সিদ্ধ করিব—"প্লুতাবৈচইদুতৌ" ৮।২।১১৬। (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দূর হইতে সম্বোধন করিলে সেই শব্দের টির প্লুত স্বর হয়, সুতরাং ঐ পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে যেখানে ঐকার এবং ঔকারের প্লুত স্বর প্রাপ্ত হইবে, সেখানে সেই ঐকার এবং ঔকারের অভ্যন্তরবর্ত্তী, ইকার ভাগ এবং উকার ভাগেরও প্লুত স্বর হইবে।) এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এইরূপ বলিতে হইবে? যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বেরও গ্রহণ হয়, তাহার মতে "গুরু স্বরবর্ণ বিশিষ্ট টির প্লুত হয়" বলিয়াই পদ সিদ্ধ হইবে (১)।

আর যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কোন দোষ হইবে না। কেন না তাহার মতে, এইস্থলে, 'প্লুতাবৈচইদুতৌ' এই সূত্র ন্যাস অর্থাৎ বিন্যস্ত করিব। তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধিও হইবে।

তুল্য-রূপ-বিশিষ্ট বর্ণ সংযুক্ত হইলে, তাহাতে দুই ব্যঞ্জন প্রযুক্ত বিধি প্রাপ্ত হইবে না।*

যদি সর্ব্বত্রই অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তবে যে স্থলে দুইটী সমান সমান বর্ণ সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে দুইটী ব্যঞ্জন বর্ণ প্রযুক্ত যে সকল বিধি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহা প্রাপ্ত হইবে না। যেমন, 'কুক্কুট' শব্দের 'ক্কু' বর্ণেতে, দুইটী ক কার সংযুক্ত হওয়াতে, সংযোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কু কারস্থিত উকার

(১) কোনও শব্দের মধ্যে যে সকল স্বর বর্ণ থাকে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ স্বরবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই শব্দ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণকে টি কহে। যেমন—'সীমন্' এই শব্দের মকার স্থিত অকার শব্দ শেষ স্বরবর্ণ হওয়াতে সেই অকার এবং তৎপরবর্ত্তী ন্ কার এই দুই বর্ণ (অন্) টি হইল।

"গুরোরনৃতোহনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্"। ৮।২।৮৫। (দূর হইতে কাহাকেও সম্বোধন করিলে, সেই সম্বোধন বাক্যের মধ্যবর্ত্তী গুরু স্বরবর্ণ প্লুত স্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঋকারের পরস্থিত স্বর প্লুত হয় না)

এই সূত্রে অপি শব্দ থাকাতে টিরও প্লুত স্বর হয়। সুতরাং অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হইলে, এই সূত্রানুসারেই প্লুতত্ব সিদ্ধি হইবে।

গুরু হইবে না (১)। এইরূপ ‘পিপ্পলী’ শব্দের পি কারস্থিত ইকার এবং পিত্ত শব্দের পি কারস্থিত ইকার কদাপি গুরু স্বর বিশিষ্ট হইবে না।

ভাষ্যমূল।—যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে তস্য দ্বৌ ককারৌ দ্বৌ পকারৌ দ্বৌ তকারৌ। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপি দ্বৌ ককারৌ দ্বৌ পকারৌ দ্বৌ তকারৌ। কথম্। মাত্রাকালোঽত্র গম্যতে। ন চ মাত্রিকং ব্যঞ্জনমস্তি। অনুপদিষ্টং সৎ কথং শক্যং বিজ্ঞাতুম্। অসচ্চ কথং শক্যং প্রতিপত্তুম্। যদ্যপি তাবদত্রৈতচ্ছক্যতে বক্তুং যত্রৈতন্নাস্ত্যণ্ সবর্ণান্ গৃহ্ণাতীতি। ইহতু কথম্। সঁয্যন্তা। সঁব্বৎসরঃ। যঁল্লোকম্। তঁল্লোকম্ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তাহার মতে কুক্কুট শব্দে দুই ককার, পিপ্পলী শব্দে দুই পকার এবং পিত্ত শব্দে দুই তকার সিদ্ধই আছে। তবে যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কুক্কুট শব্দে দুই ককার, পিপ্পলী শব্দে দুই পকার, পিত্ত শব্দে দুই তকার জানিতে হইবে।

কিরূপে?

কুক্কুট শব্দের মধ্যে, দুই ক কার মিলিত হইয়া এক মাত্রা হইয়াছে। সুতরাং ইহা কখনও এক বর্ণ হইতে পারে না। যেহেতু এক মাত্রা বিশিষ্ট একটি ব্যঞ্জন বর্ণ কুত্রাপি নাই। অথবা কোনও শাস্ত্রে উপদেশও হয় নাই। যাহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, সেইরূপ যে কোনও বর্ণ কোথাও আছে, তাহা কিরূপে জানিলে?

আর যদি তাহা নাই থাকিল, তবে তাহা কিরূপে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? যদিও এস্থলে ইহা বলিতে পার যে, ক কার উদিৎ হইয়াছে বলিয়া সবর্ণ সংজ্ঞায় গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং যেমন অকার গ্রহণে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সকল প্রকার অ কারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থলেও ক কার গ্রহণে এক মাত্রা, দুই মাত্রা, তিন মাত্রা বিশিষ্ট ক কারের গ্রহণ হইবে। যেহেতু “অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ”।

(অণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ অর্থাৎ স্বরবর্ণ এবং ‘য র ল ব হ’, এই সকল বর্ণ এবং উ কার ইৎ হইয়াছে যাহাদের সেই সকল বর্ণ, সবর্ণ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হয়) এই সূত্রানুসারে ক বর্গেরও সবর্ণ সংজ্ঞা হওয়াতে, একটী মাত্র অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট

(১) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের গুরু উচ্চারণ হইয়া থাকে। দীর্ঘেরও গুরু উচ্চারণ হয়।

ক কার গ্রহণে, তৎসবর্ণ এক মাত্রা বিশিষ্ট ক কারেরও গ্রহণ হইতে পারে। সুতরাং কুক্কুট শব্দের ক্কও এক মাত্রা বিশিষ্ট একটী বর্ণ হইবে। যদি এই রূপই হয়, তবে যে স্থলে 'অন্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণ নাই, সেই স্থলে কিরূপ হইবে? সয্ঁযন্তা, সব্ঁবৎসর, যল্ঁলোক, তল্ঁলোক ইত্যাদি স্থলে যে অনুনাসিক যঁকার বঁকার এবং লঁকার, তাহাদের ত অণ্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হয় নাই, সুতরাং এই স্থলে প্রাপ্তিও হইবে না এমন কি আচার্য্য পাণিনি অনুনাসিক যঁ বঁ লঁ এইরূপ স্বতন্ত্র বর্ণ কুত্রাপি পাঠ করেন নাই। (১)

ভাষ্যমূল।—যত্রৈতদণ্গ্রহণং সবর্ণান গৃহ্ণাতীতি অত্রাপি মাত্রাকালো গৃহ্যতে। ন চ মাত্রিকং ব্যঞ্জনমস্তি। অনুপদিষ্টং সৎ কথং শক্যং বিজ্ঞাতুমসচ্চ কথং শক্যং প্রতিপত্তুম্।

বঙ্গানুবাদ।—যে স্থলে 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ আছে, সেই স্থলে অণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত য র ল ব এই সকল বর্ণে সবর্ণ যঁ রঁ লঁ বঁ গৃহীত হইবে। সুতরাং সয্ঁযন্তা প্রভৃতি স্থলে য কারের দ্বিত্বও প্রাপ্তি হইবে।

পুনঃ এস্থলে তাহা হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে পূর্ব্ববৎ বিরোধই উপস্থিত হইবে। যেহেতু, ইহাতেও এক মাত্রা বিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের গ্রহণ করিতে হইবে। অথচ এক মাত্রা বিশিষ্ট কোনও ব্যঞ্জন বর্ণই নাই। আর পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণ, এক মাত্রা বলিয়া কোনও ব্যঞ্জন বর্ণ উপদেশ করেন নাই।

যদি আচার্য্যগণই উপদেশ না করিলেন, তবে সেইরূপ যে একটি বর্ণ সম্ভব হইতে পারে, তাহা কিরূপে জানিলে?

আর যদি সেইরূপ কোনও বর্ণই না থাকে, তবে তাহা কিরূপেই বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? অতএব অৰ্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

সূত্রমূল।—হ য ব র ট্॥ ৫॥

ভাষ্যমূল।—সর্ব্বে বর্ণাঃ সকৃদুপদিষ্টা অয়ং হকারো দ্বিরুপদিশ্যতে। পূর্ব্ব-

(১) যণো ময়োদ্বে বাচ্যে * (যণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, ময় প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে থাকিলে, পূর্ব্ব বর্ণ দ্বিত্ব হয়) এই বার্ত্তিকানুসারে, 'সম্' এই 'ম' কারের পরস্থিত, 'যন্তা' শব্দের 'য' কার পরে থাকিলে, সয্ঁযন্তা এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, যখন অনুনাসিক যঁ বঁ লঁ কোনও বর্ণ পাণিনি ঋষি পাঠ করেন নাই, তখন তৎপ্রযুক্ত কার্য্য ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে?

শৈচব পরশ্চ। যদি পুনঃ পূর্ব্ব এবোপদিশ্যেত পর এব বা। কশ্চাত্র বিশেষঃ। হকারস্য পরোপদেশেঽড়্গ্রহণেষু হগ্রহণম্ *। হকারস্য পরোপদেশেঽড়্গ্রহণেষু হগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। আতোঽটি নিত্যম্। শশ্ছোঽটি। দীর্ঘাদটি সমানপদে। হকারে চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ। মহাঁহিসঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অ ই উ ণ্। ঋ ৯ক্......(১) প্রভৃতি সূত্রে, অ, ই, উ, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণই একবার মাত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর হকার, হযবরট্ সূত্রে একবার, আর হল্ সূত্রে পুনর্ব্বার পাঠ করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সকল বর্ণই একবার একবার প্রয়োগ করা হইয়াছে; এই হকারটি দুইবার উপদেশ করিয়াছেন; একবার পূর্ব্বে (হযবরট্ সূত্রে), আবার পরে (হল্ সূত্রে)। যদি পূর্ব্বেই হইত, অথবা কেবল মাত্র পরেই উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে কি দোষ হইত? আর এই দুই বার পাঠ করিয়াই বা বিশেষ কি হইল?

'হ্' কার কেবল মাত্র পরে উপদেশ করিলে, অট্ প্রত্যাহার গ্রহণ কালে, পুনঃ হকারের গ্রহণ করিতে হইবে।*

শ ষ স র্। হল্। শেষস্থিত হল্ সূত্রে কেবল মাত্র হকার গ্রহণ করিলে, অট্ প্রত্যাহার গ্রহণ কালে একবার হকারের গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। যেন, আতোঽটি নিত্যম্ (১), শশ্ছোঽটি (২), দীর্ঘাদটি সমানপদে (৩), এই সকল সূত্রে, "হকার পরে থাকিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়।" অর্থাৎ এইজন্য

(১) পূর্ব্বে আক্ষরসামাম্নায়িক শব্দের ব্যাখ্যাসূচক টিপ্পনীতে অ ই উ ণ্ আদি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) অট্ প্রত্যাহার পরে থাকিলে, রুর পূর্ব্বস্থিত আকার স্থানে নিত্য অনুনাসিক হয়, যথা—"মহান্ + ইন্দ্রঃ" এইস্থলে ন কারের স্থানে রু হইলে পর, এই সূত্রানুসারে অনুনাসিক হইয়া, "মহাঁ ইন্দ্র" পদ সিদ্ধ হইল। সুতরাং অট্ মধ্যে, হকারের গ্রহণ হইলেই "মহাঁহিসঃ" পদ সিদ্ধ হইবে।

(৩) পদান্ত ঝয়ের পরস্থিত, শ কারের স্থানে ছ হয়, বিকল্পে, অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

(৪) দীর্ঘের পরস্থিত ন কার স্থানে রু হয়, বিকল্পে, অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, সেই ন কার এবং অট্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ, ইহারা উভয়েই যদি এক পদ স্থিত হয়; যথা;—"মহাঁহিসঃ" এই স্থলে, অট্ প্রত্যাহার স্থানে হকারের পাঠ না হইলে, অনুনাসিক 'হাঁ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

বলিতে হইবে, "মহান্ হিনঃ" এইস্থলে হকার পরে থাকিলেও "মহাঁহিনঃ" এইরূপ অনুনাসিক প্রয়োগ যাহাতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যদি অট্ প্রত্যাহার মধ্যে, হকারের পাঠ না করা যায়, তাহা হইলে, "আতোটি নিত্যম্" সূত্রানুসারে, মহাঁহিনঃ এই স্থলে হকারের স্থিত আকার অনুনাসিক হইবে না।

ভাষ্যমূল।—উত্বে চ *। উত্বে চ হকারগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে। হশি চ। হকারে চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ। পুরুষো হসতি ব্রাহ্মণো হসতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উত্বে হ কারের গ্রহণ কর্ত্তব্য *। উত্ব বিধায়ক শাস্ত্রেও হ কারের গ্রহণ কর্ত্তব্য হইবে।

"অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে" ৬।১।১১০। (অ প্লুত অ কারের পরস্থিত রু স্থানে উ হয়, অপ্লুত অকার পরে থাকিলে)। হশি চ ৬।১ ১১৪। (অপ্লুত অকারের পরস্থিত রু স্থানে উ হয়—হশ্ প্রত্যাহার পরে থাকিলে, যথা—শিবঃ বন্দ্যঃ শিবোবন্দ্যঃ) (১) এই সকল সূত্রে, অট্ প্রত্যাহার মধ্যে হকারের পাঠ না করিলে, হকার পরে থাকিলে, রু স্থানে উ হইবে না, এইজন্য "হকার পরে থাকিলেও রু স্থানে উ হয়" এইরূপ বলিতে হইবে। কেননা "পুরুষো হসতি" "ব্রাহ্মণো হসতি" এই সকল স্থলে, পুরুষঃ ও ব্রাহ্মণঃ শব্দের পর বিসর্গ স্থানে রু হইয়া, রু স্থানে উ হইলে, "পুরুষোহসতি" "ব্রাহ্মণোহসতি" ইত্যাদি প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে। অন্যথা হকার পরে থাকিলে, 'পুরুষোহসতি' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি পূর্বোপদেশঃ *। যদি পূর্বোপদেশঃ কিত্বং বিধেয়ম্। স্নিহিত্বা স্নেহিত্বা। সিস্নিহিষতি। সিস্নেহিষতি। রলোব্যুপধাদ্ধলাদেরিতি কিত্বং ন প্রাপ্নোতি।

---

(১) এইস্থলে শিব শব্দের প্রথমার একবচনে, 'সু' বিভক্তি করিয়া 'সু' র উ কার লোপ হইলে, স স্থানে রু করিয়া, "হশি চ" এই সূত্রানুসারে, রু স্থানে উ করিব। অতএব "শিব+উ" এ স্থলে উকারের গুণ বলিয়া "ও" করিলে, "শিবোবন্দ্যঃ" পদ সিদ্ধ হইবে। তদ্রূপ "পুরুষো হসতি" এইরূপ প্রয়োগ স্থলেও হকারের পূর্ব্বে গ্রহণ হইলেই, প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। নতুবা 'অট্' প্রত্যাহার মধ্যে হকারের গ্রহণ না হইলে, "পুরুষো হসতি" এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

বঙ্গানুবাদ।—যদি হকারের পরে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে যখন এত দোষ ঘটে, তখন হকারের কেবল মাত্র পূর্ব্বেই উপদেশ করা হউক ?*

যদি হকারের কেবল মাত্র পূর্ব্বে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে কিত্ত্ব বিধি, ক্স বিধি, ইট্ বিধি, এবং ঝশ্ সংজ্ঞাতেও হকারের গ্রহণ কর্ত্তব্য হইবে।

যদি হকারের কেবল মাত্র পূর্ব্বেই আদেশ করা যায়, তবে, কিত্ত্ব বিধানে হকারের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, স্নিহিত্বা, স্নেহিত্বা, সিস্নিহিষতি, সিস্নেহিষতি, ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু "রলোব্যুপধাদ্ধলাদেঃ সংশ্চ।' ১২২৬ (ই+উ= বি। দ্বিবচনে বী ই অথবা উ আছে উপধাতে যাহার এমন যে হল্ আদি এবং রল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণান্তবিশিষ্ট ধাতু, তাহার পরে ক্ত্বা প্রত্যয় এবং সন প্রত্যয় থাকিলে, বিকল্পে স ও ইট্ হয়, আর কিৎ হয়। যেমন:—ষ্ণিহ প্রীতৌ, এই ধাতুর উত্তর ক্ত্বা অথবা সন্ প্রত্যয় করিয়া কিৎ হওয়াতে, স্নিহিত্বা, সিস্নিহিষতি প্রভৃতি রূপ সিদ্ধ হয়) এই সূত্রানুসারে, হকার পরে থাকিলেও কিত্ত্ব প্রাপ্তি হইত না। কেন না রল্ প্রত্যাহার মধ্যে, হকারের পাঠ না থাকিলে, স্নিহ ধাতুর হকারও রল প্রত্যাহারান্তর্গত হইত না, সুতরাং উক্ত সূত্রানুসারে স্নিহ ধাতুতে কিত্ত্বও প্রাপ্তি হইত না, স্নিহিত্বাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না।

ভাষ্যমূল।—ক্সবিধিঃ। ক্সশ্চ বিধেয়ঃ। অধুক্ষৎ। অলিক্ষৎ। শল ইগুপধাদনিটঃ ক্স ইতি ক্সো ন প্রাপ্নোতি। ইড্ বিধিঃ। ইট্ চ বিধেয়ঃ। রুদিহি। স্বপিহি। বলাদিলক্ষণ ইণ্ ন প্রাপ্নোতি। ঝল্ গ্রহণানি চ। কিম্। অহকারাণি স্যুঃ। তত্র কো দোষঃ। ঝলো ঝলীতীহ ন স্যাৎ। অদাগ্ধাম্ অদাগ্ধম্। তস্মাৎ পূর্ব্বশ্চৈবোপদেষ্টব্যঃ পরশ্চ। যদি চ কিং চিদন্যত্রাপ্যুপদেশে প্রয়োজনমস্তি তত্রাপ্যুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি হ্ কারের কেবল পূর্ব্বেই উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে, 'ক্স' স্থলেও বিহিত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে, 'ক্স' বিধান প্রাপ্তি হইবে, সেইস্থলে হ কারের পরে থাকিলেও ক্স হইয়া থাকে, এইরূপ বিধান করিতে হইবে—যাহাতে "অধুক্ষৎ" "অলিক্ষৎ" প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইতে পারে। যদি হ কারের পরে উপদেশ করা না হয়, তবে "শলইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ" ৩।১।৪৫। (ই উ ঋ ৯ উপধাতে আছে যাহার, এমন যে শল্ অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ শ ষ স

হকারান্ত ধাতু, তাহার পরে যদি ইট্ ভিন্ন চ্লি (১) থাকে, তবে তৎ স্থানে ক্স আদেশ হয়। যথা—অঘুক্ষত) এই সূত্রানুসারে হকার নিমিত্তক ক্স আদেশ প্রাপ্ত হইবে না (২)।

ইট্ বিধানে অর্থাৎ হকার পরে থাকিলেও ইট্ বিধি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিধান করিতে হইবে—যাহাতে 'রুদিহি' 'স্বপিহি' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারে। যদি হকারের পরে উপদেশ করা না হয়, তবে 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও ইট্ আগম হইবে না। সুতরাং রুদিহি প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না (৩)।

আর হকারের পরে উপদেশ না থাকিলে, ঝল্ প্রত্যাহারেও হকার সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

কেন? ঝল্ প্রত্যাহারে, হকার সমূহের গ্রহণ নাই বা হইল, তাহাতে দোষ কি?

তাহাতে দোষ এই যে, "ঝলোঝলি" ৮।২।২৬। (ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত স কারের লোপ হয়, যদি ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকে) এই সূত্রে, ঝল্ প্রত্যাহারে, হকারের গ্রহণ হইবে না। সুতরাং দহ্ ধাতু হইতে 'অদাগ্ধাম্' 'অদাগ্ধম্' প্রভৃতি হকার নিমিত্তক প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এই সকল কারণেই 'হ' কারের পূর্ব্বে এবং পরে উভয়ত্রই উপদেশ করা কর্ত্তব্য। কেবল দুই বারই কেন, যদি অন্য কোনও স্থলে উপদেশ করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই স্থলেও উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্য্যতে। অয়ং রেফো যকারবকারাভ্যাং পূর্ব্ব এবো-

---

(১) লট্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর শপ্ আদেশ হয়। কিন্তু অতীত কালের ক্রিয়াতে লুঙ্ বিভক্তি হইলে, তৎস্থানে চ্লি আদেশ হয়।

(২) গুহ সংবরণে। গুহ্ ধাতুর লুঙেতে পূর্ব্ব সূত্রানুসারে, হকারের স্থানে ক্ষ আদেশ হইয়া 'অঘুক্ষৎ' পদ সিদ্ধ হয়। লিহ আস্বাদনে। লিহ্ ধাতুর লুঙেতে হকারের স্থানে ক্ষ আদেশ হইয়া, অলিক্ষৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

(৩) রুদির্ অশ্রু বিমোচনে। লোটের মধ্যম পুরুষ এক বচনে রুদিহি। ঞিষ্বপ্ শয়ে। মধ্যম পুরুষ একবচনে স্বপিহি। "রুদাদিভ্যঃ সার্ব্বধাতুকে" ৭।২।৭৬। (রুদ্ স্বপ্ শস্ অন্ যক্ষ্ এই সকল ধাতুর উত্তর, বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকিলে, সার্ব্ব ধাতুকে ইট্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে রুদ্ ও স্বপ্ ধাতুর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনে রুদিহি স্বপিহি প্রয়োগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পশ্চিস্মেত হরযবড়িতি। পরএব বা যথা ন্যাসমিতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ। রেফস্য পরোপদেশেঽনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণপ্রতিষেধঃ *। রেফস্য পরোপদেশে অনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এই যে রেফ্ (হ য ব র ট্ সূত্রের র কার) ইহা, যকার বকারের পূর্ব্বে 'হ র য ব ট্' এইরূপ উপদেশ করা যাইবে, অথবা পরেই গ্রন্থোক্ত উপদেশ ক্রমে অর্থাৎ হযবরট্ এইরূপ উপদেশ করা হইবে?

গ্রন্থোক্ত রূপে উপদেশ না করিয়া রূপান্তর করিলে, বিশেষ ফল কি লাভ হইবে?

বিশেষ ফল এই লাভ হইবে যে, রেফের পরে উপদেশ করিলে, অনুনাসিক, দ্বির্বচন পরসবর্ণ প্রভৃতি কার্য্যে নিষেধ হইবে*।

রেফ্ (র কার) পরে অর্থাৎ গ্রন্থোক্ত রূপ উপদেশ করিলে, রকার নিমিত্ত "অনুস্বার, দ্বিত্ব, অথবা পর সবর্ণ হয় না," এইরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—অনুনাসিকস্য। স্বর্ণয়তি। প্রাতর্ণয়তি। যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বেত্যনুনাসিকঃ প্রাপ্নোতি। দ্বির্বচনস্য। মদ্রহ্রদঃ ভদ্রহ্রদঃ। যর ইতি দ্বির্বচনং প্রাপ্নোতি। পরসবর্ণস্য। কুণ্ডং রথেন। বনং রথেন। অনুস্বারস্য যয়ীতি পরসবর্ণঃ প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—অনুনাসিক নিষেধের দৃষ্টান্ত যথা,—"স্বর্+নয়তি=স্বর্ণয়তি," "প্রাতর্+নয়তি=প্রাতর্ণয়তি" ইত্যাদি স্থলে "যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা" ৮।৪।৪৫। (পদান্ত যর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে বিকল্পে অনুনাসিক হয়), এই সূত্রানুসারে অনুনাসিক (রঁ) প্রাপ্ত হইত, কিন্তু তাহা প্রয়োগ বিরুদ্ধ বলিয়া, যর্ প্রত্যাহারের মধ্যে র কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বির্বচন নিষেধের দৃষ্টান্ত যথা, মদ্রহ্রদ ভদ্রহ্রদ, এইস্থলে, "অনচি চ" ৮।৪।৪৭ (অচের পরস্থিত যর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দ্বিত্ব হয়; কিন্তু অচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে হয় না), এই সূত্রানুসারে, এই স্থলে র কারের দ্বিত্বপ্রাপ্তি হইত। তাহা প্রয়োগ বিরুদ্ধ বলিয়া, র কার পরে থাকিলেও সেই অসংগত প্রয়োগই সিদ্ধ হইবে। তাহা না হয় এইজন্য ও রকারের পূর্ব্বে উপদেশ করা কর্ত্তব্য। র কার, য কার, ব কারের পরে উপদেশ করিলে, পরসবর্ণ প্রাপ্তি স্থলেও যে তাহা নিষেধ করা কর্ত্তব্য, তাহার দৃষ্টান্ত যথা,—"কুণ্ডং রথেন" "বনং রথেন।" এই সকল স্থলে, "অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ" ৮।৪।৫৮।

১৫৮ ৪৫৭ 400 C.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।] [৪০০ পৃষ্ঠার পর।
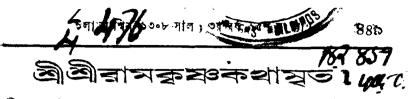
"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ এ সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত সংসারের কাজ করবে, যতই বিষয় চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

[উপায়—নির্জ্জনে সাধন।]

"কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখম তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই ব'সে না। তার পর নির্জ্জনে বসে, সব কাজ ফেলে, দই মন্থন করতে হয়। তবে, মাখম তোলা যায়।

"আবার দেখ এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে কেবল ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়, কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা করে।

"সংসার যেন জল, আর মনটী যেন দুধ। দুধ যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, আর খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুধকে দইপেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হলে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখম লাভ করবে। তার পর সেই মাখম সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়? ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান্ লাভ হয় না। তাই, টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ?"

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তু বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর স্ত্রীর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল, হাড় মাংস চরবি নাড়ি ভুঁড়ি মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ, ঈশ্বরকে ছেড়ে, কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস, তাঁর নাম গুণ গান, বস্তু বিচার; এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদ্‌লে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে?

গান।—ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে ইত্যাদি

"ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। তিন টান হলে, তবে তিনি দেখা দেন— বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান এবং সতীর পতির উপর টান, এই তিন টান যদি কাহারও একসঙ্গে হয়, তাহলে সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, আর বিষয়ী লোক যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা একত্র করলে যতখানি ভালবাসা হয়, ততখানি ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছাঁ কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখন হেঁশালে, কখন মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকে, আর কিছু জানেনা; মা যেখানেই থাকুক, এ মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

কৃষি-ব্যাঙ্ক বা পল্লী-ভাণ্ডার।

(শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।)

আমরা যে অর্থে কৃষি-ব্যাঙ্ক শব্দের ব্যবহার করিতেছি, তাহা ভাল রকমে বুঝিতে হইলে, উহাকে পল্লী-ভাণ্ডার বা পল্লী-ব্যাঙ্ক বলা উচিত। ব্যাঙ্ক শব্দটা কিছু গুরুতর ভাববাচক,—এবং উহার নামে যেন কলিকাতার সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা, আর তাহার মধ্যে ঝন্-ঝন, থন্-থন্, ঠন্-ঠন্ অবিরাম টাকার আওয়াজ, নোটের খস্ খস্ শব্দ প্রভৃতি মনে আসে, কিন্তু আমরা যে পল্লী-ব্যাঙ্কের কথা বলিতেছি, তাহাতে তত কিছু থাকিবে না—থাকিবে কেবল স্থানীয় শিল্প ও কৃষিজীবিগণের সাময়িক অর্থাভাব মোচনের উপায়। পল্লী-গ্রামেই কি,—সহরেই কি, সকল স্থানেই অনেক কারিকর, শিল্পজীবী ও কৃতী লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত তাহারা কোন কাজ সুশৃঙ্খলে করিয়া উঠিতে পারে না। আবার অনেক সময়ে আরব্ধ কাজও পয়সার অনা-টনবশতঃ শেষ করিতে পারে না। এই অর্থাভাববশতঃ কেবল যে তাহাদিগের স্ব স্ব ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে—ইহাতে দেশেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে। এই সকল ব্যক্তির ক্ষতি ও নিরুৎসাহ দেখিয়া অপরাপর লোকও কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, অধিকন্তু স্ব স্ব জাতীয় পেষাকেও অনাদর করিয়া থাকে; এই কারণেই দেশের শিল্প ও কারু কার্য্য এবং অর্থো-পার্জ্জনের সহজ সহজ উপায়ও ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। টাকার সচ্ছল থাকিলে স্বল্পলাভে লোকে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে, এবং স্বল্পলাভে জিনিষ বিক্রয় করিলে টাকা বা মূলধনটা অতি দ্রুতভাবে খাটিতে থাকে; ইংরাজিতে একটা কথা আছে, "Small profit but quick return" অর্থাৎ স্বল্পলাভ হউক, কিন্তু টাকাটা শীঘ্র ঘুরিয়া আসুক। বাস্তবিকই কথাটা অমূল্য। টাকা যত অধিক বার ঘুরিয়া আসিবে ততই অধিক লাভ, কিন্তু উহা ঘরে বসিয়া থাকিলে বেকার-ভদ্রসন্তানের ন্যায় উহারও কোন মূল্য নাই। বেকার ভদ্র-সন্তানগণ একেবারে হাকিমী পদ প্রাপ্তির আশায় (দুরাশায় বলিলেই ভাল হয়) ঘরে বসিয়া আত্মীয় স্বজনের উপার্জ্জিত অন্ন ধ্বংশ করেন এবং ক্রমশঃ পরিবার বৃদ্ধি করিয়া সংসারে অর্থকষ্ট ও দারিদ্রা আনয়ন করেন। মরা টাকা ঘরে পচে আর কৃপণকে ভয় দেখায়। অর্থ উপার্জ্জন করিতে যেমন চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হয়, কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে

হয়,—অর্থ বাড়াইবার জন্য সেইরূপ কিছু করা উচিত। আমাদিগের স্বভাব এই যে, উপার্জ্জিত অর্থকে আর ঘরের বাহির করিতে নারাজ, সদাই মনে হয়, "গেল—গেল।" অর্থবৃদ্ধি করিতে হইলে সাহস চাই, দূরদৃষ্টি চাই। পিতৃ-মাতৃবর্জ্জিত বকাটে বা কাপ্তেন বাবুগণ যে অবিমৃষ্যকারিতার সহিত জলবৎ ভাবে পয়সা খরচ করিয়া থাকেন, তাহাকে সাহস বলি না—তাহা উৎসন্ন যাইবার প্রশস্ত সোপান। উপার্জ্জন করিবার যেমন একটা প্রণালী আছে, খরচ করিবারও তদনুরূপ প্রণালী আছে এবং অর্থবৃদ্ধি করিবারও সেইরূপ কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যত অল্পলাভ হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু টাকাটা অধিক দিন আটক হইয়া থাকিলে অধিক লাভেও তাহার আয় দেখা যায় না। একটা টাকা যদি সমস্ত দিন খাটিয়া সন্ধ্যার সময় একটীমাত্র পয়সা লাভ দেয়, তাহা হইলে সেই টাকাটা একমাসে আট-আনা লাভ দিবে; এখন, সেই লাভাংশ যদি খরচ না করিয়া প্রতি মাসের শেষে মূলধনের সহিত সংযোজিত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া পুনরায় তদনুরূপ ক্ষুদ্র লাভে বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে টাকা বা মূলধনটা অতি শীঘ্র বাড়িয়া যায়। লোকে একেবারে অধিক লাভ খুঁজে, কাজেই জিনিষ বিক্রয় হইতে বিলম্ব হয়, টাকাও আটক থাকিয়া যায়, অগত্যা লাভাংশ মূলধনে সংযোজিত হইতে না পারিয়া উদরস্থ হইয়া যায়।

আমরা জানি, কলিকাতায় কোন কোন ব্যক্তি এমন তেজারতি করিয়া থাকেন—যাহাতে তাঁহার সুদ ও আসল মূলধন প্রতিদিন টাকা প্রতি এক পয়সার হিসাবে আদায় হইয়া সত্তর (৭০) দিনে সমুদায় উশুল হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে টাকা আদায় করিলে ঋণ-গৃহীতার টাকা ও সুদ উশুল দিতে কোনই কষ্ট বোধ হয় না, পরন্তু মহাজনও সহজে সুদ আসল আদায় করিয়া লাভবান্ হইয়া থাকেন। এই প্রণালীতে শ্রমজীবিগণ টাকা কর্জ্জ লইতে দ্বিধা করে না, কেন না ঐ টাকা শোধ করিতে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না অথচ আসল টাকাটাও তাহাদের হাতে থাকিয়া যায়। এই প্রণালীতে যে ব্যক্তি ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করে, সে প্রতিদিন নিজে খাটিয়া ও সেই ৫০ টাকাকে খাটাইয়া অনায়াসে প্রতিদিনই এক টাকা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত সহজেই উপার্জ্জন করিতে পারে; সুতরাং সেই লাভাংশ হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সাড়ে বারো আনা মহাজনকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অবশিষ্ট যাহা থাকে—চারি আনা হউক,আট আনা হউক বা বারো আনা হউক, তাহাতেই তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে; অবশেষে দুইমাস দশ দিন পরে সেই কর্জ্জের টাকাটা তাহার নিজস্ব মূলধন হইয়া যায়। কার্য্যের পরিসর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিলে, সে ব্যক্তি পুনরায় উল্লিখিত প্রণালীতে ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিতে পারে।

যে সকল ব্যপারী সদা সর্ব্বদা মহাজনদিগের সহিত কার-কারবার করিয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন মহাজনদিগের বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকে,তাহারা মহাজনদিগের নিকট হইতে নগদমূল্য না দিয়াও পণ্যদ্রব্য আনিতে পারে। এরূপ ধারে জিনিষ আনিলে নির্দ্দিষ্ট মুদ্দৎ বা সময় মধ্যে মহাজনের টাকাটা আদায় দিতে হয় এবং সচরাচর এই মুদ্দৎ ত্রিশ দিন বা এক চল্লিশ দিন হইয়া থাকে। উক্ত মুদ্দৎ মধ্যে যদি টাকাটা মহাজনকে চুকাইয়া দিতে পারা যায়, তবে পুনরায় ধারে জিনিষ আনিতে পারা যায়। এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে, আনীত সামগ্রীকে বিক্রয় করিয়া, বিনা ওজরে মহাজনের টাকা পরিশোধ করিলে পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, তাহাকে Credit কহে। ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তিই এই Credit আর সেই Credit বা বিশ্বাস স্থাপনের মূল সাধুতা। সংসারে সাধুতা ব্যতীত কোন কাজই হয় না; যাহারা ইহার অপব্যবহার করিয়া পরের অর্থ উদরসাৎ করে, তাহাদিগকে আজন্ম কষ্ট পাইতে হয়। পরের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া হয়ত আপাততঃ নিজের কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্থায়ী লাভ না হইয়া বরং সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। অপর ব্যক্তি যে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বিনা জামিনে অর্থ ঋণ দেয়, অথবা বিনা নগদমূল্যে তোমায় জিনিষ ছাড়িয়া দেয়, তাহার কি কোন কারণ নাই? ইহা ব্যবসায়ের একটা অঙ্গ এবং ধার না লইলে বা না দিলে কোন ব্যবসা চলিতে পারে না। সামান্য ফোড়ে বা ফিরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া মহা ধনী ব্যক্তিদিগের কারবার পর্য্যন্ত—সকলের মধ্যে অল্পাধিক ঋণ আছে। তবে যাহারা ঋণ পরিশোধ করিতে তৎপর, মহাজনের টাকা সর্ব্বাগ্রে চুকাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র, তাহাদিগের ব্যবসাই স্থায়ী হয় এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আবার এক শ্রেণীর ব্যবসাদার আছে, তাহাদিগের মতলব 'বাজার মারা' অর্থাৎ প্রথম আড়ম্বর করিয়া দোকান পাট করা, অবশেষে মহাজনদিগের মালপত্র লইয়া, বিক্রয় করতঃ 'গণেশ উল্টাইয়া' দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে ইহারা ব্যবসাদার নহে—জুয়াচোরের দল। কার্য্যগতিকে যে কোন কোন

ব্যক্তি সময়ে সময়ে দেনাদার হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে আমরা অবশ্য এ শ্রেণীর অন্তর্ভূত করি না, কেন না ব্যবসা করিলে কেহ লাভবান্ হয়, কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পল্লীগ্রামে কৃষক ও প্রজাদিগকে বীজের বা খোরাকের জন্য ধার দেওয়া একরকম নিরাপদ ব্যাবসায়। যখন ফসল জন্মে, প্রজাগণ তাহার অধিকাংশই বিক্রয় করিয়া ফেলে, আবার আবাদ করিবার পূর্ব্বে বীজের জন্য ধান্য কর্জ্জ লয়; কেহ কেহ বা নিজ খরচের মত ধান্য রাখিয়াও পরে খরচ অথবা অর্থাভাব বশতঃ বিক্রয় করিয়া ফেলে ; তজ্জন্য পুনরায় কর্জ্জ লইতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর লোক যে ধান্য কর্জ্জ লয়, তাহা নগদ টাকা দিয়া পরিশোধ না করিয়া, পরবর্ত্তী ফসল উৎপন্ন হইলে তাহার দ্বারা শোধ দেয়। মহাজন বা কর্জ্জদাতা ধান্য কর্জ্জ দিবার হেতু মূলের অর্দ্ধেক বা সমান অংশ সুদ হিসাবে পাইয়া থাকে। যে স্থলে এক মন ধান্য বা গোধূম কর্জ্জ দিয়া দেড় মন পাওয়া যায়, তাহাকে 'দেড়ী' এবং যে স্থলে দুই মন পাওয়া যায়, তাহাকে 'দুনো' বলে। এই দেড়ী বা দুনোর নিয়মে কর্জ্জ দিলে টাকা অতি শীঘ্রই বাড়িয়া যায়, আর ও দিকে ঋণ—মায় সুদ—পরিশোধ দিতে ঋণগৃহীতার কোন কষ্ট হয় না। সুদটা ভাসাচক্ষে কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উক্ত সুদের পরিমাণকে ন্যায্য বলিয়া মনে হইবে। কারণ যে সময়ে কর্জ্জ দেওয়া যায়, তখন সেই ফসলের যে বাজার মূল্য হওয়া উচিত, নূতন ফসল উঠিবার সময়ে তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্যের মূল্য যদি দুই টাকা হয়, তবে আশ্বিন বা অগ্রহায়ণে উহার নূতন ফসলের মূল্য হয়ত এক টাকা কি পাঁচসিকা মাত্র হইতে পারে। কাজেই সুদের হার ঐরূপ বেশী না করিলে, মহাজনকে মহার্ঘের সময় কর্জ্জদান ও সস্তার সময় আদায় করিতে হয় বলিয়া, বিশেষ ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। আবার এমনও হইয়া থাকে, হয়ত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্যের মূল্য সমধিক অধিক—বাজার দর তিন টাকা, অথচ আদায় কালে সেই সস্তাদরের দেড়া বা দুনো লইতে হইল। ইহাতে মহাজন আপাততঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া কর্জ্জ দেওয়া বন্ধ রাখা চলে না। যদি কেহ বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী ফসলে আর তাঁহার আয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। চাষীকে চাষ করিবার সুযোগ করিয়া না দিলে কোথা হইতে আয় হইবে? যাঁহারা ক্রয় বিক্রয়ের কারবার করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তাঁহারা

বাজারের সস্তা দরে মাল খরিদ করিয়া রাখেন এবং বাজার দর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অল্প বা অধিক পরিমাণে মাল বিক্রয় করিতে থাকেন।

কর্জ্জ লেন-দেন করিবার পথ প্রশস্ত না থাকায় শ্রমজীবিগণ স্থানীয় অভাব পূরণোপযোগী কাজ করিয়া উঠিতে পারে না; তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব। কর্ম্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ দিন দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহারই উপর নির্ভর করতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মূলধনের এতই অভাব যে অগ্রিম কোন কাজ করিয়া পরে তাহার দাম বা মজুরী লইবার জন্য ইহারা অপেক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং কোন জিনিষ বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত রাখিতে পারে না। জিনিষ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিলে যত অধিক পরিমাণে বিক্রয় হওয়া সম্ভব, অগ্রিম মূল্য দিয়া বা মজুরী দিয়া কোন দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে হইলে তত বিক্রয় হওয়া সম্ভব নহে। দোকানে জিনিষ মজুত থাকিলে অনেকে আপাততঃ সে জিনিষের আবশ্যক না থাকিলেও ভাবী ব্যবহারের জন্য উহা ক্রয় করিতে পারে। লোকে কোন একটা সুসজ্জিত দোকানে বিশেষ কোন জিনিষ কিনিতে গেলে সেই জিনিষের সঙ্গে অপর জিনিষও ক্রয় করিয়া থাকে—ইহা সকলেই অবগত আছেন।

আজকাল সহর হইতে যাঁহারা দূরে অবস্থান করেন,তাঁহারা নানাবিধ জিনিষের অভাব সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন এবং তাহার কারণ এই যে, নিকটে তাহা পাওয়া যায় না; পরন্তু সহর হইতে আনাইতে হইলে সেই দুই একটা অল্প মূল্যের জিনিষের জন্য ডাক মাসুল, রেলের মাসুল প্রভৃতিতে অনেক খরচ পড়িয়া যায়। একে ত আবশ্যকীয় মনের মত জিনিষ পাওয়া দুষ্কর, এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাও উপস্থিত মত পাওয়া যায় না বলিয়া আজকাল অধিকাংশ মফঃস্বলের লোক সহর হইতে জিনিষ পত্র খরিদ করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে খরচ কিছু অধিক পড়ে বটে, কিন্তু জিনিষটা মনের মত হয় এবং শীঘ্র পাওয়া যায়; সুতরাং লোকে আর অনিশ্চিতের উপর আস্থা স্থাপন করে না। পোষ্ট-আপিসের যে ভ্যালু-পেয়েবল্ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে মফঃস্বলের বহুল অভাব দূর হইয়াছে,—ইহাতে পোষ্টাল বিভাগ লাভবান্ হইতেছে বটে,—ভদ্রলোকের অভাব কমিয়াছে বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকের অর্থের উপরে গ্রামের লোকের যে একটা স্বার্থ ছিল বা আছে, তাহা আর থাকিতেছে না। সহরের সাহেব কি দেশী লোক ইহারা সকলে বেশ দু'পয়সা রোজকার করিতেছে, কিন্তু

পল্লীগ্রামের লোকের কষ্ট বাড়িতেছে। একজোড়া জুতা,দুইটা জামা বা একখানা কাপড়ের আবশ্যক হইলে যখন সহর হইতে আনিতে হইতেছে,তখন পল্লীগ্রামের মুচী,চামার,দরজী বা তন্তুবায় আর কাজ পাইবে কোথায় ? কাজেই তাহাদিগের দরিদ্রতা বাড়িতেছে। এখনও যাই হউক দেশের টাকাটা অনেক পরিমাণে দেশে থাকিতেছে—মফঃস্বলের টাকা সহরে গিয়া পড়িতেছে এইমাত্র। কিন্তু যে দিন ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতে ভ্যালু পেয়েবলে জিনিষ আসিতে আরম্ভ হইবে, সেই দিন আমাদিগের সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত হইবে। দেশীয় লোক যাহারা সহরে থাকিয়া কারবার করিয়া খাইতেছে,তাহারা লাভের কতক অংশ দেশে রাখিতেছে ; সাহেবদিগের যে সব দোকান পাট চলিতেছে, তাহাতেও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে দেশের অনেক লোক প্রতিপালিত হইতেছে ; কিন্তু বিলাতী ভ্যালু-পেয়েবল্ প্রথা প্রচলিত হইলে এ সকলের মূলে যে একেবারে কুঠারাঘাত পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? বিলাতের লোকের যত অর্থ-কৃচ্ছ্র বাড়িবে—দারিদ্র বাড়িবে, ভারতে ততই জিনিষ সরবরাহের পথ প্রশস্ত হইবে। ইংলণ্ডবাসীর সুখসমৃদ্ধি ও আরাম বৃদ্ধি করিবার জন্যই ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ; সুতরাং যাহাতে তাহাদিগের সেই সব অভাব পূর্ণ হয়, ইংরাজকে তাহাই করিতে হইবে। ইংরাজ আমাদিগের জন্য যতটুকু করেন, তাহা পরার্থপরতার হিসাবে, সে জন্য আমরা ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ। ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি মাত্র—ভারতবর্ষকে আমরা স্বদেশ বলিতে পারি না, কেননা দেশের উপর আমাদিগের কোন সত্ত্ব বা অধিকার নাই। আমরা প্রজাসত্ত্বে সত্ত্ববান্ মাত্র,ভূসত্ত্বে আমাদের কোন অধিকার নাই। তবে যে আমরা দেশ দেশ করিয়া বড়াই করি, সেটা পুরাকালের অভ্যাস হেতু অথবা স্বাধীন ইয়ুরোপের অনুকরণ মাত্র। একজন চীন বা তুর্ক, বা আফ্গানবাসী রাজকর দিয়া এদেশে বাস করিলে ভারতের উপর তাহার যে সত্ত্ব জন্মে, তোমার আমার তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী অধিকার বা সত্ত্ব আছে কি ?—কথাটা অতি রুক্ষ তাহা জানি, কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে যখন কথাটা আসিয়া পড়িল, তখন সে সম্বন্ধে দুই কথা না বলিলে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে বলিয়া তাহার আলোচনা করিতে হইল। (ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৪৩২ পৃষ্ঠার পর।

শুভদিনে শুভক্ষণে যাদবসনাথ শিষ্য-মণ্ডলী তীর্থদর্শনার্থ আর্য্যাবর্ত্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুত্রবিরহ অসহ্য হইলেও ধর্ম্মশীলা কান্তিমতী তনয়ের এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেন নাই। কিয়দ্দিবস পরে ধীরে ধীরে সশিষ্য যাদব বিন্ধ্যাচল পাদবর্ত্তী গোণ্ডারণ্যে উপনীত হইলেন। তথায় লোক সমাগম এত বিরল যে, নাই বলিলেই হয়। উপযুক্ত দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া দুর্বৃত্ত অধ্যাপক শিষ্যগণকে সেই নৃশংস ও ভয়ঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বদ্ধপরিকর হইতে কহিলেন। গোবিন্দ ইহা জানিতে পারিলেন। সরলপ্রকৃতিক রামানুজ এ দুরভিসন্ধির বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার নির্ম্মল, স্নেহপূর্ণ কোমল হৃদয় কখনও কি কোন ভয়ঙ্কর দানবোচিত নৃশংস ভাবকে পোষণ করিতে পারে? পবিত্র ব্যক্তি সকলকেই পবিত্র বলিয়া মনে করেন। একদিন রামানুজ ও গোবিন্দ পথপার্শ্বস্থ কোন সরোবরে পাদ প্রক্ষালন করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় রামানুজকে নির্জ্জনে পাইয়া গোবিন্দ তাঁহাকে সমুদয় কহিলেন। তীর্থদর্শন ব্যপদেশে পিশাচ-স্বভাব নরাধমগণ যে তাঁহার জীবননাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "দুর্বৃত্তগণ এই নির্জ্জন অরণ্যে অনতিবিলম্বেই তোমার বধ সাধন করিবে। সুতরাং তুমি পশ্চাৎপদ হইয়া কোথাও লুকাইয়া পড়।" ইহা বলিয়া গোবিন্দ অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তিনি শিষ্যদলের মধ্যে নাই। তখন সকলে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল। কিন্তু সেই বিজন, বৃক্ষসমাকীর্ণ, অল্পালোক অরণ্যে কেহই তাঁহার কোনও তত্ত্ব পাইল না। তাহারা তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চারিদিকে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। অবশেষে, রামানুজ নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া সকলে অন্তরে সাতিশয় প্রীত হইল, কেবল মাত্র গোবিন্দকে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া বাহিরে বিপুল দুঃখের আকার দেখাইতে লাগিল। যাদব তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা শিষ্যগণকে জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইতে লাগিলেন, এবং "কেহ কাহারও নয়" বলিয়া গোবিন্দকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা

হইলেন। মাৎসর্য্য যে মানবকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলে, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাধ-দম্পতি।

গোবিন্দ সন্নিধানে উক্ত হৃৎকম্পজনক, ভয়ঙ্কর, অশুভবার্ত্তা শুনিয়া রামানুজ ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইল। ক্ষণপরে চাহিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে যাদবশিষ্যগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিতেছেন। বেলা তখন একদণ্ড মাত্র। অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্ক যুবক সেই নির্জ্জন অরণ্যে সহায়হীন বান্ধবহীন হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন "গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করি", আবার ভাবিলেন তাহা হইলে অন্যান্য শিষ্যেরা জানিতে পারিবে। ক্রমে বৃক্ষান্তরালে গোবিন্দ অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখন এক অননুভূতপূর্ব্ব ওজঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে প্রফুল্লিত করিয়া তুলিল, এবং ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"ভয় কি ? নারায়ণ আছেন।" রামানুজ কাল বিলম্ব না করিয়া দস্যুস্বভাব সহাধ্যায়ী-গণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মার্গ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিগ্‌ভাগস্থ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। একবারও পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত না, করিয়া দুই প্রহর কাল ক্রমাগত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। মধ্যে, তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কেহ যেন তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া তিনি আরও দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও ক্লান্তিতে একবারে চলৎশক্তিরহিত হইয়া এক বৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন। বসাও তাঁহার কষ্টকর বোধ হওয়ায় তিনি তথায় শয়ন করিলেন এবং সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার আলিঙ্গনে সমগ্র সংসার বিস্মৃত হইলেন। জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে সূর্য্যদেব অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বেলা অপ-রাহ্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ক্ষুধা ও ক্লান্তি কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তিনি আপনাকে সাতিশয় বলিষ্ঠ অনুভব করিয়া ত্রিতাপহারী হরিকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মুখ হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিতে-ছেন, এমন সময়ে দেখেন যে এক ব্যাধদম্পতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তদভি-

মুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাধপত্নী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আহা বৎস, তুমি কি পথ হারাইয়া এই বিজন বনে একাকী বসিয়া আছ? তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, তোমার বাটী কোথায়?" শ্রীরামানুজ কহিলেন, "আমার বাটী এখান হইতে অনেক দূর। দক্ষিণদেশে কাঞ্চিপুরের নাম শুনিয়াছ কি? সেই খানে।" ব্যাধ ইহা শুনিয়া কহিল, "এই দস্যুবহুল ভয়ঙ্কর অরণ্যে কিরূপে আসিলে। এখানে দিবাভাগেও কোন পথিকদল গতিবিধি করিতে সাহস করে না। তদ্ব্যতীত হিংস্র জন্তু সমূহ নির্ভয় চিত্তে এখানে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করে। কাঞ্চিপুর আমি জানি। আমরাও সেইদিকে যাইতেছি। এই ভয়ঙ্কর দেশে তোমায় একাকী দেখিয়া তোমার তত্ত্ব লইতে আসিলাম।" রামানুজ কহিলেন, "তোমাদের জন্মভূমি কোথায়, এবং কি জন্যই বা কাঞ্চিপুরে যাইতেছ।" ব্যাধ কহিল, "বিন্ধ্যাচলপাদবর্ত্তী কোন বন্য পল্লীতে আমাদের জন্ম। সমুদয় জীবন ব্যাধের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নৃশংসভাবে আয়ুঃ শেষ করিতেছি, ইহা ভাবিয়া আমি ও আমার পত্নী পারলৌকিক হিতের জন্য তীর্থ দর্শনার্থ বাহির হইয়াছি। কাঞ্চিপুর হইয়া ৺রামেশ্বর যাইবার ইচ্ছা। ভাল হইল, তোমার ন্যায় সৎপুরুষের সঙ্গ পাইলাম। তুমি, বোধ হইতেছে, পথভ্রান্ত হইয়াছ। ভীত হইও না! সর্ব্বলোকশরণ্য পরমেশ্বর তোমার রক্ষা-বিধানের জন্যই যেন আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছেন।" সেই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, লোহিতলোচন ব্যাধের রূপ দর্শন করিয়া রামানুজ যদিও প্রথমতঃ কিছু ভীত হইয়াছিলেন, তথাপি উহার বদনমণ্ডলে এক প্রকার স্নেহসংমিশ্র গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ থাকায়, কথায় এক প্রকার চিত্তাকর্ষক মাধুর্য্য থাকায়, এবং তদীয় ভার্য্যার স্নেহবিপুল সরল সম্ভাষণে, তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে সমুদয় সংশয় দূর হইল এবং তিনি তাহাদের অনুসরণ করিতে সম্মত হইলেন। বেলা অধিক ছিল না। ব্যাধ কহিল, "চল, আমরা শীঘ্র শীঘ্র এই অরণ্য প্রদেশ পার হইয়া অনতিদূরে এক সুবিস্তৃতা, অন্তঃশিলা নদী আছে, তাহার তীরে অদ্য রজনী যাপন করি।" দণ্ডদ্বয় গমন করিয়া তাহারা নদীতীরে উপনীত হইল। তথায় কাষ্ঠ খণ্ড আহরণ পূর্ব্বক ব্যাধ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার পার্শ্বস্থ কর্ব্বুরভূমির কিয়দংশ সমতল করতঃ তথায় রামানুজকে বিশ্রাম করিতে কহিল, এবং আপনিও পত্নীর সহিত অপর পার্শ্বে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ব্যাধপত্নী ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমি সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, এখানে জল কোথায় পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে পার?" ব্যাধ কহিল, "রজনী

আগত প্রায়। এখন এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কল্য প্রাতঃকালেই অনতিদূরে এক সুন্দর সোপান বিশিষ্ট কূপ আছে, তাহার নির্ম্মল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিও।" ব্যাধপত্নী সম্মত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রামানুজ ব্যাধ দম্পতির অনুগামী হইলেন। একদণ্ড কাল গমন করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। সোপানমার্গ দ্বারা তন্মধ্যে অবরোহণ করিয়া রামানুজ মুখ হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক, নির্ম্মল সুশীতল উদকপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, এবং অঞ্জলিপূর্ণ জল উপরে আনিয়া ব্যাধপত্নীকে পান করাইলেন। এইরূপ বারত্রয় করিলেও ব্যাধ পত্নীর বলবতী পিপাসা শান্ত না হওয়ায় তিনি চতুর্থবার কূপে অবরোহণ পূর্ব্বক জল সংগ্রহ করিয়া উপরে আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইলেন না। ইতস্ততঃ নয়ন বিক্ষেপ করিয়া কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন না। তিন, চারি নিমেষের মধ্যে তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে ভাবিলেন ইঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা। লক্ষ্মী নারায়ণ ব্যাধ-দম্পতি রূপে তাঁহার পথ প্রদর্শক ও রক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি অদূরে মন্দির চূড়া ও বহুগৃহ সমাবেশ দেখিয়া স্থির করিলেন যে উহা কোনও নগর হইবে। পরে জনৈক পথিককে নিকটে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ স্থানের নাম কি?" পথিক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "কিহে, তুমি আকাশ হইতে পড়িলে না কি? সুবিখ্যাত কাঞ্চি নগরী চিনিতে পারিতেছ না? তোমার আকারে বুঝিতেছি যে তুমি এ দেশীয়, কিন্তু কথা কহিতেছ যেন বিদেশীর ন্যায়। তুমি তো মহাত্মা যাদবপ্রকাশের শিষ্য? আমি তোমায় অনেকবার এই কাঞ্চিপুরীতে দেখিয়াছি। এই যে কূপ দেখিতেছ, যাহার জলে তুমি মুখ হাত ধৌত করিয়াছ, যাহার পার্শ্বে ঐ প্রকাণ্ড এবং বহু প্রাচীন শালবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে, ইহার বিষয় তুমি না জানিতে পার। ইহার নাম শালকূপ। ইহার জল ত্রিতাপনাশক, এই জন্য বহুস্থান হইতে তীর্থজ্ঞানে লোকে ইহার জলপান কামনায় আসিয়া থাকে।" পথিক এই বলিয়া চলিয়া গেলে, রামানুজ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই ব্যাধ দম্পতিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই মানসিক জড়তা দূর হইল। তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন লক্ষ্মী নারায়ণের অপার করুণাই তাঁহার রক্ষার কারণ। তিনি প্রেম-

বিহ্বলচিত্তে, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীমন্নারায়ণপাদপদ্মের উদ্দেশে এই বলিয়া বন্দনা করিলেন,

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বন্ধু-সমাগম।

ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীরামানুজ বার বার শালকূপকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, এবং হয়তো শ্রীদ্বিতীয় শ্রীপতি ব্যাধদম্পতিবেশে পুনরায় তাঁহার নয়ন মন সার্থক করিতে পারেন, এই আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে। দুই একটি স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে লইয়া নগরের দিক্ হইতে কূপোদক সংগ্রহের জন্য, সেই নগর প্রান্তবর্ত্তী, বিশালশাখতরুতলস্থিত, নির্ম্মলসলিল, কূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তথা হইতে কাঞ্চিপুর প্রায় অর্দ্ধক্রোশদূরে অবস্থিত। পূর্ব্ব, উত্তর এবং পশ্চিম পার্শ্বে বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ বনস্থলী থাকায় সেখানে লোক-সমাগম অতি বিরল। সুতরাং রামানুজ হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রাণেশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করতঃ পূর্ণমাত্রায় তাহা আস্বাদন করিতেছিলেন। তিনি কণ্ঠোক্ত সুমধুর স্তবে তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন,

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥

কুন্তির ন্যায়, তিনি এই বলিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে প্রার্থনা করিলেন,

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্॥
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।১,১৮।

"হে জগদ্‌গুরো, তোমার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বদা বিপদই হউক, কারণ বিপদের সময়েই তোমার দর্শন লাভ হয়। তোমায় দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যে সকল ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যবান, রূপবান্, এবং পণ্ডিত হইয়া উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের সাতিশয় গৌরবান্বিত মনে করে, তোমার নাম গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই, কারণ অকিঞ্চন ভক্তেরাই তোমায় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। হে প্রভো, এ জগতে যাঁহাদের কিছুই আপনার বলিবার নাই, সেই সকল ভক্তের তুমিই একমাত্র ধন। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কামের অতীত হইয়া নিরন্তর স্বীয় আত্মাতেই পরম রতি লাভ কর। বাসনা বেগ তোমাতে নাই বলিয়া সর্ব্বতোভাবে শান্ত, তুমি নিখিল জীবের মুক্তি-দাতা, তোমায় বন্দনা করি।" প্রেমে বিভোর হইয়া ভাগ্যবান রামানুজ যখন অশ্রু-স্বেদকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারের বিগ্রহবান্ আধাররূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় কলসকক্ষা তিনজন পুরস্ত্রী কূপের নিকট আগত হইলেন। তদ্দর্শনে তিনি ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক স্বস্থ হইয়া বাটীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

পুত্রবিরহে মাতা কান্তিমতী রোদন করিতেছেন। এমন সময়ে প্রিয়তম নন্দনকে অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিয়া, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু, রামানুজ পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণত হইয়া অবনত মস্তকে, "মা, এই আমি আসিলাম, তোমাদের সব কুশল তো?" এই অমৃততুল্য সুমধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিলে, তখনই তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি বৎসের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বসিতে কহিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুই যে এত শীঘ্র একা ফিরিয়া আসিলি? গোবিন্দ কোথায়? শুনিয়াছি গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে প্রায় ছয় মাস লাগে। তুই কি পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিস?" রামানুজ আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিলে, তিনি যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া একেবারে সিহরিয়া উঠিলেন, এবং ঈশ্বরানুগ্রহ স্মরণ ও পুত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি অনতিবিলম্বে নারায়ণের ভোগ রন্ধনার্থ পাকশালায় চলিলেন। আনন্দে কি রাঁধিবেন, কি করিবেন কিছুরই ঠিকানা নাই। চুল্লির নিকট যাইয়া দেখেন কাষ্ঠ নাই। আজ দুই তিন দিন হইল কাষ্ঠ ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামানুজ গৃহে নাই, নববধূমাতাও পুত্রের তীর্থগমনাবধি পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, কাহার জন্য রন্ধন? তিনি ভগবন্নিবেদিত সামান্য ফল মূল আহার করিয়া দুই দিন কাটাইয়াছেন। সুতরাং কাষ্ঠের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ

অত্য তাঁহার মন রামানুজের জন্য সাতিশয় চঞ্চল হওয়ায় একান্তে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। গৃহের কথা তাঁহার কিছুই মনে ছিল না। আপণে গিয়া আপনিই কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আনিবেন, দাসী এখনও আসে নাই, পুত্র অনেক ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কষ্ট দিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী দীপ্তিমতী বধূমাতা সমভিব্যাহারে গৃহের অপর দ্বার দিয়া আসিয়া চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগ্নি, ভাল আছ তো? দাসী যাইয়া সমাচার দিল যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের জন্য দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেছ। তাই তোমায় দেখিতে আসিলাম। ভাবনা কি? নারায়ণ আছেন। তিনি বৎসদের রক্ষা করিবেন। কতলোক গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। রামানুজ ও গোবিন্দ না আসা অবধি আমি তোমার এখানেই থাকিব। বধূমাতাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। দাসী আপণ হইতে কাষ্ঠাদি ক্রয় করিয়া—"। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে রামানুজ আসিয়া মাতৃস্বসার চরণ প্রণাম করিলেন। সহসা ভাগিনেয়কে সম্মুখে দেখিয়া দীপ্তিমতী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হস্ত দ্বারা রামানুজকে উত্থাপিত করিয়া "বৎস, চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং গোবিন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন। কান্তিমতী ভগ্নী ও বধূকে পাইয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। লজ্জাশীলা বধূ এই আকস্মিক প্রিয় সমাগমে বিপুলহর্ষভারেই যেন পতিপদতলে অবনত হইয়া পড়িলেন ও প্রেমাশ্রুজলে তাহা ধৌত করিতে লাগিলেন। আচার্য্যভবনে সেই সময় যেন স্বর্গের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইত্যবসরে দাসী ঘৃত, শর্করা, তণ্ডুল, শাক, লবণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ রন্ধন-সম্ভার আনয়ন করিলে, ভগ্নীদ্বয় পরমপ্রীতিসহকারে বহু উপচার বিশিষ্ট নারায়ণের ভোগ রন্ধন করিলেন। নৈবেদ্য নারায়ণকে নিবেদন করিয়া গৃহবহির্দ্বারে রামানুজ আসিয়া দেখেন, যে শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ লোকমুখে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে সমুদ্র যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুবিশাল অসংখ্য তরঙ্গরূপ করমালা উত্থাপিত করিয়া সুধাকরকরসমূহকে সাদরে গ্রহণ করেন, সেইরূপ শ্রীরামানুজকে সন্দর্শন করিয়া শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও পুলকাঙ্কিতকলেবরে স্বীয় করযুগলদ্বারা প্রণমনোন্মুখ রামানুজের করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক, আপনার শূদ্রত্ব খ্যাপন করতঃ, তাঁহাকে পরম সমাদরে উঠাইয়া লোকাচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন।

রামানুজ তখন তাঁহাকে কহিলেন, "মহাত্মন্, আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারও দর্শন পাইলাম। কৃপা করিয়া অদ্য এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। সকলই প্রস্তুত।" শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ সম্মত হইলেন।

রামানুজের গৃহে সে দিবস যে আনন্দ হইয়াছিল, তদীয় পিতার পরলোক গমনাবধি সেইরূপটি আর কখনও হয় নাই। যদিও গোবিন্দ না থাকায় দীপ্তিমতীর কিছু ক্ষুব্ধ হইবার কথা, তথাপি তাঁহার রামানুজের প্রতি এতাদৃশ পুত্রনির্বিশেষ স্নেহ এবং শ্রীমন্নারায়ণের নিরবচ্ছিন্ন কৃপায় এতাদৃশ বিশ্বাস যে তাঁহার মনে কণামাত্র ক্ষোভেরও স্থান হওয়া দূরে থাক, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সে দিবস আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ।)

মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম।

আমরা বিগত ১১ই জুলাই তারিখে আমাদিগের অনাথাশ্রম হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছি ঃ—'গত ৪ঠা জুলাই এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ও কালেকটার শ্রীযুক্ত বি, এলেন মহোদয় আশ্রম দর্শন করিয়া এক কালীন ১০৲ দশটাকা দিয়াছেন এবং মাসিক ২৲ দুই টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মনিন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় অবিরত আশ্রমের নানাপ্রকার সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি আশ্রমের কর্ম্মচারীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। আশ্রমগৃহনির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৩ লক্ষ ইট্ প্রস্তুত হইল। সদাশয় মহারাজা উহার জন্য দুই হাজার মণ কয়লা ও আবশ্যকীয় অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। লালগোলাধিপতি শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সাহেব সম্প্রতি আশ্রমের কয়েকটী বালককে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া কতকগুলি তৈজস, ৮৫৲ টাকা নগদ, কয়েকটী ছাতা ও ৫ থান্ কাপড় দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যক; সুতরাং সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ রূপে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই ক্রমে ক্রমে আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে।

আমরা শীঘ্রই আশ্রমের আয় ব্যয়ের এবং আনুপূর্ব্বিক অন্যান্য সকল বিবরণ পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হইব।

(স্বাক্ষর) অখণ্ডানন্দ।'

কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক অসুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই--হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলন। আমার বলার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, খানিকটা হৃদয় ও খানিক মস্তিষ্ক লইয়া পরস্পর সামঞ্জস্য করি, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচার বুদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে? জগৎ কি অনন্ত নহে? জগতে অনন্ত পরিমাণ ভাববিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ শিক্ষা ও বিচারেরও অবকাশ আছে। উহারা উভয়েই অনন্ত পরিমাণে আসুক—উহারা উভয়েই যেন সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইতে থাকুক।

এইরূপ, অনেকে প্রণালীই ব্যাপারটী বুঝেন এবং খুব স্পষ্ট ভাষাতেই উহা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয়, একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দ্বারা, ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে দুঃখ আছে, অতএব সংসার ত্যাগ কর--ইহা খুব শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সংশয় নাই। 'সংসার ত্যাগ কর'। সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে—ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের ইহাই তাৎপর্য্য হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়গত জীবন—আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, তাহা ত্যাগ করা হয়, তবে কি অবশিষ্ট থাকে? যদি আমরা ইহা ত্যাগ করি, তবে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

যখন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশে আসিব, তখন আমরা ইহা আরো ভাল করিয়া বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্ত কি শিক্ষা দিতে চান তাহা বলিতে পারি—বেদান্ত শিক্ষা দেন, জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিতে।

বেদান্ত, প্রকৃত পক্ষে, জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথাও তদ্রূপ নাই, কিন্তু

ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে- নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রহ্মীভাব--জগৎকে আমরা যে ভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর, এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্রহ্মরূপে দেখ—বাস্তবিকও উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে--বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল, তাহার প্রথম পুস্তকেই--আমরা দেখিতে পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,' ঈশ-উপ-১ম শ্লোক। 'জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে।'

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে; জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে, তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময়, বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এইরূপে আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি? ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি? তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নহে, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। সন্তানসন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি? ছেলে গুলিকে লইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে—যেমন সকল দেশে মনুষ্য-পশুরা করিয়া থাকে? কখনই নহে--উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা ত ধর্ম্ম নহে। তবে কি? সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই। জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে--সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ। কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত ইহাই বলেন। তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর, কারণ তোমার অনুমান অতি অল্প অনুভূতির উপর-খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের দুর্ব্বলতার উপর স্থাপিত। ওই আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর--আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে জগতে অতিশয় আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র। উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, এইরূপে জগতের অস্তিত্ব কখনই ছিল না—উহা স্বপ্ন—মায়া মাত্র। সেই প্রভুই একমাত্র ছিলেন। তিনিই সন্তান সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে,

তিনিই ভালোর মধ্যে, তিনিই মন্দেতে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীর মধ্যে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে বর্ত্তমান।

বিষম প্রস্তাব বটে!

কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে চান। এই বিষয় লইয়াই বেদান্তের আরম্ভ।

আমরা এইরূপেই জীবনের বিপদ্ ও দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অসুখী করে কিসে? আমরা যে কোন দুঃখভোগ করিয়া থাকি, বাসনা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—দুঃখ। অভাব না থাকিলে দুঃখও থাকিবে না। যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তখন কি হইবে? দেয়ালেরও কোন বাসনা নাই, উহা কখন দুঃখ ভোগ করে না। সত্য, কিন্তু উহা কোন উন্নতিও করে না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, উহার কোন কষ্টও নাই, কিন্তু উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে। সুখ ভোগের ভিতরেও এক মহান ভাব আছে, দুঃখ ভোগের ভিতরেও তাহা আছে। যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, দুঃখের উপকারিতাও আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি মহৎ শিক্ষা হয়। শত শত কার্য্য আমরা জীবনে করিয়াছি, যাহা, পরে বোধ হয়, না করিলেই ভাল ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল কার্য্য আমাদের মহৎ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে। আমি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কায করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত—আমি কিছু সৎকার্য্য করিয়াছি বলিয়াও সুখী, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ, উহাদের প্রত্যেকটীই আমাকে এক এক মহৎ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এক্ষণে যাহা, তাহা আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম ও চিন্তা সমষ্টির ফল স্বরূপ। প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তারই একটী না একটী ফল আছে, আর আমি মোট এইটুকু উন্নতি করিয়াছি যে, আমি বেশ সুখে কাল কাটাইতেছি। তবেই এক্ষণে সমস্যা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বুঝি, বাসনা বড় খারাপ জিনিষ, কিন্তু বাসনা ত্যাগের অর্থ কি? দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে? এই সেই পূর্ব্বোক্তার মত আত্মহত্যা-কর উপদেশ হইবে—বাসনাকেও সংহার কর, তার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষকেও মারিয়া ফেল।

এক্ষণে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। তুমি যে বিষয় রাখিবে না, তাহা নহে; আবশ্যকীয় জিনিষ, এমন কি, বিলাসের জিনিষ পর্য্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক এবং যে সকল জিনিষ তুমি কখন কখন চাও না, তাহাও রাখ, কিন্তু সত্যকে জান, সত্যকে প্রত্যক্ষ কর। এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। তুমিত কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কেহ নহে। সবই সেই প্রভুর সম্পত্তি, কারণ, উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে সকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন, তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, তাহার মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর অলঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপে সকল জিনিষ দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যদি তুমি তোমার প্রতি গতিতে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে, তোমার চেহারায়—সকল জিনিষে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে সমুদয় দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখময়রূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।

'স্বর্গ রাজ্য তোমার ভিতরে'; বেদান্ত বলেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই আছে, আর সকল ধর্ম্মেও উহা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। 'যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুনুক।' উহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। বেদান্ত এ বিষয়ও প্রমাণ করিতে অগ্রসর। অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমরা উহা হারাইয়াছি, আর সমুদয় জগতে ঐ সত্য পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া কষ্ট ভুগিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিন্তু উহা বরাবর আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে কার্য্য করিতে হইবে।

যদি সংসার ত্যাগ কর, এই উপদেশ সত্য হয়, আর যদি উহা উহার প্রাচীন স্থূল অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে দাঁড়ায় এইঃ—আমাদের কোন কায করিবার আবশ্যকতা নাই, আমরা অলস হইয়া মাটির ঢিপির মত বসিয়া থাকি, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কায করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য হইয়া এধার ওধার ভ্রমণ করিতে থাকি। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত

উপদেশের অর্থ বাস্তবিক ইহা নহে। আমাদিগকে কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে। সাধারণ মানবগণ, যাহারা বৃথা বাসনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমাণ, তাহারা কার্য্যের কি জানে? যে ব্যক্তি নিজের ভাবরাশি ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, সে কার্য্যের কি জানে? সেই কায করিতে পারে, যে কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত নহে। তিনিই কার্য্য করিতে পারেন, যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনিই কায করিতে পারেন, যাঁহার কার্য্য হইতে কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একখানি চিত্রকে কে অধিক সম্ভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না, চিত্র-দ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব কিতাব লইয়া ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি। তাহার মাথায় উহা ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে, ও দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যিনি সেখানে কোনরূপ বেচা কেনার মতলবে যান নাই। তিনি ছবি খানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই একটী চিত্র স্বরূপ; যখন এই সকল বাসনা চলিয়া যাইবে, তখনই লোকে জগৎকে সম্ভোগ করিবে, তখন এই কেনা বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক স্বামিত্ব-ভাব চলিয়া যাইবে। তখন কর্জ্জদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর ছবি। ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই:—'সেই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমুদয় জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, আর নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত।' বাসনা ত্যাগ হইলেই, আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব কবিতা পাঠ ও সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আড়াল, আবডাল, আনাচ কানাচ, সকল গুপ্ত অন্ধকারময় স্থান, যাহা আমরা পূর্ব্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে সকল দাগ এত কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা আপনা আপনি হাসিব আর ভাবিব, এই সব কান্না চীৎকার, এসব যাহা করিতেছিলাম, তাহা ছেলে খেলা মাত্র, আমরা জননীস্বরূপে ঐ খেলা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলেন, এইরূপেই প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিবে। বেদান্ত আমা-

দিগকে কার্য্য করিতে বলেন, কিন্তু প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া, এই আপাতঃ প্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিয়া। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সর্ব্বত্রে ঈশ্বর দর্শন: এইরূপেই প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যতকিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ করিয়া লও, কেবল উহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন কর, উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবন ধারণ কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কর। এইরূপে কার্য্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। আর কোন পথ নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় সংসারের বিলাস বিভ্রমে মগ্ন হয়, সে প্রকৃত পথ পায় নাই, বুঝিতে হইবে, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপর দিকে, যে ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটী শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর, বীভৎস, শুষ্ক হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই দুটাই বাড়াবাড়ি—দুটাই ভ্রম—এদিক্ আর ওদিক্। উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট—উভয়েই পথভ্রষ্ট।

বেদান্ত বলেন, এইরূপে কার্য্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি, ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, করিবার আমাদের কেবল ইহাই আছে—জিজ্ঞাসা করিবার কেবল ইহাই আছে—কারণ, ঈশ্বর সকল বস্তুতে, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইব? প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া, অবশ্য আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্ম্মফল তোমাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। কর্ম্মফল আর তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যতকিছু দুঃখকষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই সকল বৃথা বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলিতে ঈশ্বর বুদ্ধি দ্বারা উহারা পবিত্র হয়, ঈশ্বরস্বরূপ হয়, তখন উহারা আসিলেও তাহাতে আর কোন অনিষ্ট হয় না। যাহারা এই রহস্য না জানিয়াছে, ইহা না জানা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই আসুরিক জগতে বাস করিতে হইবে। লোকে জানে না, এখানে, তাহাদের চতুর্দ্দিকে

সর্ব্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আসুরিক জগতের অর্থ কি? বেদান্ত বলেন—অজ্ঞান।

বেদান্ত বলেন, আমরা অনন্তসলিলপূর্ণা তটিনীর তীরে বসিয়া তৃষ্ণায় মরিতেছি। রাশীকৃত খাদ্যের সম্মুখে বসিয়া আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি। এই এখানে আনন্দময় জগৎ রহিয়াছে। আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা ইহার মধ্যে রহিয়াছি। ইহা সর্ব্বদাই আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই উহাকে অন্য কিছু বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি। বিভিন্ন ধর্ম্মসকল আমাদের নিকট সেই আনন্দময় জগৎ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্বেষণ করিতেছে। সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ধর্ম্মের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, তাহা কেবল কথার মারপেঁচমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নয়। একজন একটী ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন আর একটু অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়ত আর এক ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। তার পর হয়ত আমি একটু সুখ্যাতি লাভের আশায় অথবা আমার নিজের মনের মত চলিতে ভালবাসি বলিয়া বলিলাম, 'এ আমার মৌলিক মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবনে পরস্পর ঈর্ষ্যাদ্বেষাদির উৎপত্তি।

এ সম্বন্ধে আবার এক্ষণে নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা ত খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি কর—সব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে—তখন সমুদয় বিষয় প্রকৃতরূপে সম্ভোগ করিতে পারিব, কিন্তু যাই আমি সংসারক্ষেত্রে নামিয়া গুটিকতক ধাক্কা খাইলাম, অমনি আমার ব্রহ্মবুদ্ধি সব উড়িয়া গেল। আমি রাস্তায় চলিতে চলিতে ভাবিতেছি, সকল মানুষেই ঈশ্বর বিরাজমান—একজন বলবান্ লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, অমনি চিৎপাৎ হইয়া পড়িলাম। ঝাঁ করিয়া উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল—মুষ্টি বদ্ধ হইল—বিচার শক্তি হারাইলাম। একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। সব স্মৃতি চলিয়া গেল—ঈশ্বর না দেখিয়া আমি ভূত দেখিলাম। জন্মিবামাত্রই উপদেশ পাইয়াছি, সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন কর, সকল ধর্ম্মই ইহা শিখাইয়াছে—সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেষ্টা-

মেন্টে যীশুখ্রীস্টও এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি—কিন্তু কাযের বেলায়ই আমাদের গোল আরম্ভ হয়। ঈসপ-রচিত আখ্যানাবলীর ভিতর একটী গল্প আছে। একটী বৃহৎকায় সুন্দর হরিণ একটী হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, 'দেখ আমি কেমন বলবান্, আমার মস্তক অবলোকন কর—উহা কেমন চমৎকার, আমার হস্তপদ অবলোকন কর, উহারা কেমন দৃঢ় ও মাংসল, আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি, সে এই কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। যাই শুনা, অমনি দ্রুতপদে পলায়ন। অনেক দূর দৌড়িয়া গিয়া আবার হাঁফাইতে হাঁফাইতে শাবকের নিকট ফিরিয়া আসিল। হরিণ শাবক বলিল, 'এই মাত্র আপনি বলিতেছেন, আপনি খুব বলবান্—তবে কুকুরের ডাকে পলাইলেন কেন?' হরিণ বলিল, 'তাইত, তাইত, কুকুর ডাকিলেই আর কিছু জ্ঞান থাকে না।' আমরাও সারাজীবন তাই করিতেছি। আমরা দুর্ব্বল মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাকিলেই সেই পাগ্‌লা হরিণের মত পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এ সকল শিক্ষা দিবার কি আবশ্যক? বিশেষ আবশ্যক আছে। বুঝিয়া রাখা উচিত, এক দিনে কিছু হয় না।

'আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পারে, এমন কি, যে সামান্য কীট ভূমিতে বিচরণ করিতেছে, সেও উপরে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা কতদূরে! মন সর্ব্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়। আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ। আদর্শ সকল আমাদের অনেক দূরে, আর আমরা এই নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের একটী আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ না লইয়াই জীবনের এই অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি সহস্রটী ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে দশ সহস্র ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটী আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত পারি, শুনিতে হইবে, শুনিতে

রেকে দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের কুলে (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে দরিদ্র যোগীদিগের কুলে জন্ম ইহা (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে) ধনবান্‌দিগের কুলে জন্ম অপেক্ষা দুর্লভতর, যথোক্ত বিশেষণ-যুক্ত দরিদ্র যোগীগণের কুলে (জন্মই স্পৃহণীয়তর ইহাই তাৎপর্য্য) ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—তত্র তং পৌর্ব্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং (সঃ) লভতে, (ততশ্চ) হে কুরুনন্দন! ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ।—সেই জন্মে (সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পূর্ব্বজন্মকৃত বুদ্ধিসংযোগ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর যোগসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য পুনর্ব্বার যত্ন করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্য।—যস্মাৎ তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং, যততে চ প্রযত্নং করোতি ততস্তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাৎ ভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধি-নিমিত্তং হে কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণে সেই যোগীগণের কুলে বুদ্ধিসংযোগ, (অর্থাৎ) পূর্ব্ব জ্ঞানের সংস্কার লাভ করিয়া থাকে; (ঐ সংস্কার কি প্রকার তাহাই লিখিতেছেন) পৌর্ব্বদেহিক (অর্থাৎ) পূর্ব্ব জন্মের দেহে উৎপন্ন, সেই কারণে সেই সংস্কারের বশে যোগসিদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রযত্ন করিয়া থাকে, হে কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সন্।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—সঃ অবশঃ সন্ তেনৈব পূর্ব্বাভ্যাসেন হ্রিয়তে। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

মূলানুবাদ।—সেই অবশ হইয়া সেই পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগমার্গে প্রবর্ত্তিত হয়। যে ব্যক্তি যোগের জিজ্ঞাসু, সেও সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের ফলকে অতিক্রমণ করিতে পারে (যে যোগ করিয়া থাকে তাহার ত কথাই নাই) ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্য।—কথং পূর্ব্ব বুদ্ধিসংযোগ ইতি তদুচ্যতে। যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতঃ অভ্যাসঃ স পূর্ব্বাভ্যাসঃ তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে হি যস্মাৎ অবশঃ অপি স যোগভ্রষ্টঃ। ন কৃতং চেৎ যোগাভ্যাসসংস্কারাদ্বলবত্তরমধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণ হ্রিয়তে। অধর্ম্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগজোঽপি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব। তৎক্ষয়েতু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশস্তস্যাস্তীত্যর্থঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ সোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততে অপাকরিষ্যতি, কিমুত বুদ্ধা যোযোগং তন্নিষ্ঠোঽভ্যাসং কুর্য্যাৎ ?॥ ৪৪।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বদেহের বুদ্ধিসংযোগ কি প্রকারে হয় তাহাই বলা হইতেছে। পূর্ব্ব জন্মে যে অভ্যাস করা হইয়াছে, তাহাকেই পূর্ব্বাভ্যাস বলা যায়। সেই বলবান্ পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা অবশ হইলেও সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি হৃত (অর্থাৎ যোগমার্গে প্রবর্ত্তিত হয়); যদি যোগাভ্যাসজনিত সংস্কার অপেক্ষা প্রবল অধর্ম্মাদিলক্ষণ নিন্দিত কর্ম্ম, সে ব্যক্তি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যোগাভ্যাসজনিত সংস্কারের দ্বারা ঐ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি হৃত হইয়া থাকে; আর যদি সেই সংস্কার হইতে প্রবল কোন অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অধর্ম্মের দ্বারা তৎকালে সেই যোগজ সংস্কারও পরিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ অধর্ম্মের ক্ষয় হইলে (সময়ে) সেই যোগজ সংস্কার নিজ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; অনেককাল (অব্যক্তভাবে) থাকিলেও ঐ যোগজ সংস্কারের একেবারে বিনাশ হয় না ইহাই অর্থ। যে ব্যক্তি যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিয়া "যোগমার্গে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মসংন্যাস করে" (এতটুকু মূলে না থাকিলেও সামর্থ্যবশতঃ বুঝিয়া লইতে হইবে) অথচ যোগভ্রষ্ট হয়,সেও শব্দব্রহ্মকে অতিবর্ত্তন করে অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলকে অপাকৃত করিতে পারে, যে ব্যক্তি কিন্তু যোগের স্বরূপ বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া অভ্যাস করে, তাহার পক্ষে আর কি বলা যাইবে ?॥ ৪৪॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫॥

অন্বয়।—প্রযত্নাৎ যতমানঃ সংশুদ্ধকিল্বিষো যোগী অনেক জন্মসংসিদ্ধঃ (সন্) ততঃ পরাং গতিং যাতি॥ ৪৫॥

মূলানুবাদ।—প্রযত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে করিতে ক্ষীণপাপ যোগী অনেক জন্মে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥ ৪৫॥

ভাষ্য।—কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি প্রযত্নাদ্‌যতমানঃ অধিকং যতমান ইত্যর্থঃ। তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষঃ বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেন অনেক-জন্মকৃতেন সংসিদ্ধঃ অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ লব্ধসম্যগ্‌দর্শনঃ সন্ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্॥ ৪৫।

ভাষ্যানুবাদ।—কেন যোগিত্বং শ্রেয়ঃ (তাহাই বলা হইতেছে)। প্রযত্নপূর্ব্বক যতমান (অর্থাৎ) অতিশয় যত্নকারী, সেই যোগ বিষয়ে, "যোগী" বিদ্বান্, "সংশুদ্ধকিল্বিষ" বিশুদ্ধকিল্বিষ (অর্থাৎ) বিগতপাপ, অনেক জন্মে অল্প অল্প সংস্কার সমূহের সঞ্চয় করিয়া সেই অনেক জন্মকৃত সঞ্চিত সংস্কার সমূহের সামর্থ্যে সম্যক্ প্রকার সিদ্ধ (অর্থাৎ) লব্ধযথার্থজ্ঞান হইয়া পরে প্রকৃষ্ট গতিকে লাভ করিয়া থাকে॥ ৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥

অন্বয়।—যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকোমতঃ (তথা) জ্ঞানিভ্যোঽপি অধিকঃ মতঃ (তথা) কর্ম্মিভ্যোঽপি অধিকঃ মতঃ তস্মাৎ হে অর্জ্জুন ত্বং যোগী ভব॥৪৬॥

মূলানুবাদ।—যোগী তপস্বীগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মত, যোগী জ্ঞানী সমূহ হইতেও অধিক বলিয়া স্বীকৃত এবং যোগী কর্ম্মী সমূহ হইতেও অধিক বলিয়া বিবেচিত, এই কারণে হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও॥ ৪৬॥

ভাষ্য।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী, জ্ঞানিভ্যোঽপি জ্ঞান-মত্র শাস্ত্রপাণ্ডিত্যং তদ্বদ্ভ্যোঽপি মতোজ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি কর্ম্মিভ্যঃ অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম তদ্বদ্ভ্যঃ অধিকো বিশিষ্টঃ যস্মাৎ তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণে এই প্রকার সেই কারণে যোগী তপস্বীগণ হইতে অধিক, এবং জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক (অর্থাৎ) শ্রেষ্ঠ; এখানে শাস্ত্র পাণ্ডিত্যই জ্ঞানশব্দের অর্থ। এই প্রকার কর্ম্মীগণ হইতেও যোগী অধিক অর্থাৎ বিশিষ্ট; যেহেতুক এই প্রকার, সেই জন্য, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও॥ ৪৬॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমোমতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বেষামপি যোগিনাং (মধ্যে) যঃ শ্রদ্ধাবান্ (সন্) মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে স (যোগী) মে (মম) যুক্ততমোমতঃ ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ।—সকল যোগীগণের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাবান হইয়া মৎপরায়ণ অন্তঃকরণে আমাকে ভজনা করে, সকল যোগী অপেক্ষা সেই যোগীই যুক্ততম ইহা আমার মত ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্য।—যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরাণাম্ মধ্যে মদ্‌গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেন অন্তরাত্মনা অন্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাং স মে মম যুক্ততমোহতিশয়েন যুক্তোমতোহভিপ্রেত ইতি ॥৪৭॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাশাঙ্করভাষ্যেহভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যোগিনামিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। রুদ্র কিংবা আদিত্যাদির ধ্যানপরায়ণ সকল যোগীগণের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাতে চিত্তের সমাধান পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার নিকটে সেই ব্যক্তি, সকল যোগী হইতে অতিশয় যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা শাঙ্করভাষ্যানুবাদে অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।—ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যতি তচ্ছৃণু॥ ১ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ যোগং যুঞ্জন্ (সন্) সমগ্রং মাং যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি তং শৃণু॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ, আমাতে হৃদয় আসক্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া যোগ সাধন করিতে করিতে যে প্রকারে সমগ্র আমাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিতে পারিবে তাহা (বলিতেছি), তুমি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমোমতঃ॥

ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেব ঈদৃশং মদীয়ং তত্ত্বং এবং মদ্‌গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুঃ (ভগবান্ উবাচ) ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বরে

কুর্ব্বন্, মদাশ্রয়ঃ অহং এব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ঃ, যোহি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি, স তৎসাধনং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি তপোদানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে, অয়ং তু যোগী মামেব আশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে হিত্বা অন্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি। যস্ত্বমেবংভূতঃ সন্ অসংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ আসক্তং মনোযস্য স ময্যাসক্তমনা, হে পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ এবমেব ভগবানিতি তৎ শৃণু উচ্যমানং ময়া॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সকল যোগীগণের মধ্যে মদ্গত হৃদয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, সেই আমার নিকট যুক্ততম বলিয়া সম্মত" এই বাক্যের দ্বারা প্রশ্নের বীজ নিজেই সূচনা করিয়া, "আমার এই প্রকার তত্ত্ব এইরূপে মদ্গতচেতা হইতে হয়" ইত্যাদি উত্তর বলিবার অভিপ্রায়ে (ভগবান্ বলিলেন) আমাতে (আমার কি বিশেষণ তাহা বলা যাইবে এবং আমিই পরমেশ্বর ইহাও বলা যাইবে) যাহার হৃদয় আসক্ত হয়, তাহাকে আমাতে আসক্তমনাঃ বলিয়া জানিবে। হে পার্থ (এবং) যোগকে অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ) মনঃ সমাধান করিয়া "মদাশ্রয়," আমি একমাত্র পরমেশ্বরই যাহার আশ্রয় সেই মদাশ্রয়, যে কোন এক ব্যক্তি যেমন স্বর্গাদিরূপ পুরুষার্থের কামনা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সেই স্বর্গাদি প্রয়োজনের সাধন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তপস্যা বা দান প্রভৃতি কোন আশ্রয়কে প্রাপ্ত হয়, এই ব্যক্তি কিন্তু অন্য সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই আশ্রয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং আমাতেই আসক্তচেতা হয়। হে অর্জ্জুন, তুমিও এই প্রকার হইয়া যে প্রকারে সমস্ত, বিভূতি বল শক্তি ও ঐশ্বর্য্যাদি গুণযুক্ত আমাকে অখণ্ডভাবে বিনা সংশয়ে জানিতে পারিবে (অর্থাৎ) ভগবান্ সর্ব্বদা এই প্রকারই, এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে তাহা আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর॥ ১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥

অন্বয়।—অহং তে সবিজ্ঞানং ইদং জ্ঞানং অশেষতো বক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে॥ ২॥

মূলানুবাদ।—আমি তোমাকে এই স্বানুভবযুক্ত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ

দিতেছি, যে জ্ঞান লাভ্ করিতে পারিলে এ জগতে কোন বস্তু আর জ্ঞাতব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকিবে না (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবে) ॥ ২ ॥

ভাষ্য।—তচ্চ মদ্বিষয়ং জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি অশেষতঃ কার্ৎস্নেন। তজ্ জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায়। যদ্ জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনং অবশিষ্যতে নাবশেষো ভবতীতি মত্তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্ব্বজ্ঞোভবতীত্যর্থঃ। অতো বিশিষ্টফলত্বাৎ দুর্লভং জ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই মদ্‌বিষয় জ্ঞান আমি তোমাকে বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবের সহিত এই অশেষভাবে বলিতেছি। (এক্ষণে সেই বিবক্ষিত জ্ঞানের স্তুতি করিতেছেন,উদ্দেশ্য শ্রোতার শুনিবার জন্য আগ্রহ বর্দ্ধন করা) যে জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইলে এই সংসারে, পুনর্ব্বার কোন জ্ঞাতব্য পুরুষার্থ সাধন অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ অবশেষ থাকিয়া যায় না, আমার তত্ত্বকে যে জানে সে সর্ব্বজ্ঞ হয় ইহাই অর্থ, এই প্রকার বিলক্ষণ ফল লাভের প্রতি হেতু বলিয়া এই জ্ঞান দুর্লভ ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি (যততে), যততাং (যতমানানাং) সিদ্ধানাং (মধ্যে) কশ্চিৎ (এব) মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সহস্র সহস্র মনুষ্যগণের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করে, আবার সেই যত্নপর যোগীগণের মধ্যে কোন একজন আমাকে যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥

ভাষ্য।—কথমিত্যুচ্যতে মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি প্রযত্নং করোতি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থং। তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং সিদ্ধাএব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে, তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কেন এইরূপ তাহা বলা হইতেছে,অনেক সহস্র মনুষ্যগণের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে,সেই সকল প্রযত্নপর সিদ্ধগণের মধ্যে (যাহারা মোক্ষ লাভের জন্য যত্ন করে তাহারাই ত সিদ্ধ) কোনও একজন আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

অন্বয়।—ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ এবং চ ইতি অষ্টধা ভিন্ন মে প্রকৃতিঃ॥ ৪॥

মূলানুবাদ।—পৃথিবী জল অনল বায়ু আকাশ মনঃ বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট ভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত হইয়া থাকে॥ ৪॥

ভাষ্য।—শ্রোতারং প্ররোচণেনাভিমুখীকৃত্যাহ। ভূমিরিতি পৃথিবী-তন্মাত্রমুচ্যতে, ন স্থূলা ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ইতি বচনাৎ। তস্মাদবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেব উচ্যন্তে। আপোঽনলঃ খং, মন ইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারঃ গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বং, অহঙ্কার ইতি অবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তং। যথাবিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহ-ঙ্কার ইত্যুচ্যতে, প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য। অহঙ্কার এবহি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজম্ দৃষ্টং লোকে। ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মম ঐশ্বরী মায়া শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্ররোচকবাক্যের দ্বারা শ্রোতাকে শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত করিয়া বলিতেছেন যে ভূমিঃ ইত্যাদি। এই যে ভূমি শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে ইহার অর্থ পৃথিবীতন্মাত্র (অর্থাৎ স্থূল পৃথিবীর উপাদান গন্ধময় তন্মাত্র) স্থূল পৃথিবী ইহার অর্থ নহে। কারণ "আমার প্রকৃতি এই অষ্টভাগে বিভক্ত" এই প্রকার বচন রহিয়াছে (অর্থাৎ প্রকৃতি শব্দের অর্থ কারণ "উপাদান" স্থূলভূত পৃথিবী প্রভৃতি কোন তত্ত্বের কারণ বা উপাদান নহে, ইহারা তন্মাত্র রূপ তত্ত্বের কার্য্য, সুতরাং ইহারা কখনই প্রকৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না, এইজন্য এইস্থানে ভূমিশব্দের অর্থ পৃথিবীতন্মাত্রই বলিতে হইতেছে।) এইপ্রকার জল প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও সেই সেই তন্মাত্রেরই উক্তি হইয়াছে (ইহা জানিবে) এইরূপ জল, অনল, বায়ু এবং আকাশ। মনঃ শব্দের অর্থ এইস্থলে মনের কারণ অহঙ্কারকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধি শব্দের দ্বারা অহঙ্কারের কারণ মহত্তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে। অহঙ্কার এই শব্দটীর অর্থ অবিদ্যা-সংযুক্ত অব্যক্ত। যেমন বিষসংযুক্ত অন্নকে বিষ বলা যায়, সেইরূপ অহঙ্কার-বাসনাযুক্ত অব্যক্ত মূলকারণও অহঙ্কার শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়, কারণ অহঙ্কারই প্রবৃত্তির প্রতি হেতু। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে সকলেরই প্রবৃত্তির বীজ অহঙ্কারই হইয়া থাকে। এই যে প্রকার বলা হইল, (অর্থাৎ)

ভূমি প্রভৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত আমার প্রকৃতি ইহাই আমার ঐশ্বরী শক্তি, ইহাকেই মায়া বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগত্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো ইয়ং (প্রকৃতিঃ) অপরা ইতঃ তু অন্যাং জীবভূতাং মেপরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া (প্রকৃত্যা) ইদং জগত্ ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে মহাবাহো, এই পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি অপরা ইহা হইতে ভিন্ন আমার যে প্রকৃতি আছে, তাহাকে জীব বলা যায়, তাহাই আমার পরা প্রকৃতি এবং তাহার দ্বারাই এই প্রপঞ্চ বিধৃত হইতেছে ॥ ৫ ॥

ভাষ্য।—অপরা নপরা নিকৃষ্টা অশুদ্ধা অনর্থকারী সংসারবন্ধনাত্মিকেয়মিতোঽন্যা যথোক্তায়া স্বন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো যয়েদং প্রকৃত্যা ইদং জগত্ ধার্য্যতে অন্তঃপ্রবিষ্টয়া ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপরা (অর্থাত্) পরা নহে, নিকৃষ্টা অশুদ্ধা অনর্থকরী, (কারণ) ইহাই সংসারবন্ধনাত্মিকা, এই যথোক্ত অপরা প্রকৃতি হইতে "অন্যা" বিশুদ্ধ আমার আত্মভূত প্রকৃতিকে "পরা" উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ; ঐ প্রকৃতি জীবভূত, (অর্থাত্) ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা ইহাই প্রাণিগণের প্রাণধারণের নিমিত্তীভূত ; হে মহাবাহো অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যে জীবভূত পরা প্রকৃতি দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হয় (তাহাই আমার আত্মস্বরূপ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি) ॥ ৫ ॥

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইত্যুপধারয়। কৃৎস্নস্য জগতঃ অহং (এব) প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ (অস্মি) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা তুমি অবধারণ কর, (সুতরাং) আমিই এই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের প্রতি একমাত্র হেতু ॥ ৬ ॥

ভাষ্য।—এতদিতি। এতদ্যোনীনি এতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনিঃ যেষাং ভূতানাং তানি এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়

P2 4/7

প্রকৃতি।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।)

প্রকৃতি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীলা। দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর, বর্ষ ও যুগাদি ভেদে একই প্রকৃতি বিভিন্না মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা। আমাদের জন্ম মরণাদি ভাব প্রকৃতিতে ন্যস্ত করিয়া আমরা প্রকৃতিতেও বালা, যুবতী, বৃদ্ধা প্রভৃতি সংজ্ঞা আরোপ করিতেছি। মহামনা কবিগণ ইহার অনন্তভাব বর্ণনে পরাস্ত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অনন্ত নিয়মানুসন্ধানে, কার্য্যকারণভাবের ধারাবাহিক নিয়মরহস্যভেদে প্রতিনিয়ত যত্নশীল। ভূতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিদ্‌বিদ্, জ্যোতির্বিদ্, রসায়নবিদ্, ও অন্যান্য মনীষিগণ ইহার এক একটী শাখামাত্র অবলম্বনে অনন্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াও অপরিতৃপ্ত। ভাবুক বা জ্ঞানিগণ কেহই ইহার আদ্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই ; কোন কালে পারিবেনও না। অযুতভাবভাণ্ডার প্রকৃতি অধর্ষণীয়া, অপ্রতিহতা, এবং জ্ঞানবুদ্ধির অগম্যা। ঈদৃশী প্রকৃতির আলোচনা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি ?

প্রকৃতি (Nature) বলিতে আমরা কি বুঝি ? পৃথিবী বলিলে প্রকৃতির অব্যাপ্তি সংজ্ঞা হয়। অযুত অনন্ত গ্রহ তারা বিচিত্রিত ত্রিজগৎ বলিলেও প্রকৃতির লক্ষণ হয় না। সৃষ্ট বস্তু মাত্রই প্রকৃতির ক্রোড়গত। সুতরাং সৃষ্টিই প্রকৃতির নির্দ্দোষ লক্ষণ হইতে পারে। জন্মের পূর্ব্বে অথবা লয়াবস্থায় যে ভাব, তাহাকে প্রকৃতি বলে না। উৎপত্তি হইতে ধ্বংসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বস্তু বা ভাব মাত্রই প্রকৃতি সংজ্ঞায় উপসংজ্ঞিত। এস্থলে আমরা সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য নেচার্ (Nature) কথাই সংপ্রতি প্রকৃতি বলিয়া বুঝিয়া লইব। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যাহা কিছু দৃশ্যমান, যাহা কিছু চিন্ত্যমান, যাহা কিছু নামরূপাত্মক, যাহা কিছু দেশ কাল নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ, সকলি প্রকৃতির লীলাবিলাস মাত্র।

যাহা কিছু সৃষ্ট ও দৃশ্য, তৎসমস্তই ক্রমে বিপরিণমিত, অবশেষে স্বীয় কারণে লীন দৃষ্ট হয়। কালবিভাগ, দিনরাত্রির পরিবর্ত্তন, ষড়্ ঋতুর ক্রমাবর্ত্তন এবং বর্ষযুগাদির দুরাধর্ষাতিক্রমণে প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইতেছে। সুতরাং দুরন্ত কালের স্রোতে প্রকৃতি যেন একটী উপলখণ্ডের ন্যায় গড়াইয়া চলিতেছে ; অথবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই,—প্রকৃতির ক্রোড়গত চন্দ্রসূর্য্যাদির পরিভ্রমণের সহিতই, কাল বিভাগাদি কল্পিত হইতেছে।

যাহা হোক্, [illegible] যে পরিবর্ত্তিতা ও রূপান্তরিতা হইয়াছে, সে বিষয়ে জ[illegible] নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীলা বলিয়া প্রকৃতি একেবারে উপেক্ষণীয়া নহে। বৈদান্তিকও নামরূপাত্মক প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন—পরব্রহ্মস্বরূপাবস্থিতিতে প্রকৃতি বা অপ্রকৃতি এ সমস্ত ভাবের নিঃশেষ বিলয় হয় ; তখন প্রকৃতি আছে, কি নাই, তাহা বুঝাই যায় না। ইহার দ্বারা প্রকৃতির অসত্তা সমর্থিত হয় নাই। পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া, বিচিত্রোদ্ভাসিত জগৎ প্রত্যক্ষাবলোকন করিয়া অজ্ঞ ইতর জীব তর্কস্থলে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিলে, তাহাকে আমি মাতৃহন্তা অকৃতজ্ঞ তনয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। অষ্টাবক্র-বামদেবাদির ন্যায় নির্মায়ী মহাপুরুষগণ জন্মাবধি প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও, শঙ্করাদি জ্ঞানগুরুগণ প্রকৃতির অসত্তা সপ্রমাণ করিলেও, সাধারণ জীব সে ভাব ধারণার যোগ্য কি না, তাহা বিবেচ্য। হইতে পারে, প্রকৃতি-সত্তা দগ্ধপটবৎ, বা জলভ্রমবৎ জ্ঞানাবস্থায় ; কিন্তু সে জ্ঞানলাভ প্রকৃতির অবলম্বন ভিন্ন হইতেই পারে না। অজ্ঞলোক হয়ত প্রকৃতির স্থূল বস্তুর, তুমি না হয় সূক্ষ্ম বস্তু বা ভাবের আশ্রয় লইবে মাত্র। কিন্তু বস্তু বা ভাব সকলি যখন প্রকৃতির বিশাল-কুক্ষিগত, তখন অজ্ঞানাবস্থায় প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও তুমি অবস্থিত হইতে পার না। ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা, আবিষ্কারাদি সকলি প্রকৃতির সাহায্য-লব্ধ। সুতরাং এহেন প্রকৃতি আমাদের নমস্যা ও মাতৃস্থানীয়া।

একই প্রকৃতিকে লইয়া কবি হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, বিজ্ঞানবিৎ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, জ্ঞানী অবাক্ হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, আত্মজ্ঞানী ইহাতে সর্পভ্রান্তি অধ্যারোপ করিতেছেন। বস্তুতঃ অজ্ঞানাবস্থায় ইহাকে ছাড়িবার ক্ষমতা কাহারও নাই ; ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া যিনি বলিতেছেন, "আমি প্রকৃতিকে গ্রাহ্য করি না", "শাস্ত্রে বলে উহা জলভ্রম"—নিশ্চয় জানিবে, তিনি প্রকৃতিকে দেখিয়া সমধিক ভীত হইয়াছেন, তিনি নিজের চক্ষে নিজে ধূলি ক্ষেপণ করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছেন। সে আত্মবঞ্চকের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি সৎগুরুর আশ্রয়ে আত্মদর্শনান্তর বলিতে পার, "ক গতং কেন বানীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ", তবেই বুঝিব তুমি প্রকৃতির পারে গিয়াছ ; তোমাকে আর প্রকৃতির ত্রিসীমায় আসিতে হইবে না ; নতুবা বলিব, তুমি পরশুরামবৎ মাতৃহা।

বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি, পুরাণের অসুরগণ, তন্ত্রের মহাশক্তি,

বাইবেলের সয়তান, কোরাণের ইব্‌লিষ্, সকলি প্রকৃতির (Nature) রূপান্তরিত চিত্রছায়া মাত্র। হিন্দুমতে চৈতন্তের নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তত্ব বিধায়, প্রকৃতি অপ্রধানা স্ত্রীরূপে পরিকল্পিতা ও চৈতন্যভর্ত্রী। কেবল কেলিকুতূহলকৌশলপরায়ণা স্ত্রী যেমন স্বভর্ত্তাকে সর্ব্বদাই অধীন করিয়া রাখে, নিত্যমুক্ত হইয়াও পরমাত্মা তেমনি যেন প্রকৃতিজিত বলিয়া অনুমিত হন। ফলতঃ প্রকৃতির বীর্য্য যেমন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, পুরুষ বা চৈতন্যের প্রভা তেমন ব্যক্ত হয় না; পরন্তু সে প্রভা তপস্যাজ্ঞেয়া। এজন্যই প্রকৃতি-আশ্রিত শাস্ত্রে প্রকৃতির প্রাধান্য পরিবর্ণিত দৃষ্ট হয়।

যে যে পরিমাণে প্রকৃতির করায়ত্ত, সর্ব্ব ধর্ম্ম মতে সে সেই পরিমাণে তত অজ্ঞ ও ঈশ্বরলাভে তত পশ্চাতে অবস্থিত। ফলতঃ প্রকৃতিবাদী মাত্রেই অসুর; পুরুষবাদী সুর। এজন্য আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মানবমাত্রেই অসুর; ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলেই দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। জয় পরাজয় শ্রদ্ধা ও সমাধান সাপেক্ষ। অধিকাংশ স্থলেই অসুর বিজয়ী দেখা যায়; সুরের জয়লাভ প্রথমতঃ হয়ই না; তবে প্রকৃতির ভর্ত্তা অবতীর্ণ বিষ্ণুরূপী আত্মার সহায়তায় অবশেষে কখনো বা সুরগণের জয় লাভ হয়। প্রকৃতি-নিঃসঙ্গতাই মুক্তির অবভাসক।

রূপরসগন্ধাদিগুণাত্মক ভৌতিক জগতের পর্য্যালোচনা হইতেই আমাদের নিত্যানিত্যবস্তুবিচারবিবেক উৎপন্ন হয়। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য প্রপঞ্চের ওতপ্রোতালোড়নে জীবের শান্তি কোথায়? পঞ্চভূতাশ্রয় এই জড়-মাংসপিণ্ডে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যাহারা সংসারে আবদ্ধ হইয়াছে, এ দেহের প্রধ্বংশভাব চিন্তা করিয়া তাহাদের শান্তি কোথায়? পুনঃ পুনঃ যোগক্ষেম এবং সংযোগবিয়োগাদি দ্বন্দ্বভাবের প্রবল তাড়নায় অজ্ঞ জীবের শান্তি কোথায়? বিবৃদ্ধবাসনা, অজিতেন্দ্রিয় প্রকৃতিমুগ্ধ মানবের শান্তি কোথায়? বিনশ্বর জীবনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভীষণ মুখব্যাদান স্মরণ করিয়া কান্তালিঙ্গনাদিজনিত শান্তিই বা কোথায়? জন্ম, মৃত্যু, আধি ব্যাধি প্রভৃতি প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত দূতগণকে প্রতিনিয়ত অবলোকন করিয়া সংসারের অনিত্যতায় স্বতঃই জীব বদ্ধসংশয়। এই নিত্যানিত্যবস্তুবিচারবিবেকোৎপন্নে প্রকৃতিই আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

বেদাদিশাস্ত্র, জ্ঞান ও ভক্তিশাস্ত্র সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দেশকালনিমিত্ত ব্যাপিয়া প্রকৃতির বিরাট্ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত

রহিয়াছে। কোটী কোটী জীবের মধ্যে এক আধ জন অতন্দ্রিত তপস্যানল জ্ঞানে ইহার অধিকার হইতে পলায়ন করিয়া জগতে মুক্তজীব বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি জড়াত্মিকা হইয়াও চৈতন্যলাভে নিয়তই আমাদের সহায়কারিণী হইতেছেন।

অধুনাতন পাশ্চাত্য জগৎ চাহিতেছেন জড়বিজ্ঞানালোচনায় প্রকৃতিকে করায়ত্ত ও অধীন করিতে; প্রাচীন আর্য্যগণ সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া চাহিয়াছিলেন প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে; কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অবশেষে বুঝিয়াছেন, লৌকিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত করা অসম্ভব। আর্য্য ঋষিও বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্র কথঞ্চিৎ লৌকিক উপায় সমর্থনকারী হইয়াও জীবকে কিন্তু প্রকৃতির পরপারগমনেই উপদেশ দিয়াছেন। পরন্তু, আধুনিক জড়বিজ্ঞানালোচনা জীবকে প্রত্যক্ষে জড়বাদী করিয়াও পরোক্ষে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় শক্তির আবিষ্কারে অনুসন্ধিৎসু করিতেছে। একজন প্রকৃতিকে নগ্না করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া, ভোগ করিয়াও দুরাধর্ষণীয় বিধায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিতেছেন। অন্যজন দূর হইতেই তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া মুক্তি চাহিতেছেন। ফলতঃ দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতিকে দেখিয়া উভয়ই পরাস্ত মানিয়া বলিতেছেন, "বহুরূপিণী তুমি কে গা? তোমায় আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" প্রকৃতি জড়বৈজ্ঞানিককে বলিতেছেন, "হে অদূরদর্শিন্! আমার একটী বালুকাকণার রহস্যভেদে তোমার লক্ষ জন্মও পর্য্যাপ্ত হইবে না।" অধ্যাত্মবাদীকে বলিতেছেন, 'তুমি স্বর্গ, চন্দ্র, সূর্য্যলোক, যেখানেই কেন যাও না, আমি সর্ব্বত্রই অধর্ষণীয়া, সর্ব্বত্রই আমার সম প্রভাব। তবে সেখানে অবশ্যই আমার প্রভাব নাই, 'ন যত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। যমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।' "

বৈজ্ঞানিক কথা।

(শ্রীঅনুকূল চন্দ্র ঘোষ।)

সৌর বিপ্লব।—গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক ভীষণ বিপ্লববার্ত্তা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তাহার ফলে যে, কেবল দেশ, মহাদেশ,

গ্রহ ও উপগ্রহ বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, সম্ভবতঃ উহা আমাদের ন্যায় একটী বিভিন্ন সৌর জগতের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। যে দিন এই বিপ্লব ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহার প্রায় একশত বর্ষ পরে এই সংবাদ আমাদের নিকট পঁহুছিয়াছে। কিন্তু যে বার্ত্তাবহ এই কাহিনী প্রচার করিয়াছে, তাহার গতি এতই দ্রুত যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে সে পৃথিবীর পরিধি আটবার বেষ্টন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে থাকুক, বিদ্যুৎ গতিতে লক্ষ লক্ষ যোজন ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া সে অবশেষে বর্ত্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে পৃথিবীতে উপনীত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে যে সংবাদ আমাদের দৃষ্টিপথে নীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি যে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় আর একটী সুদূরস্থিত সূর্য্যে আগ্নেয় প্রলয় সংঘটিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আমাদের সৌর জগতের কেন্দ্র স্থলে এইরূপ অগ্নি কাণ্ড হইবার সম্ভাবনা কতদূর তাহা চিন্তার বিষয়। যদি বাস্তবিকই ইহা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহের কি দশা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি উপরি উক্ত সূর্য্যের ন্যায় আমাদের সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক হঠাৎ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণী নিমেষ মধ্যে বিনষ্ট হইবে; প্রচণ্ড উত্তাপে কঠিন পদার্থ সমূহ দ্রবীভূত হইবে এবং সৌর জগতে প্রলয় উপস্থিত হইবে।

আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের (Prism) ভিতর দিয়া সূর্য্যালোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা উহাকে রামধনুর বর্ণে রঞ্জিত দেখি। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে শুভ্র আলোক বলিয়া ভাবি, তাহা রামধনুর সাতটী বর্ণের আলোকের সমষ্টি। আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যালোকের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে শুভ্র-রশ্মি সমূহকে যে কেবল সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ও ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইতে দেখা যায় তাহা নহে, প্রত্যেক বর্ণাংশে বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ রেখাও দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে যে সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় বাষ্পাকার ধারণ করে, তাহারা সূর্য্যের দ্রবমণ্ডল বেষ্টন করিয়া গ্যাস ও বাষ্পরূপে বিরাজ করিতেছে। উত্তপ্ত দ্রবমণ্ডল যে সকল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে, তাহাদের মধ্যে ক্ষীণজ্যোতিঃবিশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রজ্জ্বলিত বাষ্পরাশিতে প্রবেশকালে নির্ব্বাপিত হয়। এই কারণে সূর্য্য হইতে সূর্য্যস্থ সকল পদার্থের আলোক রশ্মি পৃথিবীতে আসিতে পারে না এবং আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা তাহাদের অনুপস্থিতি

সহজেই দৃষ্ট হয়। উপরে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ রেখার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা নির্ব্বাপিত রশ্মি সমূহের অনুপস্থিতির প্রমাণ স্বরূপ।

আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, যে সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে আমরা নক্ষত্র কহিয়া থাকি, তাহারা এক একটী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি বহুসংখ্যক নক্ষত্র তাপ ও আলোক বিকিরণ শক্তি ও আয়তনে সূর্য্যাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পৃথিবী ও সূর্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের নিকট তাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সূর্য্য যেরূপ এই সৌর জগতের কেন্দ্র, অপরাপর সৌর জগতের সহিত নক্ষত্র সমূহেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। প্রচণ্ড উত্তাপে নক্ষত্র ও সূর্য্যস্থ যাবতীয় পদার্থ দ্রব ও বায়বীয় অবস্থা ধারণ করিয়া রহিয়াছে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র সাহায্যে সূর্য্য ও নক্ষত্রের আলোক পরীক্ষা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পৃথিবীতে যে সকল মূল পদার্থ (Elements) আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সকলগুলিই সূর্য্যে ও অনেকগুলি নক্ষত্রে বর্ত্তমান।

অদ্ভুত বৃক্ষ। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে নিকারাগোয়া নামক হ্রদের সন্নিকটে এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। বৃক্ষটির পত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ফুট, বৃন্ত ১০ ফুট। কিন্তু একটির অধিক পাতা হয় না। এই গাছে যে ফুল হয়, তাহার বোঁটার পরিধি ১ ফুট; ফুলটি দৈর্ঘ্যে ২ ফুট। বর্ণ ঈষৎ লোহিত। ইহার গন্ধ গলিত শবের ন্যায়।

ভাসমান ক্ষেত্র। আজোরস্ দ্বীপপুঞ্জের কিছু পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক অংশ সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ দ্বারা ঘন আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদিত অংশের পরিমাণ ইংলণ্ডের ২৯ গুণ। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য সারের ন্যায় এই উদ্ভিদের উৎপাদিকা শক্তি আছে। ইহাদিগকে সার স্বরূপ ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

চন্দ্র ও নক্ষত্রের তাপ বিকিরণ। সূর্য্যের তাপ বিকিরণ করার কথা সকলে জানেন। অনেকদিন হইল বিলাতের রয়েল সোসাইটীতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চন্দ্রও আলোকের সহিত তাপ বিকিরণ করে। থার্ম্মো-পাইল নামক সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে এই তাপের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সুতরাং চন্দ্রকে কেবল হিমাংশু নাম দেওয়া ভুল। এমন কি নক্ষত্র সকলও আলোকের সহিত তাপ বিকিরণ করে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভূমধ্যস্থ তাপ। ইংলণ্ডস্থ কেণ্টিস্ নগরে সহস্র ফুট গভীর একটি কূপ আছে। বিলাতের "ভূমধ্যতাপ-নির্ণয়-সভা" এই কূপের মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে প্রতি ৫২॥ ফুট নিম্নে তাপ ১ ডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৪০০০ মাইল বা ৪০০০×১৭৬০×৩= ২১১২০০০০ ফুট। ইহা হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র দেশে তাপের পরিমাণ কত অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে।

ইতর জীবের অনুভব শক্তি। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবও অনুভব করিতে পারে। একটি জলপূর্ণ পাত্র কৃষ্ণবর্ণের কাগজ দ্বারা আবৃত করিলে জল মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলি যেন নির্জীব হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি কাগজের সামান্য একটু ছিদ্র দ্বারা উজ্জ্বল আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, দেখা যাইবে যে কীটগুলি জলের আলোকিত অংশের দিকে লাফাইয়া আসিবে। সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে যে সপ্তবর্ণের আলোক-মালা (Solar Spectrum) পাওয়া যায়, তাহা যদি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে অধিক সংখ্যক কীট পীত বর্ণের রশ্মি দ্বারা আলোকিত অংশের উপর একত্রিত থাকিবে, কিন্তু বেগুনি বর্ণের (Violet) রশ্মির দ্বারা আলোকিত অংশের উপর অতি অল্প সংখ্যক কীটকে দেখিতে পাইব। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ জলকীটদিগের পীতবর্ণ চিনিবার ক্ষমতা আছে।

জড়ের অনুভব শক্তি। এতদিন পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞান জড় ও চৈতন্য বলিয়া দুইটী বিভিন্ন বিভাগ দেখিয়া আসিতেছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু জড় পরমাণুর এমন সব নূতন খেলা বাহির করিয়াছেন, যাহাতে ঐ বিভাগ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন চেতন পদার্থের ন্যায় জড়েরও স্পন্দন শক্তি আছে এবং উভয়েরই স্পন্দন এক জাতীয়। তিনি জড়ের মত্ততা, জড়ের শ্রান্তি, বিষ প্রয়োগে জড়ের অবসাদ, ও ঔষধ প্রয়োগে পুনরায় তাহার স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্তি দেখাইয়া, জড় ও চৈতন্য যে একই শক্তির অবস্থান্তর মাত্র প্রমাণ করিতেছেন। জড় ও চৈতন্যের ঐক্য প্রমাণিত হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এক মহা অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত হইবে। সে বিপ্লবের কেন্দ্র হইবেন, আমাদের জগদীশ বাবু। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" মন্ত্রে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সমস্ত জগতের ঐক্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জগদীশ বাবু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের

সাহায্যে সেই ঐক্য প্রমাণ করিয়া আজ সমগ্র হিন্দু ভারতবাসীর গৌরবের পাত্র হইলেন, নিশ্চিত।—সম্পাদক।

এসিটাইলিন। এসিটাইলিন গ্যাস যে বিষাক্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষী, ইন্দুর, ভেক প্রভৃতি ইতর জীবেরা অতি সামান্য পরিমাণ এসিটাইলিন মিশ্রিত বায়ু সেবন করিলে প্রাণত্যাগ করে; কিম্বা অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস তাহাদের রক্তের সহিত মিশাইয়া দিলে মরিয়া যায়। অতি সাবধানে ইহার ব্যবহার করা উচিত।

তারকাগণনা। অনেকের বিশ্বাস যে যে সকল তারকা আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহাদের গণনা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আকাশের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে চর্ম্মচক্ষে দুই সহস্রের অধিক তারকা দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত আকাশে ৬০০০ তারকা মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয়। তবে দূরবীক্ষণযন্ত্র সহকারে কোটি কোটি তারকা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও পণ্ডিত শিবনাথ ইত্যাদির সহিত কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[উৎসব-মন্দিরে।]

প্রায় সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্ম-সমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮এ অক্টোবর, ইং ১৮৮২ সাল, শনিবার। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্ম-সমাজের ষাণ্মাসিক। তাই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা, ৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্ম-সমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম-সমাজকে তিনি

বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী বক্ষে কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভক্তসঙ্গে ষ্টিমার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

সিঁতি নামক গ্রাম পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে।

উদ্যানবাটীটী মনোহর বলিয়াছি। স্থানটী অতি নিভৃত। ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁতির নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শিবনাথ আদি অনেক ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকরী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন।

অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোকসমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধুসমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয়, যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দ্দিক্ আনন্দপরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে আনন্দের সমীরণ প্রভাত হইতে বহিতেছিল। আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে,—

'আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে,
ভগবৎ মঙ্গল কিরণে।'

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া চারিদিগের লোক আসিয়া তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতে লাগিল।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে, সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। তাহার সম্মুখে দালান, সেখানে প্রভু পরমহংসদেব সমাসান, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—সে ঘরেও লোক, —ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোক দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার জন্য সোপান-পরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপান ও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২।৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতা-মণ্ডপ,—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন ছিল। তথা হইতেও লোক উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। সেই বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে —যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাহারাও অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ হয় না, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়-কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যাই ড্রপ সিন্ (Drop-scene) উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানাপুষ্পপরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসম্ভাষণে।]

সহাস্যবদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারি খুসী হয়। হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে। (শিবনাথের ও সকলের হাস্য)।

[সংসারী-লোকের স্বভাব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, 'তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস।' অথবা বলি, 'যাও, বেশ Building দেখগে' (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল)। (সকলের হাস্য।)

"আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে—তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয় ত, আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা কচ্চিছে। এদিকে এরা আর বসে থাকৃতে পারে না। ছট্‌ফট্‌ করছে। বার বার তাদের কাণে কাণে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌ছে, 'কখন্‌ যাবে'—'কখন্‌ যাবে।' ওরা হয় ত বল্লে, 'দাঁড়াওনা হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি।' (সকলের হাস্য)।

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তাহারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে, এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুটীর লোভে অনেকে হরিবোল বল্‌তে যেতো। হরিনামসুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝ্‌তে পারতো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছু নয়, কেবল হরিপ্রেমে যে চক্ষের অশ্রু পড়ে, আর 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে 'গড়াগড়ি।

[নাম-মাহাত্ম্য।]

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখন না কখন ইহার ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটীতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।

[মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয়;—ভক্তি ও গুণত্রয়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে।

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না, হয়তো ঠাকুরদালানে পায়রাগুলা হাগ্‌ছে। উঠানে

এখানে সেওলা পড়েছে, ওখানে সেওলা পড়েছে, হুঁস নাই। আসবাবগুলা পুরানো, ফিট্ ফাট্ করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই একখানা হলেই হলো। আর লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক, কারও কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজঃগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে ২৩টা আংটী। বাড়ীর আস্বাব খুব ফিট্‌ফাট্। ঘরের দেয়ালে কুইনের (Queen's) ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটি চূণ-কাম্ করা, যেন কোনখানে একটি দাগ্ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক্। চাকরদেরও পোষাক্। এম্‌নি এম্‌নি সব আছে।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের এইরূপ সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জান্‌ছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠ্‌তে এত দেরী হচ্চে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট্‌চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটী একটী সোণার দানা (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে তখন গরদের কাপড় প'রে পূজা করে।

"ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো, কাটো, বাঁধো' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম-রসাভিসিক্ত কণ্ঠে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া গান করিতে লাগিলেন;—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

কালী নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

আবার ভক্তোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিতে লাগিলেন ;—

গান।

(নাম-মাহাত্ম্য ও পাপ।)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপানাদি বিনাশি নারী ;
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক,
(ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"'কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী!' এমন রোক হওয়া চাই।

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক।

"আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার ;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এইটী বৈদ্যের তমোগুণ, কিন্তু এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

[তিন প্রকার আচার্য্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লয় না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে

পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান্—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি—উত্তম আচার্য্য।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ? ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না।

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাঁদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি (Personal God) হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করেন। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করেন। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারেন না।

"কি রকম জান ? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই,—ভক্তি-হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গলে যায় ; তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্ত বলে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে ? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তার পর সাদা পুরুখোসা ছাড়ালে, এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে ?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বল্‌বে। একটা

লবণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি-রূপ লুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"যখন পুকুর থেকে চাষের জন্য মাঠে জল আনে, তখন জলের বড় কল্ কল্ শব্দ। যখন পুকুরের জল ও মাঠের জল একসা হয়ে যায়, তখন আর শব্দ হয় না। (ক্রমশঃ।)

জীবন-কুসুম।

(শ্রীহরিদাস দত্ত।)

আহা কি সুন্দর, অতি মনোহর,
ফুটেছে ওই যে গোলাপ ফুল।
যাহার সুবাসে, পরম উল্লাসে,
মাতিয়াছে যত মধুপকুল॥

কিন্তু একি দুঃখ, বিধাতা বিমুখ,
দিনেক তরেও স্থায়ী সে নয়।
রবির তাপেতে, আপন পাপেতে,
ঝরি ঝরি হয় তখনি ক্ষয়॥

মানব জীবন, তেমতি ধরণ,
চিরদিন তবে নাহিক রয়।
রহি কিছুক্ষণ, করি বিচরণ,
আপনা আপনি হয় সে লয়॥

দেখ বাল্যকাল, সকাল সকাল,
কেমন আপনি চলিয়া চায়।
যৌবন আবার, আসি দিয়া বার,
ক্ষণ পরেতেই বিদায় চায়॥

বার্দ্ধক্য তখন, বুঝি নিজক্ষণ,
অমনি আসিয়া উদয় হয়।
লয়ে প্রাণধন, করে সে গমন,
চিরদিন তরে কিছুই নয় ॥

থাকিতে যৌবন, ধন উপার্জ্জন,
মধুময় বাস তাহারি হয়।
যত বন্ধু সব, হইয়ে মধুপ,
তারি আসে সদা কাছেতে রয় ॥

পরে যবে জরা, হইয়ে প্রখরা,
সকল ভূষণ হরিয়া লয়।
তখন রে আর, কেবা হয় কার,
সকলি তাহার আঁধারময় ॥

দেহ কাঁটা বনে, ফুলরাগ ধনে,
তখন ত আর নাহিক ভাতি।
কি গুণে তাহার, আসিবেক আর,
বান্ধব ভ্রমর আমোদে মাতি ॥

কণ্টকের বনে, কে দেখে নয়নে,
যবে ফুল তার শুকায়ে যায়।
তেমনি মানব, ধনে পরাভব,
হলে পরে আর কে তারে চায় ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।—গত জন্মাষ্টমীর দিন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন বৃষ্টি সত্ত্বেও ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৪০।৫০ দল সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় নামকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রায় দুই হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

হইবে যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না ঐ ভাব সকল আমাদের প্রতি শোণিত বিন্দুতে প্রবেশ করে, যতদিন না উহারা আমাদের শরীরের অণুতে প্রত্যেক পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে শুনিতে হইবে। 'হৃদয় পূর্ণ হইলে মুখ বাক্য উচ্চারণ করে,' আবার হৃদয় পূর্ণ হইলে হস্তও কার্য্য করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কার্য্য প্রবৃত্তির নিয়ামক। মনকে সর্ব্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখ, দিনের পর দিন উহা শুনিতে থাক, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাক। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, উহা জীবনের সৌন্দর্য্য স্বরূপ। এইরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবন কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। জীবনের কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, ভ্রম থাকিলই বা গরুকে কখন মিথ্যা কথা কহিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা গরুমাত্র, মানুষ কখনই নহে। অতএব বার বার অকৃতকার্য্য হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সহস্র সহস্র বার ঐ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্র বার অকৃতকার্য্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শনই মানুষের আদর্শ। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে কৃতকার্য্য না হও, অন্ততঃ এক বস্তুতে তাঁহাকে দর্শন কর— যাহা তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস, তার পর তাঁহাকে আর একজনে দর্শন কর। এইরূপে তুমি অগ্রসর হইতে পার। আত্মার সম্মুখে অনন্ত জীবন রহিয়াছে— অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া চেষ্টা করিলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

'অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥'

ঈশোপনিষৎ।

'তিনি অচল, এক, মনের অপেক্ষাও দ্রুতগামী। ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও অন্যান্য দ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্ত্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন। তিনি চঞ্চল, তিনি স্থির, তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় ভূত আত্মা স্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?'

এই সর্ব্ব পদার্থের একত্ব বেদান্তের আর একটী প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করেন যে, আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞান-প্রভব, ও অজ্ঞান আর কিছুই নয় এই বহুত্বের ধারণাঃ—এই ধারণা যে মানুষে মানুষে ভিন্ন—নর নারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন—জাতি জাতি পৃথক্, পৃথিবী চন্দ্র হইতে পৃথক্, চন্দ্র সূর্য্য হইতে পৃথক্, একটী পরমাণু আর একটী পরমাণু হইতে পৃথক্, এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল দুঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ বাস্তবিক প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব বিরাজমান। যদি তুমি ভিতরে চলিয়া যাও, তুমি এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নর নারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ নীচে একত্ব, ধনী দরিদ্রে একত্ব, দেবতা মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক—ইতর প্রাণীরাও তাহাই, যদি খুব ভিতরে দৃষ্টিপাত কর, এবং যিনি ঐ অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পঁহুছিয়াছেন, যাহাকে ধর্ম্মবিজ্ঞানে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তাঁহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে? কিসে তাঁহার মোহ জন্মাইতে পারে? তিনি সকল বস্তুর ভিতরের সত্য জানিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর রহস্য জানিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর দুঃখ কিরূপে থাকিবে? তিনি আর কি বাসনা করিবেন? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বরে পঁহুছিয়াছেন, যিনি জগতের কেন্দ্রস্বরূপ, যিনি সকল বস্তুর একত্বস্বরূপ; উহাই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ। সেখানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। কেবল পূর্ণ একত্ব—পূর্ণ

আনন্দ। তখন তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন? বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই।

'স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ॥'

ঈশ-উপ।

'তিনি চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল, দেহশূন্য, ব্রণশূন্য, স্নায়ুশূন্য, পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু; তিনি চিরকালের জন্য যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।' যাহারা এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা পরলোককে ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, উহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কিন্তু যিনি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সম্ভোগ করেন।

'হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
* * * * তেজো যত্তে কল্যাণতমং
রূপং তত্তে পশ্যামি যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'

ঈশ-উপ।

'হে সূর্য্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্ম্মা আমি যাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এইজন্য তাহা অপসারিত কর। * * আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমি।'

অপরোক্ষানুভূতি।

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ। ইহার নাম কঠোপনিষদ্। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, সার এড্উইন আর্ণল্ড কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, জগতের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জ্জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য লোকের দৃষ্টি অন্তর্জ্জগতে প্রধাবিত হইল। কঠোপনিষদে এই মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রশ্ন হইতেছিল, কে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিল, ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল, ইত্যাদি, কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন আসিল, মানুষের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? পূর্ব্বে লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার পশ্চাতে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল খুব জোর জগতের একজন শাসনকর্ত্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্য মাত্র; হইতে পারে, মানুষের গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি একটী মনুষ্যমাত্র। এই মীমাংসা কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না—খুব জোর আংশিক সত্য বলিতে পার। আমরা মনুষ্যদৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি আর আমাদের ঈশ্বর এই জগতের মানবীয় ব্যাখ্যামাত্র।

মনে কর, একটা গরু যেন দার্শনিক ও ধর্ম্মজ্ঞ হইল—সে জগতকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া গোরুর ভাবে ইহার মীমাংসা করিবে, সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তাহা নাও হইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা বিড়াল জগৎ দেখিবে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে, কোন বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যা পূর্ণব্যাখ্যা নহে, আর আমাদের ধারণাও জগতের সর্ব্বাংশস্পর্শী নহে। মানুষে যে ভাবে জগৎসম্বন্ধে ভয়ানক স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বাহ্যজগৎ হইতে জগৎসম্বন্ধে যে মীমাংসা লব্ধ হয়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্য সম্বন্ধে আমাদের

যতটুকু দৃষ্টি, ততটুকু। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি, যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণীর দৃষ্টিতে পড়ে। মনে কর, আমাদের আর একটী ইন্দ্রিয় হইল—তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটী চৌম্বুক ইন্দ্রিয় হইল, এমন হয়ত জগতে লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিবার আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই—তখন সেই গুলির উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ—বাস্তুবিক অতি সীমাবদ্ধ—আর ঐ সীমার মধ্যেই সমুদয় জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎসমস্যার মীমাংসা মাত্র। কিন্তু তাহা কখন সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। ইহা ত অসম্ভব ব্যাপার। যথার্থ বলিতে গেলে, উহা কোন মীমাংসাই নহে। কিন্তু মানুষ ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে সকল জগতের সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহা আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণ মধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও, কেবল অকাট্য যুক্তিবলে ঊর্দ্ধ, অধঃ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার লোকের সাধারণ অধিকার, সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসোন্মুখ হইল বলা যাইতে পারে, সুতরাং, আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে এই মীমাংসা পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত, কারণ, ইহা সমগ্রভাবের কেবল অংশবিশেষমাত্র।

অতএব সমস্যার উপায় একমাত্র ভিতরে প্রবেশ। অতি প্রাচীন মননশীল মহাজনেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যত দূরে যাইতেছেন, ততই একত্ব হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই একত্বের নিকট পঁহুছিতেছেন। আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হই, ততই আমরা যে সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, তাহার নিকট উপস্থিত হই, আর যতই উহা হইতে দূরে যাই, ততই আমাদের

সহিত অপরের বিশেষ পার্থক্যের ভাব আরম্ভ হয়। এই বাহ্যজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বসমষ্টির এক সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ খুব জোর, তাহার একাংশ মাত্র। আরো কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার সকল, এইরূপ আরো কত কত ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটী মাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগতের সমস্যার নির্ণয় করা ত অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ কোথাও এমন একটী কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যাহা হইতে অন্যান্য সমুদয় বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব। ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে —এই মানুষের ভিতর, যে মানুষ রহিয়াছেন, তিনিই এই কেন্দ্র। ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সকলেই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে একীভূত হইতেছে। এখানেই বাস্তবিক সমুদয়ের একটী সাধারণ ভূমি—এখানে দাঁড়াইয়াই আমরা একটী সার্ব্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটীই বড় দার্শনিকযুক্তিসিদ্ধ নহে এবং উহার মীমাংসাও বড় কিছু কাযের নহে। পূর্ব্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, ইহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ।

অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ছিলেন। তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্তু তিনি এমন সকল জিনিষ দান করিতেছিলেন, যাহাতে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। যেমন জরাজীর্ণ, অর্দ্ধমৃত, বন্ধ্যা, একচক্ষু, খঞ্জ গাভীসকল। তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। বালকটী দেখিলেন, তাঁহার পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গই করিতেছেন, অতএব তিনি কি বলিবেন. ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পায় না, কেবল চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অত-

এবং সেই বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কেবল মাত্র জিজ্ঞাসিল, 'পিতঃ, আপনি আমায় কাহাকে দিবেন? আপনি ত যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।' পিতা অতিশয় বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, 'ও কি বলিতেছ বৎস—পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে, এ কিরূপ কথা?' বালকটী দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন—তখন, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোরে যমকে দিব।' তার পর আখ্যায়িকা এই—বালকটী যমের বাড়ী গেল। আদি মানব মৃত হইয়া যমদেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যাইয়া ইহাঁর নিকট অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন। এই যম একজন খুব শুদ্ধস্বভাব, সাধু পুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটী যমলোকে গমন করিলেন। দেবতারাও সময়ে সময়ে বাড়ী থাকেন না, অতএব ইহাঁকে তিন দিন তথায় তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ী ফিরিলেন।

যম কহিলেন, হে বিদ্বন্, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রহ্মন্ তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হউক। আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া আমি বড় দুঃখিত। কিন্তু আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকে প্রতিদিনের জন্য একটী একটী করিয়া তিনটী বর দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।' বালক প্রথম বর এই প্রার্থনা করিলেন—'আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ চলিয়া যায়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এখান হইতে বিদায় দিলে তাঁহার নিকট গেলে তিনি আমায় যেন চিনিতে পারেন।' যম তথাস্তু বলিলেন। নচিকেতা দ্বিতীয় বার স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞবিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই, তথায় সকলের জ্যোতির্ম্ময় শরীর, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃদিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য ভাব আসিল, কিন্তু এ সকল কিছুতেই লোকের প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তি মানিল না। এই স্বর্গ হইতে আরো উচ্চতর কিছুর আবশ্যক। স্বর্গে বাস এই জগতে বাস হইতে বড় কিছু বিভিন্ন নহে। জোর একজন খুব সুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ তাহাই—খুব বিষয়ভোগ সম্ভোগের জিনিষ অপর্য্যাপ্ত আর নীরোগ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর। ইহা এই জড়জগতই আর একটু ভাল ভাবের;

এবং আমরা পূর্ব্বে যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ ঐ সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা ইহার কি মীমাংসা হইবে? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। যদি এই জগৎ ঐ সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কিরূপে উহার মীমাংসা করিবে? কারণ, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, স্থূলভূত প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের অতি সামান্য অংশমাত্র। আমরা যে সকল অগণ্য ঘটনাপুঞ্জ বাস্তবিক দেখিয়া থাকি, তাহা ভৌতিক নহে।

আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ধরিয়াই দেখ না কেন, কতটা আমাদের চিন্তার ব্যাপার আর কতটাই বা বাস্তবিক বাহিরের ঘটনা? কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর? এই জীবন প্রবাহ—কি প্রশান্ত বেগেই চলিতেছে—ইহার কার্য্যক্ষেত্রও অতি বিস্তৃত—কিন্তু ইহাতে মানসিক ঘটনাবলির তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সমূহ কি সামান্য! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলি কেবল রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বর্গে যেখানে আমরা জ্যোতির্ম্ময় দেহ লইয়া থাকিব, তাহাতে অধিকাংশ লোকের তৃপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞসম্বন্ধী জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন। বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া লোককে স্বর্গে লইয়া যান। সকল ধর্ম্ম আলোচনা করিলেই নিঃসংশয়িতভাবে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জ্জত্বকে লিখিতেন, অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু এক্ষণও ভূর্জ্জত্বক্ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রায় ৯।১০ সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্ত্তমান। যজ্ঞের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না। এসিয়াবাসী আর্য্যগণের আর এক শাখা-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এখনও তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ বৈদ্যুতাগ্নি ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে ভাল বাসে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্ব্বে এইরূপে অগ্নি সংগ্রহ করিত; ক্রমে ইহারা দুখানি কাষ্ঠ ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল; পরে যখন অন্যান্য উপায় শিখিল, তখন

(যর প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, অনুস্বারের পর সবর্ণ হয়), এই সূত্রানুসারে, র পরে থাকিলেও পর সবর্ণ প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ "কুণ্ড্‌রথেন" এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে। র কারের পূর্ব্বে উপদেশ করিলে অর্থাৎ হ র য ব ট্, এইরূপ করিলে, এই সকল দৃষ্টান্ত স্থলে কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি পূর্ব্বোপদেশঃ। পূর্ব্বোপদেশে কিত্ব প্রতিষেধাম্।* দেবিত্বা দিদেবিষতি। রলোব্যুপধাদিতি কিত্বং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—র কারের, পরে উপদেশ করিলে, যখন এতই দোষ হয়, তখন তবে পূর্ব্বেই উপদেশ করা হউক।

পূর্ব্বে উপদেশ করিলে, কিন্তু বিধিতে প্রতিষেধ, প্রয়োজন হইবে*।

যদি পূর্ব্বে রকারের উপদেশ করা যায়; তবে কিত্ব বিধিতে, ব কার যকারের গ্রহণ হয় না; এইরূপ নিষেধ করা কর্ত্তব্য। নতুবা "দেবিত্বা" "দিদিবিষতি" প্রভৃতি স্থলে "র ল ব্যুপধাৎ ***" (১) এই সূত্রানুসারে কিত্ব প্রাপ্তি হইবে। সুতরাং দেবিত্বা প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূল।—নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে রলো ব্যুপধাদিতি। কিং তর্হি, রলঃ অব্‌ব্যুপধাদিতি কিমিদমব্‌ব্যুপধাদিতি। অবকারান্তাদ্ব্যুপধাদ্ব্যুপধাদিতি। বালোপবচনং চ। বোশ্চ লোপো বক্তব্যঃ *। গৌধেরঃ পচেরন্। যজেরন্। জীবেরণ্‌ক্। জীরদানুঃ। বলীতি লোপেন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই স্থলে দোষ হইবে না। কেন না, ইহা মনে করিও না যে "রলব্ব্যুপধাদ্ধলাদেঃসংশ্চ" এইরূপ সূত্র হইবে। অথবা পূর্ব্বোক্তরূপ তাহার ব্যাখ্যা হইবে।

তবে কি হইবে?

রলঃ অব্‌ ব্যুপধাৎ এইরূপ পদচ্ছেদ করিব। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ না হইয়া, এইরূপ অর্থ অর্থাৎ রলঃ (রল্‌ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পর, অব্‌ শব্দ প্রশ্লেষ করিয়া) রলোব্‌ তদনন্তর ব্যুপধাৎ এইরূপ সূত্র করিব।

---

(১) এই সূত্র এবং তাহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা পরে উল্লিখিত হইতেছে।

"গি ক্ ঙতি চ" ১।১।৫ (গ কার ইৎ, ক কার ইৎ এবং ঙ কার ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ বা বৃদ্ধি হয় না), সুতরাং যদি দেবিত্বাদি স্থলে, ব কার পরে থাকাতে "রলব্যুপধাৎ" সূত্রের প্রাপ্তি হইল; তবে ক কার ইৎ হইয়া ইকারের গুণ প্রাপ্তি হইত না, সুতরাং 'দেবিত্বা' ইত্যাদি স্থলে দিবিত্বা প্রাপ্তি হইত।

অব্যুপধাৎ এইরূপ সূত্র করিলে, কি লাভ হইবে ?

তাহা হইলে, ইহাই লাভ হইবে যে, অবকারান্তাৎ অর্থাৎ বকার রহিত, য্যুপধাৎ অর্থাৎ উ ই উপধাতে আছে যাহার, তাহার পরে,—এইরূপ অর্থ হইবে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই হইবে যে, বকার রহিত, ই কার এবং উকার উপধা বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ক্ত্বা এবং সন্ প্রত্যয় হইলে, 'স' ও 'ইট্' হয়। এবং বিকল্পে কিৎ হয়।

এইরূপ ভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিলে, 'রল্' মধ্যে ব কারের পাঠ হইলেও, সূত্রে বকারের নিষেধ উল্লেখ আছে বলিয়া, "দেবিত্বা" "দিদেবিষতি" প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলে, বিকল্পে কিত্ব হইবে না; সুতরাং গুণ নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োগের রূপান্তরও হইবে না অর্থাৎ দিবিত্বাদি প্রয়োগ হইবে না।

ব্যলোপ হয়—এইরূপ বচনও প্রয়োগ করিতে হইবে*। র কারের পূর্ব্বে উপদেশ করিলে, র পরে থাকিলেও ব কার এবং য কারের লোপ হয়—এইরূপ বলিতে হইবে। নতুবা র কার পরে থাকিলেও য কারের লোপ লইয়া 'গোধের' 'পচেরন্' 'যজেরন্' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। আর জীব শব্দ পূর্ব্বক, অদানার্থে, ণুক্ প্রত্যয় করিবার পর, ব কার লোপ করিয়া জীরদানুঃ পদ সিদ্ধ হয়। যদি রকার পূর্ব্বে উপদেশ করা যায়, তবে বল্ প্রত্যাহারের মধ্যে র কারের পাঠ না হওয়াতে, বল্ পরে থাকিলে, ব্ য্ লোপ হইলেও র পরে থাকিলে ব্ য্ লোপ হইবে না। সুতরাং অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যমূল। —নৈষ দোষঃ। রেফোপ্যত্র নির্দ্দিশ্যতে। লোপো ব্যোর্বলীতি রেফে চ বলি চেতি। অথ বা পুনরস্তু পরোপদেশঃ। ননু চোক্তং রেফস্য পরোপদেশেঽনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণপ্রতিষেধ ইতি। অনুনাসিক পরসবর্ণয়োস্তা-বৎপ্রতিষেধো ন বক্তব্যঃ। রেফোষ্মণাং সবর্ণান সন্তি।

• বঙ্গানুবাদ।—এই স্থলে দোষ হইবে না, যেহেতু এই স্থলে রেফ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সূত্রে র কার প্রশ্লেষ (অতিরিক্ত অভিনিবেশ) করা যাইবে, যথা—'লোপোব্যোর্বলি' এইরূপ সূত্র করা যাইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে রেফ্ পরে থাকলে এবং বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও, লোপ হইবে। তাহা হইলে, 'জীরদানু' প্রভৃতি স্থলেও দোষ হইবে না। অতএব রেফের, পরে উপদেশ করিলে, কোনও দোষ হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

যদি কোনও দোষই না হইল, তাহা হইলে না হয় পুনরায় পরেই উপদেশ করা হউক!

রেফের পরেই উপদেশ করিলে, অনুনাসিক, দ্বির্বচন, পরসবর্ণ প্রভৃতি স্থলে, র কার নিমিত্ত কার্য্য প্রতিষেধ করিতে হইবে বলিয়া, এইরূপ একটি বৃহৎ বার্ত্তিক করা নিবন্ধন দোষ হইবে, যদি এই কথা বল; তাহা বলিতে পার না। যেহেতু অনুনাসিক পরসবর্ণ প্রভৃতি স্থলেও, র কার নিমিত্তক কার্য্য করিতে হইবে না। কেন না, রেফের সহিত উষ্মবর্ণ (১) সমূহের সবর্ণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—দ্বির্বচনেপি। নেমৌ রহৌ কার্য্যিণৌ দ্বির্বচনস্য। কিং তর্হি। নিমিত্তমিমৌ রহৌ দ্বির্বচনস্য তদ্যথা। ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাং মাঠরকৌণ্ডিন্যৌ পরিবেবিষাতামিতি। নেদানীং তৌ ভুঞ্জাতে।

বঙ্গানুবাদ।—দ্বির্বচন স্থলেও র কারের প্রতিষেধ করিতে হইবে না। কেন না দ্বির্বচনে, এই যে র কার এবং হকার, ইহারাও কখনও কার্য্য হয় না। অর্থাৎ র কার এবং হ কার কখনও দ্বিত্ব হয় না।

তবে কি হয়?

এই র কার এবং হকার দ্বিত্ব রূপ কার্য্যের, নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে। যাহা নিমিত্ত হইয়া থাকে, তাহা কখনও কার্য্য হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে,—"ব্রাহ্মণগণ ভোজন করুক, আর মাঠর ও কুণ্ডিনী ঋষিদ্বয় পরিবেশন করুক!" এইরূপ বলিলে, ইহাই বোধ হয় যে, যাহারা সম্প্রতি পরিবেশন করিতেছেন, সেই পরিবেশন কারক ঋষিদ্বয়, এক্ষণে ভোজন করিতেছেন না। যেহেতু, ভোজন এবং পরিবেশন-উভয় কার্য্য, কখনও এক সময়ে একজনের দ্বারা সম্পাদন অসম্ভব। অতএব র কার এবং হ কার, দ্বিত্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে; কিন্তু নিজেরা কখনও দ্বিত্ব হয় না। ইহাই সিদ্ধ হইল। সুতরাং র কারের পরেই উপদেশ করা কর্ত্তব্য (হ য ব র ট্); কিন্তু পূর্ব্বে নহে (হ র য ব ট্)।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্য্যতে। ইমে অযোগবাহা ন ক্বচিদুপদিশ্যন্তে শ্রূয়ন্তে চ। তেষাং কার্য্যার্থ উপদেশ কর্ত্তব্যঃ। কে পুনরযোগবাহাঃ। বিসর্জনীয়-জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়ানুস্বারযমাঃ। কথং পুনরযোগবাহাঃ যদযুক্তা বহন্তি। অনুপদিষ্টাশ্চ শ্রূয়ন্তে।

(১) শ ষ স হ, ইহারা উষ্মবর্ণ।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এই যে অযোগবাহ বর্ণ সমূহ, এ সকল পাণিনি কোথাও উপদেশ করেন নাই, অথচ সর্ব্বত্র ইহা-দিগের নামও শুনা যায়; অতএব কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাদিগের উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

পুনরায় শঙ্কা হইতে পারে যে, অযোগবাহ বর্ণ সমূহ কি?

বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয়, অনুস্বার এবং যম্ (১) ইহারা অযোগ-বাহ বর্ণ।

কেন ইহাদিগকে অযোগবাহবর্ণ বলা হয়?

যেহেতু ইহারা শাস্ত্রে প্রয়োগ না হইলেও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর পাণিনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট না হইলেও শুনা গিয়া থাকে, সেই হেতুই ইহাদিগের নাম অযোগবাহ হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—ক্ব পুনরেষামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। অযোগবাহানামট্সু ণত্বম্। *। অযোগবাহানামট্সূপদেশ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। ণত্বম্। উরঃকেণ। উরঃ ≍ কেণ। উরঃপেণ। উরঃ ≍ পেণ। অড্ব্যবায়ে ইতি ণত্বং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহাদিগের তবে কোন স্থলে উপদেশ করা কর্ত্তব্য?

অযোগবাহবর্ণ সকলের অট্ প্রত্যাহার মধ্যে, ণত্ব বিধানের জন্য পাঠ করা কর্ত্তব্য*।

অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

ণত্ব বিধানই তাহার প্রয়োজন। অর্থাৎ উরঃকেণ উর ≍ কেণ, উরঃপেণ উর ≍ পেণ, ইত্যাদি স্থলে, "অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েপি" (২) এই সূত্রানুসারে, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় প্রভৃতি বর্ণ রেফের পরে থাকিলেও যাহাতে 'কেন' এবং 'পেন' র 'ন' কার মূর্দ্ধন্য ণ হয়।

তাৎপর্য্যার্থ।—র কার এবং ষ কারের পরে, যদি অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকে, তাহা হইলেও ন কার স্থানে ণ হয়। অট্ প্রত্যাহারের মধ্যে যদি

(১) বর্গের আদি চার বর্ণের, পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে, পূর্ব্ব সদৃশ যে একটি বর্ণ থাকে, তাহাকে যম্ বলে। ইহা, বেদের প্রয়োগাঙ্গব্যাকরণ প্রাতি-সাখ্যে প্রসিদ্ধ আছে। যম্ বর্ণের দৃষ্টান্ত যথা - পলিক্ক্নীঃ, অগগ্নিঃ, এই সকল স্থলে, পূর্ববর্ত্তী ককার ও গকারকে যম্ বলে।

(২) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

জিহ্বামূলীয়, বিসর্গ প্রভৃতি অযোগবাহবর্ণ পাঠ করা যায়, তাহা হইলেই "উরঃ কেণ" "উর্ ≍ কেণ" প্রভৃতি স্থলে, বিসর্গ (ঃ), জিহ্বামূলীয় (≍ প্রভৃতি বর্ণ, র কারের পরে ব্যবধান থাকিলেও "কেন" র ন কার, মুর্দ্ধন্য ণ হইবে। কিন্তু, যদি অযোগবাহ বর্ণ সমুহ অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা না যায়, তাহা হইলে "উরঃকেণ" প্রভৃতি স্থলে, সুসংগত মূর্দ্ধন্য ণ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—শর্ষু জশ্‌ভাবষত্বে*। শর্ষূপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। জশ্‌ভাবষত্বে। অয়মুব্জিরুপধ্মানীয়োপধঃ পঠ্যতে। তস্য জশেত্বকৃতে উব্জিতা উব্জিতুমিত্যেদ্ রূপং যথাস্যাৎ। যদ্যুব্জিরুপধ্মানীয়োপধঃ পঠ্যতে উব্জিজিষতীত্যুপধ্মানীয়াদেরেব দ্বিবর্চনং প্রাপ্নোতি। দকারোপধে পুনর্নন্দ্রাঃ সংযোগাদয় ইতি প্রতিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—অযোগবাহ বর্ণ সমূহের শর্ প্রত্যাহার মধ্যেও পাঠ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে জশ্ ভাব ও ষত্ব প্রাপ্তি হয় এই জন্য*।

শর্ প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ সমূহের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শর্ প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ পাঠের কি প্রয়োজন?

যাহাতে যশ্ ভাব এবং ষত্ব বিহিত হয়, তাহাই প্রয়োজন। কেন না, এই যে "উব্জ" ধাতু ইহা, উপধ্মানীয় বর্ণ উপধা (১) বিশিষ্ট, এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। সেই উপধ্মানীয় বর্ণের, "ঝলাং জশ্ ঝশি" (২) এই সূত্রানুসারে, যাহাতে জশ্‌ত্ব প্রাপ্তি হইয়া, উব্জিতা, উব্জিতুম্ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, এইজন্য ষর্ প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ সমূহের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

'উব্জি' ধাতু যদি উপধ্মানীয় উপধা বিশিষ্ট পাঠ করা হয়, তবে 'উব্জিজিষতি' প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও উপধ্মানীয় আদি বিশিষ্ট 'উব্জি' ধাতুর উত্তরই দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ উব্জ্ ধাতুর উত্তর সন্নন্ত করিলে, জ কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইয়া, 'উব্জিজিষতি' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। আর যদি উপধ্মানীয় উপধা বিশিষ্ট পাঠ না করিয়া, দকার উপধা বিশিষ্ট উব্জ ধাতু পাঠ করা যায়, তবে "নন্দ্রাঃসংযোগাদয়ঃ" ৬।১।৩ (অচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত, সংযোগ আদি বিশিষ্ট যে নকার, দ কার অথবা র কার তাহার দ্বিত্ব হয় না), এই সূত্রানুসারে, 'উব্জিজিষতি' প্রয়োগ সিদ্ধ না হইয়া বরং দ্বিত্ব নিষেধই প্রাপ্ত হইবে।

(১) অন্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণকে উপধা কহে।

(২) ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের, যশ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ প্রাপ্তি হয়, ঝশ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

ভাষ্যমূল।—যদি দকারোপধঃ পঠ্যতে কা রূপসিদ্ধিঃ। উব্জিতা উব্জিতু-মিতি। অসিদ্ধে ভ উব্জেঃ। ইদমস্তি স্তোশ্চুনা শ্চুরিতি, ততো বক্ষ্যামি। ভ উব্জেঃ। উব্জেশ্চুনা সন্নিপাতে ভো ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি উব্জ্ ধাতু, দ কার উপধা বিশিষ্ট পাঠ করা যায়, তাহা হইলে জ কারের দ্বিত্ব নিষেধ হইয়া, 'উব্জিজিষতি" প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না; তবে দকার উপধা বিশিষ্ট 'উব্জ্' ধাতু পাঠ করিলে, কিরূপ পদ সিদ্ধ হইবে? অথবা 'উব্জিতা' 'উব্জিতুম্' ইত্যাদি প্রয়োগই বা কিরূপে সিদ্ধি হইবে?

কেন, এইরূপ সূত্র করিব যে, "অসিদ্ধে ভ উব্জেঃ" (অসিদ্ধ কাণ্ডে উব্জ্ ধাতুর দ স্থানে ভ হয়) আর এই সূত্রও "স্তোশ্চুনাশ্চুঃ" ৮।৪।৪০ (স কার এবং ত বর্গের, শ কার এবং চকারের সহিত যোগ হইলে, শকার এবং চ বর্গই হয়, যথা—সচ্চিৎ, ইত্যাদি) এই সূত্র বলিয়া, তাহার পরে বলিব; অর্থাৎ প্রথমতঃ 'স্তোশ্চুনাশ্চুঃ' সূত্র করিয়া তৎপরে 'ভ উব্জে' এইরূপ সূত্র করিব। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, উব্জ্ ধাতুর দ কারের (উ দ জ) সহিত চ বর্গের যোগ হইলে, দ স্থানে ভ হয়। তাহা হইলেই সূত্রার্থ প্রকৃষ্টরূপে এইরূপ হইবে যে, সর্ব্বত্র ত বর্গের সহিত চ বর্গের যোগে চ বর্গ হইলেও 'উব্জ্' ধাতুর 'দ' কার স্থানে জ কার না হইয়া (উদ্+জ =উজ্জ, না হইয়া), উদের 'দ' স্থানে ভ হইবে, উভ্+জ=উব্জ, এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্ নিপাতনাদেব সিদ্ধম্। কিন্নি-পাতনম্। ভুজন্যুব্জৌ পাণ্যুপতাপয়োরিতি। ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। অভ্যুপব্জঃ সমুপব্জ ইতি। অকুত্ববিষয়ে নিপাতনম্।

যদি এরূপ হয়, তবে "ভ উব্জেঃ" এইরূপ একটী সূত্রও ত করিতে হইবে। সুতরাং তজ্জন্য গৌরবও হইবে?

না; এইরূপ সূত্র, পৃথক্ আর করিতে হইবে না। নিপাতনেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

কি সেই নিপাতন?

ভুজন্যুব্জৌ পাণ্যুপতাপয়োঃ।৭।৩।৬১। (পাণি অর্থাৎ হস্ত অর্থে ভুজ ধাতু, আর উপতাপ অর্থাৎ রোগ অর্থে ন্যুব্জ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হইলে, তাহা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অতএব এই স্থলে নিপাতনের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন

হইতেছে যে, 'ঘঞ্' প্রত্যয় 'ঞ' ইৎ বিশিষ্ট হইলেও নিপাতন প্রযুক্ত বৃদ্ধি হইবে না।) এই সূত্রানুসারে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে, 'ঞ' ইৎ প্রযুক্ত অবশ্য-প্রাপ্য বৃদ্ধ্যাদিও যখন প্রাপ্তি হইল না, বরং নিপাতন প্রযুক্তই নিষেধ প্রাপ্ত হইল; তখন 'দ' স্থানে 'ভ' ও নিপাতনেই হইল, তাহাতে দোষ কি?

তাহাতে দোষ এই যে,—তাহা হইলে, 'অভ্যুদ্গঃ' 'সমুদ্গঃ' প্রভৃতি স্থলেও 'দ' স্থানে 'ভ' হইবে। অর্থাৎ 'অভ্যুবগ' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কেন না, এই নিপাতন, 'অকুত্ব' বিষয়ে অর্থাৎ যে স্থলে, ক বর্গের সংশ্রব সম্ভব নাই, সে স্থলেই 'ভ' প্রাপ্তি হইবে; অন্যত্র নহে, এবং এই জন্যই পূর্ব্বে 'চোঃকুঃ' সূত্র করিবার পরে, ভত্ব বিধান করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—অথবা নৈতদুব্জেরূপম্। গমেরেতদভ্যুপসর্গাড্ডো বিধীয়তে। অভ্যুদ্গতোঽভ্যুদ্গঃ। সমুদ্গতঃ সমুদ্গ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা এইরূপ বলিব যে, ইহা 'উব্জ' ধাতুর রূপ নহে। ইহা গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অভি, এবং উৎ এই দুই উপসর্গ, আর সম্ এবং উৎ এই দুই উপসর্গ পূর্ব্বে আছে এমন যে ধাতু, তাহার উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া, দুই উপসর্গ পূর্ব্ব বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয় বলিয়া, "অভ্যুদ্গঃ" "সমুদ্গঃ" প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ষত্বং চ প্রয়োজনম্। সর্পিঃষু ধনুঃষু। শর্ব্যবায় ইতি ষত্বং সিদ্ধং ভবতি। নুম্ বিসর্জ্জনীয় শর্ব্যবায়েপীতি বিসর্জ্জনীয় গ্রহণং ন কর্ত্তব্যং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—ষত্ব বিধানের জন্যও অযোগবাহ বর্ণ সমূহের, 'শর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, সর্পিঃষু ধনুঃষু প্রভৃতি স্থলে, সর্পি ও ধনু প্রভৃতি শব্দের ই কার ও উ কারের পরে, বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও "শর্ ব্যবায়" অর্থাৎ শর্ (শ ষ স র্) প্রত্যয়ান্তর্গত বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও, ই, উ ও ক বর্গের পরস্থিত 'স' কার মূর্দ্ধন্য হয় বলিয়া, মূর্দ্ধন্য হইবে। অতএব সর্পিঃষু, ধনুঃষু প্রভৃতি মূর্দ্ধন্য ষ কার বিশিষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যদি 'শর্' প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ পাঠ করা না যায়; তবে বিসর্গ ব্যবধান প্রযুক্ত সর্পিঃষু ধনুঃষু প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

আচ্ছা, যদি বিসর্গের শর্ প্রত্যাহার মধ্যেই গৃহীত হয়; তবে 'নুম্

বিসর্জ্জনীয় শর্ব্যবায়েঽপি। ৮।৩।৫৮।" (নুম্, বিসর্গ, শর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ ব্যবধানে থাকিলেও ইণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের এবং ক বর্গের পরস্থিত সকারের মূর্দ্ধণ্য আদেশ হয়) এই সূত্রে, বিসর্গ গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে; কেন না শর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ গ্রহণেই বিসর্গের গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূল।—নুমশ্চাপি তর্হি গ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্। কথং সর্পীংষি ধনূংষি। অনুস্বারে কৃতে শর্ব্যবায় ইত্যেব সিদ্ধম্।

বঙ্গানুবাদ।—যদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহ, শর্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হইলে, সূত্রে বিসর্জ্জনীয় গ্রহণ কর্ত্তব্য না হয়; তবে সূত্রে, 'নুম্' এরও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু 'নুম্'এর ও শর্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হইয়াছে।

তবে সর্পীংষি, ধনূংষি প্রভৃতি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ যদি 'নুম্ বিসর্জ্জনীয়**' সূত্রে, 'নুম্'এর গ্রহণ করা না যায়; তবে সর্পিস্ ও ধনুস্ শব্দে নুম্ (অনুস্বার) হইলে, নুম্ ব্যবধান প্রযুক্ত, কিরূপে সর্পীংষি ও ধনূংষির সকার মূর্দ্ধণ্য হইয়া 'ষ'কার হইবে?

কেন, নুম্ স্থানে অনুস্বার করিলে, অনুস্বারের 'শর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ প্রযুক্ত, শর্ ব্যবায়েঽপি (ইণ্, ও ক বর্গের পরে, শর্ প্রত্যাহার ব্যবধান থাকিলেও স স্থানে ষ হয়) এইরূপ সূত্র করিলেই, নুম্ (অনুস্বার) ব্যবধান থাকিলেও 'সর্পীংষি' 'ধনূংষি' প্রভৃতি ষত্ব' বিশিষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূল।—অবশ্যং নুমোগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। অনুস্বারবিশেষণং নুম্গ্রহণং নুমো যোঽনুস্বারস্তত্র যথা স্যাদিহ মাভূৎ পুংস্বিতি।

বঙ্গানুবাদ।—"নুম্বিসর্জ্জনীয় শর্ব্যবায়েঽপি" এই সূত্রে, 'নুম্' গ্রহণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে 'নুম্' এর স্থানে 'নুম্' বিশিষ্ট যে অনুস্বার তাহারই গ্রহণ হইবে। "অনুস্বারের বিশেষণ যুক্ত যে নুম্, তাহারই গ্রহণ হয়," এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন এই যে, নুম্ স্থানে যে অনুস্বার, কেবল সেরূপ অনুস্বার ব্যবধান থাকিলেই যাহাতে মূর্দ্ধণ্য 'ষ' কারাদি আদেশ হইতে পারে; কিন্তু 'পুমস্' শব্দের 'ম' কারোৎপন্ন অনুস্বার ব্যবধান প্রযুক্ত, 'পুংসু' প্রভৃতি শব্দের 'স'কার যাহাতে মূর্দ্ধণ্য না হয়।

ভাষ্যমূল।—অথবা অবিশেষেণোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্।

অবিশেষেণ সংযোগোপধাসংজ্ঞাঽহলোঽন্ত্যদ্বির্বচনস্থানিবদ্ভাবপ্রতি[illegible]ধঃ*।

অবিশেষেণ সংযোগসংজ্ঞাপ্রয়োজনম্। উৎজক। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগ ইতি সংযোগসংজ্ঞায়াং সত্যাং [illegible]বিতি গুরুসংজ্ঞা গুরোরিতি প্লুতো ভবতি।

বি. ৭৬ / ৭৪৬২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।] [৪৯৫ পৃষ্ঠার পর।

"বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, ততক্ষণই লোকে ফড়্ ফড়্ করে তর্ক করে। বিচার শেষ হলে মানুষ চুপ্ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হলে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

"আগেকার লোকে বল্‌তো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।

['আমি' কিন্তু যায় না।]

"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল" (সকলের হাস্য)। কিন্তু হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তাই তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল। ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে, দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। ব্রাহ্মসমাজে যে প্রার্থনা করা হয়, তাঁকেই করা হয়। তোমরা বেদান্তবাদী নও, তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, তাতে এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি, ভক্তি পথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।

[ঈশ্বরের রূপ দর্শন।]

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাইনা কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে?

ব্রাহ্মভক্ত। কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য এক ঘটী কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদ্‌ছে? যতক্ষণ ছেলে চুসী নিয়ে ভুলে থাকে, ততক্ষণ মা রান্না-বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। কিন্তু ছেলের যখন চুসী আর ভাল লাগে না—চুসী ফেলে চীৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে দুড়্ দুড়্ করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে, সাকার, কেউ বলে, নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা-রূপের কথা শুনিতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেরূপে দেখে, সে সেইরূপ মনে করে, বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে একবার যদি লাভ করতে পারা যায়, তা হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন করে?

"একটা গল্প শুন। একজন বাহ্যে গিছিলো। সে দেখ্‌লে যে, গাছের উপর একটী জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্‌লে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটী উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম, আমিও দেখিছি—তা সে লালরঙ হ'তে যাবে কেন! সে যে সবুজরঙ।' আর একজন বল্লে, 'না না—আমি দেখেছি হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্লে, "না জরদা, বেগুনী, নীল" ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য —সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়? আবার কখন দেখি, কোনও রঙ্‌ নাই?'

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রং—আবার কখন কখন কোন রঙ্‌ই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

"কবীর ব'লত, 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।'

"ভক্ত যে রূপটী ভালবাসেন, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্ত-বৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি সীতারামরূপ ধরেছিলেন।

[কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা।]

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ্‌ টুপ্‌ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই

অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলিয়া বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। দূর বলে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও—তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা কর্‌তে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়া, হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙ্ই নাই। আকাশ দূরে থেকে দেখ্‌লে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ্ নাই।

"তাই বলছি, বেদান্তবিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানারূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

[অনন্তকে জানা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ অতি সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে জান্‌বারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষজনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বর লাভের লক্ষণ।]

সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান।

"বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ জ্ঞানপথ - বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধির—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশ মাত্র থাক্‌লে সে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

"এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির (planes) কথা আছে। এই সাতভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের স্থান। মনের তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক্ হয়ে

বলে, 'একি! একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যখন কণ্ঠে উঠেছে, তখন অবিদ্যা অজ্ঞান সব দূরে গিয়েছে, তখন ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, তা হ'লে সে ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তমভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই সপ্তমভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

"এই কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ তোমাদের নয়। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি ও কর্ম্মত্যাগ।]

"আমায় একজন বলেছিল, মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হ'লে সব কর্ম্মত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। তার পর যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ তোমার নাম গুণ কথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন'—আর তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে, হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে

কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা, আমার একি হল! হলধারী বল্লে, একে গলিত-হস্ত বলে—ঈশ্বরের দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না।

"সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতাহাতী'—'নিতাই আমার মাতাহাতী।' ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে, "হাতী হাতী।" তার পর কেবল 'হাতী' এই কথাটী মুখে থাকে। শেষে 'হা' বলতে বলতে ভাব-সমাধি হয়। তখন যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন করছিল, সে চুপ হয়ে যায়।

"যেমন ব্রাহ্মণভোজন। প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সুমুখে করে বসল, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন', 'লুচি আন' শব্দ হ'তে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল, তখন সুপ্ সুপ্ (সকলের হাস্য) শব্দ নাই বল্লেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কর্ম্ম কমবে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশ মাসে কর্ম্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্ম্ম-ত্যাগ। ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে।

[ঈশ্বরলাভ ও লোকশিক্ষা প্রদান।]

"সমাধিস্থ হ'বার পর প্রায় শরীর থাকে না। কা'র ক'র লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির, আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হ'ল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোত বল্লে মুতবে না, পাছে তোমার উপকার হয় (সকলের হাস্য)। দু পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুসে চুসে এনে দেয় (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে বসলে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।]

ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)। হ্যাগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐ॰ বর্ণনা কর কেন ? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদি সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গিছল। আমি বল্লুম, তোমরা কি রকম ture দাও, আমি শুনবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল কেশব বল্‌তে লাগ্‌ল। বেশ বল্লে ; আমার ভাব হয়ে গিছল। কেশবকে আমি বল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন ?—"হে ঈশ্বর তুমি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি · করিয়াছ', এই সব ? যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐ বর্ণনা কর্‌তে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গহনা চুরী গেল, সেজ বাবু (রা মণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বল্‌তে লাগ্‌ল, 'ছি ঠাকুর তুমি তোমার গহনা রক্ষা করতে পারলে না !' আমি সেজ বাবুকে বল্লুম, 'ও তোমার কি বুদ্ধি ! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব ! এ গহনা তোমার পক্ষেই ভারি একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটীর ড্যালা। ছি ! অমন হীনবুদ্ধির কথা বল্‌তে নাই, তুমি কি ঐশ্বর্য্য তাঁকে দিতে পার ?' তাই বলি, যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে চায়, তার বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী ক'টা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী, এর খবরে কাজ কি ? নরেন্দ্রকে (বিবেকানন্দকে) যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার কটী ভাই, এসব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্য-রসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি ! অনন্ত ঐশ্বর্য্য ! অত খবরে আমাদের কাজ কি !'

আবার সেই গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান।

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি, হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতী, জ্বলবে সদা অনুক্ষণ ॥

ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় তাবার সে কোন্ জন।
কবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

"তবে তাঁকে দর্শনের পর ভক্তের ইচ্ছা হয় যে, তাঁর লীলা কিছু দেখি। যখন রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ কল্লেন, তখন বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌ল। লক্ষণ বল্লেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, আর অত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে! রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান করে, সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, নিকষা বল্লে, রাম, এত দিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে যে, তা হলে তোমার আরো কত লীলা দেখ্‌বো (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি) "তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে শুদ্ধাত্মাদের না দেখ্‌লে কি নিয়ে থাক্‌ব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্ব্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।

[জন্মান্তর।]

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমি শুনেছি, জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝব? অনেকে বলে গেছেন, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না। ভীষ্মদেব যখন দেহ ত্যাগ কর্‌বেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, যিনি অষ্ট-বসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদচেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বল্লেন, "কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সে জন্য কাঁদ্‌ছি না। আমি যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের তুমি—স্বয়ং ভগবান্—নিজে সারথী, তাদেরও দুঃখের বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদ্‌ছি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না।"

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[কীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে।]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। এতক্ষণে প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটা হইয়াছে। সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতা পল্লব সব শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিল। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতে লাগিল। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতে পাইল, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত শ্রীযুক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'ভাগবতভক্ত ভগবান্, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।' বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

কনখল

উদ্বোধনের পাঠক মহোদয়গণ ১৫ই ভাদ্রের উদ্বোধনে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম-সম্বন্ধী স্বামী কল্যাণানন্দের পত্র পাঠ করিয়াছেন।

যদিও তীর্থস্থানে অন্নসত্রাদির সদ্ভাব থাকায় সাধুদিগকে ভিক্ষাক্লেশ পাইতে হয় না সত্য, কিন্তু যে সকল তীর্থস্থান লোকালয় হইতে দূরে, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত, তথায় রোগাক্রান্ত হইলে যে তাঁহাদিগকে সমধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধু মহাত্মারা সচরাচর

একাকী বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভাল বাসেন, সুতরাং অসুস্থ হইলে তাঁহা-দিগকে যে কত যাতনা সহ্য করিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কত মহাত্মারই না সামান্য সেবার অভাবে সমগ্র জগতের শুভকল্পে নিযুক্ত পুণ্যপুঞ্জময় দেহ বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত অভাবের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎপ্রতিবিধানের যৎসামান্য চেষ্টা স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসীমণ্ডলী রোগগ্রস্ত, অসহায় সাধু ও তীর্থযাত্রীদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত গত আষাঢ় মাস হইতে হরিদ্বারের নিকট কনখলে উক্ত সেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সেবালয়ে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া সাধু ও দরিদ্র তীর্থ যাত্রীদিগের সেবা করা হইতেছে। সহায়তা পাইলে ক্রমে ক্রমে অন্য তীর্থেও এবম্বিধ সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পরের অভাব ও ক্লেশে আপনি অভাব ও ক্লেশ বোধ করিয়া উৎফুল্ল অন্তরে তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সিদ্ধির অন্যতম উপায়। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন পবিত্র ধর্ম্মভাব আজিও প্রদীপ্ত রাখিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবাসীর, কেবল ভারতবাসীর কেন, সমগ্র জগৎবাসীর হিত সাধনের জন্য আপনাদিগের মহৎ জীবনে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অসুস্থতার সময়, তাঁহাদিগের শারীরিক ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা যে পরম কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর ও অর্থের আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে? এই জন্যই আমরা আশা করি যে সকলেই আপনাপন সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া উক্ত সেবালয়ের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব বিধান করিবেন।

যিনি যাহা কিছু এই শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রদান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রে প্রকাশিত হইবে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা:—স্বামী বিমলানন্দ, সহকারী সম্পাদক,

"প্রবুদ্ধ ভারত," অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া।

(কুমায়ুন)

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৬৬৪ পৃষ্ঠার পর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজকুমারী।

শ্রীরামানুজ এক্ষণে গৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করেন। তিনি মাতা ও মাতৃ-স্বসাকে যাদব প্রকাশের কথা বলিয়া উভয়কে তাহা গোপনে রাখিতে কহিয়া-ছিলেন এবং স্বয়ংও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মাসত্রয় পরে সশিষ্য যাদব প্রকাশ কাঞ্চিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দ ভিন্ন সকল শিষ্যই তাঁহার সহিত আসিয়াছেন। দীপ্তিমতী পুত্রের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ জানিতে পারিলেন,--রামানুজের বনমধ্যে অদর্শনের পর, তীর্থযাত্রীগণ দুঃখিত হৃদয়ে ৮ বারাণসীধামের দিকে অবিশ্রামে চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে গন্তব্যস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়া ৮ বিশ্বেশ্বর দর্শন পূর্ব্বক আপনাদের কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহারা এক পক্ষকাল উক্তধামে অবস্থান করেন। একদা তথায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গোবিন্দ জলের ভিতর এক সুন্দর বাণলিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। যাদব প্রকাশ তদ্দর্শনে গোবিন্দকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "বৎস, পার্ব্বতীপতি তোমার প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি এই অনর্ঘ লিঙ্গরূপে ত্বদীয় সেবা গ্রহণের জন্য তোমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া-ছেন। প্রাণপণ যত্নে ইঁহার সেবা কর, ভুক্তি মুক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।" গুরুবাক্যানুসারে গোবিন্দ সেই দিবস হইতে শিব সেবা পরায়ণ হইলেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তি এরূপ দৃঢ় হইল যে কালহস্তীর নিকট আসিয়া তিনি স্বীয় গুরু ও সতীর্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল উমাপতির সেবায় অতিবাহিত করিতে চাই। এই স্থানটি অতি মনোরম ও নির্জ্জন। এখানে থাকিয়া আমি ইষ্টদেবের উপাসনা করিব। আপনারা আমার মাতা ও মাতৃস্বসাকে যাইয়া ইহা নিবেদন করিবেন।" ইহা কহিয়া গোবিন্দ তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী মঙ্গলগ্রামে একটি স্থান ক্রয় করিয়া তথায় স্বীয় ইষ্টদেবকে স্থাপন করিলেন ; এবং তাঁহার সেবায় জীবন মন অর্পণ করিয়া পার্থিব সকল বন্ধন হইতেই মুক্ত হইলেন।

পুত্রের ঈদৃশ সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দীপ্তিমতী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সাধারণ রমণীর ন্যায় তিনি পুত্রগৃধ্নু ছিলেন না। তাঁহারও ঈশ্বরে প্রগাঢ় প্রেম ছিল। সুতরাং তাঁহার মনে পুত্রের জন্য ক্ষোভের উদয় না হইয়া তিনি আপনাকে সৎপুত্রপ্রসূতি জানিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন। ভগ্নীর অনুমতি লইয়া পুত্রমুখদর্শনের জন্য তিনি মঙ্গলগ্রামে গমন করিলেন, এবং সন্তানের ভগবদ্ভক্তি সন্দর্শনে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বৎসকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগ্নীর নিকট প্রত্যাগত হইলেন।

যাদবপ্রকাশ পুনরায় অধ্যাপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রামানুজকে দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ কিছু ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুরভিসন্ধির বিষয় সে কিছুই জানে না, ইহা স্থির করিয়া মৌখিক আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার জননী সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, তুমি যে জীবিত আছ, ইহাপেক্ষা আমার আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। বিন্ধ্যারণ্যে তোমার জন্য যে আমরা কি কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব।" রামানুজ পাদ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "সকলই আপনার অনুগ্রহ।"

যিনি সকল মতের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিতে পারেন, তিনি অন্যান্য সমুদয় বিষয়ে যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণমনা হইতে হইবে। যাদবপ্রকাশের অশেষ গুণ ছিল, কিন্তু অদ্বৈত পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য মতের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌকর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি একবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য রামানুজের নম্রতা ও সৌশীল্য সন্দর্শনে এবং আপনার রাক্ষসতুল্য আচরণ স্মরণ পূর্ব্বক, তিনি মনে মনে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। পরে সস্নেহে রামানুজকে কহিলেন, "বৎস, অদ্য হইতে মৎসকাশে পাঠাভ্যাস করিও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" সেই দিবস হইতে রামানুজ পুনরায় পাঠার্থ যাদব মণ্ডপে গতায়াত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ আল্‌ওয়ান্দার কাঞ্চিপুরস্থ শ্রীশ্রীবরদরাজ সন্দর্শন বাসনায় তথায় বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে উপনীত হয়েন। একদা হস্তিগিরিপতি বরদারাজকে সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে মহাত্মা আল্‌ওয়ান্দার, রামানুজের স্কন্ধের উপর হস্ত রাখিয়া অন্যান্য শিষ্য সমভিব্যাহারে অদ্বৈতকেশরী যাদবপ্রকাশকে আগমন করিতে দেখিলেন। বৃদ্ধ যামুনাচার্য্য রামানুজের সাত্ত্বিক প্রভা, অতুল সৌন্দর্য্য, এবং প্রতিভোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই

যুবকই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের ভক্তিপ্রধান সুবিস্তৃত ব্যাখ্যার রচয়িতা। ইহাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু শুষ্ক তার্কিক যাদবের সহবাসে তাঁহাকে থাকিতে দেখিয়া তিনি কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং বরদারাজের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন,

"যস্য প্রসাদকলয়া বধিরঃ শৃণোতি
পঙ্গুঃ প্রধাবতি জবেন চ বক্তি মূকঃ।
অন্ধঃ প্রপশ্যতি সুতং লভতে চ বন্ধ্যা
তং দেবমেব বরদং শরণং গতোঽস্মি॥
লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টং কর্তুমর্হসি॥"

প্রপন্নামৃতম্।

"যাঁহার অত্যল্প প্রসাদ হইলে, বধির শ্রবণ করিতে পারে, খঞ্জ সবেগে ধাবমান হইতে পারে, জীহ্বাহীনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, এবং বন্ধ্যা সন্তান লাভ করে, আমি সেই বরদ দেবের শরণাগত হই। হে নলিন-নেত্র শ্রীপতে, রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বীয় মতে আনয়ন কর।"

যামুনাচার্য্য, বিষ্ণুপ্রেমার চিত্তাহ্লাদকরী কমনীয় মূর্ত্তিকে বিষ্ণুভক্তিহীন শুষ্কহৃদয় যাদব পার্শ্বে সমবস্থিত দেখিয়া, নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। রামানুজ-সম্ভাষণের ক্ষুধা তাঁহার সাতিশয় বলবতী হইলেও মধুবিষসম্পৃক্তান্নের ন্যায় অতি অনিচ্ছার সহিত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভবিষ্যতে যদি ঈশ্বর সুযোগ দেন, তাহা হইলে একান্তে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপে চিত্তকে প্রবোধ দিয়া, ভক্তিরসৈকপরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধ শতাধিকবর্ষবয়স্ক বৈষ্ণবচূড়ামণি, স্থবির আলওয়ান্দার শ্রীরঙ্গমে প্রতিগমন করিলেন।

বেদান্ত ভিন্ন যাদবাচার্য্য মন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিশাচগ্রস্ত, ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি মন্ত্রবলে তাহা-দিগকে আরোগ্য করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত ছিল।

একদা কাঞ্চিপুর-রাজকুমারী ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হওয়ায়, চতুর্দ্দিক্ হইতে সুবি-খ্যাত মন্ত্রবিদ্গণ আনীত হইলেন। কিন্তু কেহই কুমারীর আরোগ্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। পরে বহুমানসহকারে বেদান্তাচার্য্য যাদবপ্রকাশকে আনয়ন

করা হইল। ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা রাজকুমারী যাদবকে সন্দর্শন করিয়া উচ্চহাস্য সহকারে কহিলেন, "ওহে যাদব, এখানে তোমার মন্ত্রাদি কোনও ফল প্রসব করিবে না, মিথ্যা কেন কষ্ট পাইবে, গৃহে ফিরিয়া যাও।" যাদব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক প্রহর কাল ধরিয়া নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহাতে ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে কহিল, "কেন মিথ্যা কষ্ট করিতেছ? তুমি আমাপেক্ষা হীনবল। সুতরাং আমায় স্থানচ্যুত করিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। যদি একান্তই তোমার অভিপ্রায় হয় যে আমি এই সুখস্পর্শা, কোমলাঙ্গী রাজকুমারীর দেহমন্দির হইতে অপসৃত হই, তাহা হইলে তোমার শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, আজানুলম্বিত-বাহু, বিস্তৃতললাট, আয়তচক্ষু, প্রতিভা দেবীর আবাসভূমি, যৌবনোদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুমস্বরূপ, মাধুর্য্যৈকনিলয়, তুমি সেই শ্রীমান্ রামানুজকে এখানে আনয়ন কর। মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার নিবিড় অন্ধকার যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অপসৃত হয়, সেইরূপ সেই মহানুভবের উদয়েও আমি অপসৃত হইব, নতুবা নয়।"

যাদবাদেশে তখনই শ্রীমান রামানুজ তথায় আনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্ম-রাক্ষসকে রাজকুমারীর দেহ হইতে অপসৃত হইতে কহিলে সে কহিল, "আপনি কৃপা করিয়া আমার মস্তকে শ্রীপদ স্থাপন না করিলে আমি যাইব না। অধীনের এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।" গুরুর আদেশে রামানুজ রাজকুমারীর মস্তকে স্বীয় পদদ্বয় স্থাপন করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে রাজতনয়াকে নিষ্কৃতি দাও এবং তুমি যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার কিছু নিদর্শন দেখাইয়া যাও"। ব্রহ্মরাক্ষস কহিল, "এই আমি পরিত্যাগ করিলাম। নিদর্শন স্বরূপ নিকটবর্ত্তী ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চ শাখা এক্ষনই ভগ্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছি।"

দেখিতে দেখিতে মড় মড় শব্দে অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চ শাখা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং রাজকুমারীও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে সম্যক্ সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনার অবস্থা বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অব-ধারণ করিতে পারিলে ব্রীড়াবনতমুখী হইলেন এবং লোকসমাগম পরিত্যাগ বাসনায় দাসীপরিবৃতা হইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া গেলেন।

কাঞ্চিরাজ কন্যার আরোগ্যবার্ত্তা শ্রবণে দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া যাদবসনাথ রামানুজের পদবন্দনা পূর্ব্বক বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সেই দিবস হইতে শ্রীমান্ রামানুজের নাম সমুদয় চোলরাজ্যে বিখ্যাত হইয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত ভূতাবিষ্টের কথা কেবল যে রামানুজচরিতেই আমরা প্রথম

দেখিতেছি তাহা নহে। ঈশাজীবনী পাঠেও আমরা অনুরূপ ঘটনার বিষয় অবগত হই। বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে অদ্যাবধি অনেক স্থলে কোন কোন রমণী ভূতগ্রস্তা হয়েন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণকে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করেন। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ইহার কারণ। স্বভাবকোমলতা প্রযুক্ত স্ত্রী জাতির স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অধিক। এই হেতু তাঁহারাই অধিকাংশ হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্তা হয়েন। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। স্নায়ুই মানবের মানবত্ব বিধান করে। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা বা সবলতায় মানব দুর্ব্বল বা সবল হয়েন। এরূপ বিচারানুসারে স্নায়ুর নাশেও মানবের নাশ হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাক সম্প্রদায়ভুক্তগণও বহুকাল পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহা যে অপসিদ্ধান্ত, ইহা আত্মনিত্যত্ববাদীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা দেহকে রক্ষা করেন, দেহ আত্মাকে রক্ষা করে না, কারণ আত্মসত্তায় দেহের সজীবতা ও আত্মাসত্তায় তাহার যে পূতিভাব সম্পাদিত হয়, ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। সুতরাং আত্মা বা মানব দেহের অধীন না হইয়া, দেহ মানবের অধীন। মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া জগতের সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। ঈপ্সাময় আত্মা সর্ব্বদাই দেহসহায়ে ভোগ্য ভোগের জন্য ব্যস্ত। এই আত্মা স্থূল দেহযুক্ত হইলে মনুষ্য পশুমৃগপক্ষিকীটপতঙ্গাদিরূপে বিরাজিত হয়েন, এবং তদ্বিযুক্ত হইলে গুণানুসারে দেবতা, উপদেবতা, ব্রহ্মরাক্ষস, ভূত প্রেত প্রভৃতির আকার ধারণ করেন। শেষোক্ত আকারগুলি সূক্ষ্ম বলিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা নাই, ইহা বাতুলের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বে অস্বীকার করাও বাতুলতা। সাংখ্যকারিকাকার মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণ অতি সুন্দররূপে ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥
সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।"

"যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহা নাই বলিতে পার না, কারণ অতিদূরে থাকিলে, অতি নিকটে থাকিলে, ইন্দ্রিয় বিকল হইলে, মনঃসংযোগ না থাকিলে, বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইলে, দ্রব্যান্তর ব্যবধান থাকিলে, সূর্য্যালোকে গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় অন্য বস্তু কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, জলে জলমিশ্রণের ন্যায় সমানাকারতা প্রাপ্ত

হইলে, কিম্বা কেবলমাত্র অতি সূক্ষ্ম-যোগিবুদ্ধির গোচর হইলে, সাধারণ মনুষ্য পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিদ্যমান বস্তুকেও উপলব্ধি করিতে পারে না। নাই বলিয়া নহে। কারণ, কার্য্য দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।"

সূক্ষ্ম শরীর সত্বপ্রধান হইলে দেবশরীর, রজঃপ্রধান হইলে উপদেবাদির শরীর, এবং তমঃপ্রধান হইলে ব্রহ্মরাক্ষস, ভূত প্রেতাদির শরীররূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মশরীরীগণ স্থূল শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। এইজন্য সাত্বিক মানবে দেবতার আবেশ, রাজসিক মানবে উপদেবতার আবেশ, ও তামসিক মানবে ভূত প্রেতাদির আবেশ হওয়া সম্ভব।

এই ঘটনার পর যাদবপ্রকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রামানুজ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন এবং তাঁহার সূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। একদা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", (ছান্দোগ্য) এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ) এই মন্ত্রাংশদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে যাদব অতি সুন্দররূপে, প্রভূত বাগ্মিতা সহকারে, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যান কৌশলে রামানুজ ব্যতীত সকল শিষ্যই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে রামানুজ মন্ত্রাংশদ্বয় সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য এইরূপে প্রকাশ করিলেন। "'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', ইহার অর্থ 'নিখিল জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ' হইত, যদি না উহার পরবর্ত্তী "তজ্জলান্" উক্ত অর্থকে বিশেষিত করিত। এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে, এবং ব্রহ্মেই লয় হয় বলিয়া, ইহাকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মময় বলা যাইতে পারে। মৎস্য জল হইতে জন্মিয়াছে, জল দ্বারা জীবন ধারণ করে, জলেই লয় হয় বলিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে জলময় বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৎস্য যেমন কখনও জল হইতে পারে না, সেরূপ জগতও কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইহার অর্থ 'একাধিক কোনও বস্তু নাই' এরূপ নয়, কিন্তু 'এ সংসারে বস্তু সমূহ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত নহে।' মণিগণ যেরূপ একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একমালাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এক ব্রহ্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। বহু একে সংযুক্ত হইয়া একাকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, ইহাতে বহুত্বের কোনও হানি হয় নাই।"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া যাদব যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রামানুজকে কহিলেন যে, "যদি আমার ব্যাখ্যা রুচিকর না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট আর আসিও না।" রামানুজ "আপনার যেরূপ অনুমতি" ইহা বলিয়া সবিনয়ে

গুরুপাদ বন্দনা পূর্ব্বক সেই দিবস হইতে যাদবগৃহে যাইতে নিরস্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ।

পরদিন শ্রীরামানুজ গৃহে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। বেলা প্রায় অর্দ্ধপ্রহর। সেই স্মিতবিকসিতবদন, ভগবদ্দাস্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ কাঞ্চিপূর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন দিয়া কহিলেন, "আমার ভাগ্যবশতঃই অদ্য আপনার শুভাগমন হইয়াছে। করুণাময় বরদরাজের অপার স্নেহ, সেই জন্যই তিনি তাঁহার এই অজ্ঞবালককে ভয়ঙ্কর সংসারারণ্যে সহায়হীন বিচরণ করিতে দেখিয়া আপনাকে পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সুধীবর যাদবপ্রকাশ তাঁহার পদতলের ছায়া হইতে আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন, শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে যে কেবল আপনার ন্যায় মহান্ চন্দন তরুর সুশীতল ছায়া পাইব বলিয়া, তাহা এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। আপনি আমার গুরু, অনুগ্রহ করিয়া আমায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।" শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস রামানুজ, আমি শূদ্র, এবং মূর্খ। তুমি সদ্‌ব্রাহ্মণ এবং মহা-পণ্ডিত। আমায় ওরূপ বলা তোমার উচিত নহে। আমি বয়োবৃদ্ধ বটে, কিন্তু তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ। শাস্ত্রাদিতে আমার তাদৃশী পারদর্শিতা নাই, সেই জন্যই শ্রীবরদরাজের দাস্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আমি তোমার দাস, তুমি আমার গুরু।" শ্রীরামানুজ ইহাতে কহিলেন, "মহাশয় আপনিই যথার্থ পণ্ডিত। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা জানা যায় যে এক ঈশ্বরই সত্য, এবং তাঁহার সেবাই পরম পুরুষার্থ। শাস্ত্রজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি প্রসব না করিয়া যদি কেবল পাণ্ডিত্যাভিমান প্রসব করে, তাহা হইলে তাহা মিথ্যাজ্ঞান। তদপেক্ষা অজ্ঞান ভাল। আপনিই শাস্ত্রের যথার্থ সার আস্বাদন করিয়াছেন, অন্যান্য পণ্ডিতগণ চন্দনভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় তাহা কেবল বহন করিতেছে মাত্র। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন না, আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম।" এই বলিয়া রামানুজ সহসা তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া দীন-জনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে তখনই ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, তোমার ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি অদ্য হইতে প্রতিদিন এক কলস শালকূপের পবিত্র জল শ্রীবরদরাজের অর্চ্চনার্থ স্বয়ং আনয়ন করিও। অতি শীঘ্রই হস্তিগিরিপতি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।" "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" রামানুজ এই বলিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে এক নূতন কলস আনয়নপূর্ব্বক শালকূপের দিকে চলিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ শ্রীবরদরাজের সেবার্থ তদীয় শ্রীমন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ।)

এই উপায়গুলিও তাহারা রক্ষা করিল। সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাঁড়াইল।

হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা পূর্ব্বে পার্চমেণ্টে লিখিত। এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, অতএব পার্চমেণ্টে লেখা তাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার। এইরূপ সকল জাতির সম্বন্ধেই। এক্ষণে যে আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাঁহাদের ধারণা সকল পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইল, কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐ গুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র বলিয়া গণিত হইল। তৎপরে একদল লোক এই যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহারাই পুরোহিত। ইঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে আসিতেন—যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আহুতি দেওয়া যায়, কতকগুলি স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিতে পারেন, প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইল। নচিকেতা এই জন্যই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, 'কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন, থাকে না, আপনি আমাকে এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।'

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার প্রথমোক্ত বরদ্বয় পূরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, "প্রাচীনকালে দেবতারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতঃ, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, আমাকে এ বিষয়ে আর অনুরোধ করিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কহিলেন, 'হে মৃত্যো, দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় বক্তা পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।"

যম বলিলেন, "শতায়ু পুত্র পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীর উপরে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাক। অন্য কোন বর তুমি যদি ইহার তুল্য মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর, অথবা অর্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কর। অথবা হে নচিকেতঃ, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর ভাগী করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তুলাভ দুর্লভ, তাহা প্রার্থনা কর; এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদ্যশালিনী রমণীগণকে মানুষে লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতঃ, আমার প্রদত্ত এই সকল কামিনীগণ তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যুসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।"

নচিকেতা বলিলেন, "এ সকল বস্তু কেবল দুদিনের জন্য—ইহারা সমুদয় ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও বাস্তবিক অতি অল্প। এই অশ্ব রথ গীতবাদ্য তোমারই থাকুক। মানুষ বিত্তদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না। তোমাকে যখন দেখিতে হইবে, তখন আমরা বিত্ত চিরকালের জন্য কি করিয়া রক্ষা করিব? তুমি যতদিন ইচ্ছা করিবে, আমরা ততদিনই জীবিত থাকিব। আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাই আমার বরণীয়।"

যম এতক্ষণে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেয়) এই দুইটির বিভিন্ন উদ্দেশ্য—ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি তাহার মধ্যে পরম কল্যাণকে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য ভোগ গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে বিচার করিয়া একটীকে আর একটী হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন। তিনি শ্রেয়ঃকে প্রেয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের জন্য প্রেয়কেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতঃ, তুমি আপাতরম্য বিষয় সকলের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া, উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ।" তখন যম নচিকেতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির খুব উন্নত ধারণা এই প্রাপ্ত হইলাম যে, যতদিন না মানুষের ভোগবাসনা ত্যাগ হইতেছে, ততদিন তাঁহার হৃদয়ে সত্যজ্যোতির প্রকাশ হইবে না। যতদিন এই সকল বৃথা বিষয় বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লইয়া গিয়া আমাদিগকে বাহ্য প্রত্যেক

বস্তুর, এক বিন্দু রূপের, এক বিন্দু আস্বাদের, এক বিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে ততদিন আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে?

যম বলিতেছেন,"যে আত্মার সম্বন্ধে,যে পরলোক তত্ত্বসমন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা বিত্তমোহে মূঢ় বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই, এরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে।"

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, বক্তাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক, শ্রোতাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক। গুরুরও অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, শিষ্যেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ, পরমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটী অঙ্গ আছে, যাহাতে বিশ্বাসের উপর খুব ঝোঁক দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিষ, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটীকে একটু তলাইয়া বুঝিলে দেখিব, ইহার পশ্চাতে একটী মহান্ সত্য আছে। যাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই,—আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিতেছি। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কে কখন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় তর্কই কতকগুলি সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত। এই সিদ্ধান্তগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্ব্বেই যাহা সুনিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে তুলনার প্রণালীকে যুক্তি কহে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি চলিতেই পারে না। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেই বা না হইবে কেন?

আমরা পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমে পড়িয়া থাকি:—বহির্ব্বিষয় সমুদয়ই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। বহির্ব্বিষয় কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না বা উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা উহারা লব্ধ হয়। আবার সমুদয় তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিৎ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা

হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটা ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সমুদয় বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবেত্তাগণও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিচার যুক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে, ভাবিয়া থাকে, ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই—যদি কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়, তবে তাহা বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম বলার ব্যাপার নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে উহা বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম। যতই চীৎকার কর না কেন, তাহা ধর্ম্ম নহে। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ, যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাঁহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। যেমন জগতের অস্তিত্ব আছে কি না—এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের (Idealists) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এইরূপ তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি জগৎ রহিয়াছে, উহা চলিয়াছে। আমরা কেবল এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেই তাহাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষে আসিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে, তেমনি পরমার্থ বিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহারই উপর ধর্ম্ম স্থাপিত হইবে। অবশ্য কোন ধর্ম্মের যে কোন মত বিশ্বাস করিতে হইবে, এই অযৌক্তিক দাবীতে কোন আস্থা করা যাইতে পারে না; উহা মনুষ্যমনের অবনতিসাধক। যে ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকেও অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তোমাকেও অবনত করে। জগতের সাধুপুরুষগণের আমাদিগকে কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর কতকগুলি সত্য পাইয়াছেন, আমরাও ঐরূপ করিলে, তবে আমরা উহা বিশ্বাস করিব,

তাহার পূর্ব্বে নহে। ধর্ম্মের মোট কথাটাই এই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিবে, যাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন, তাহাদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। অতএব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, 'তোমরা যাহারা সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সকলেই ভ্রান্ত,' তাহার কথার যত টুকু মূল্য, ইহাদের কথারও তত টুকু মূল্য। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্ম্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে, লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা করিবার আবশ্যকতা নাই।

এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। ধর্ম্ম লইয়া এই সকল গণ্ড গোল, মারামারি, বিবাদ বিসম্বাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমরা বুঝিব, ধর্ম্ম গ্রন্থবিশেষে বা মন্দির বিশেষে আবদ্ধ নহে, অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নহে। ইহা প্রত্যক্ষানুভূতি। আর যে ব্যক্তি বাস্তবিক ঈশ্বর এবং আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই বাস্তবিক ধার্ম্মিক; আর এই প্রত্যক্ষানুভূতিবিহীন হইলে উচ্চতম ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্ম্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক, আমরা তাহা মানিয়া লই না কেন? কেবল বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মের সত্যসকলে সম্মতিদান করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। একজন খ্রীশ্চিয়ান বা মুসলমান অথবা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর কথা ধর। খ্রীষ্টের সেই পর্ব্বতে ধর্ম্মোপদেশদানের কথা মনে কর। যে কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্য্যে পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়, তথাপি কথিত হইয়া থাকে, পৃথিবীতে এত কোটী খ্রীশ্চিয়ান আছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলেই খ্রীশ্চিয়ান? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন না কোন সময়ে এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। দুকোটি লোকের ভিতর একটী প্রকৃত খ্রীশ্চিয়ান আছে কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, ত্রিশকোটি বৈদান্তিক আছেন। যদি প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করিতে যায়, আমরা তাহার সহিতই বিবাদে

প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। আমরা সকলেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম্ম আমাদের কাছে যেন কিছুই নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতে অনুমোদন মাত্র, কেবল কথার কথা—অমুক বেশ ভাল বলিতে কহিতে পারে, অমুক পারে না। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম—"শব্দ যোজনা করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা, এই সকল কেবল পণ্ডিতদের, আমাদের নিমিত্ত—ধর্ম্মার্থে নহে।" যথনই আমাদের আত্মার এই প্রত্যক্ষানুভূতি আরম্ভ হইবে, তখনই ধর্ম্ম আরম্ভ হইবে। তখনই তুমি ধার্ম্মিক হইবে এবং তখনই, কেবল তখনই, নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এক্ষণে রাস্তার পশুদের অপেক্ষাও বড় অধিক নীতিপরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসন ভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলেন, চুরী করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি হরণার্থ ব্যাগ্র হইয়া দৌড়াইব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তি লোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুগণ হইতে খুব অল্পই উন্নত। আমরা আপনাদের গৃহের গুপ্তস্থানে বসিয়া বুঝিতে পারি, একথা কতদূর সত্য। অতএব আইস, আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। স্বীকার করি আইস, আমরা ধার্ম্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘৃণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ আর আমাদের ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমায় কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার অন্তরের অন্তরে কখন একথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই দেশ দেখ নাই। অবশ্য, অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পার বটে, আমি সেই দেশ দেখি নাই, কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহ্য জগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও উজ্জলভাবে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে, তখন কিছুতেই তোমার বিশ্বাসকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তখনই প্রকৃত বিশ্বাসের আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা 'যাহার এক সর্ষপ পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড়টি তাহার কথা শুনিবে', এ কথার তাৎপর্য্যই এই। তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই

সত্যকে জানিতে পারিবে—কেবল বিচারপূর্ব্বক সত্যে সম্মতি দেওয়া কিছুই নয়।

একমাত্র কথা এই, প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? বেদান্তের ইহাই মূলকথা—ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার কর—কেবল কথায় কিছু হইবে না; কিন্তু সাক্ষাৎকার করা বড় কঠিন। যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গুহ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ, যিনি প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন, সাধুগণ তাঁহাকে অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তখনই তাঁহারা সুখ দুঃখ উভয়েরই পারে গিয়াছেন, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম্ম বলি, শুভাশুভ সকল কর্ম্ম, সৎ অসৎ, সকলেরই পারে গিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই সেই সত্যকে দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল? স্বর্গের ধারণা এই—দুঃখশূন্য সুখ। অর্থাৎ আমরা চাই—সংসারের সব সুখগুলি, উহার দুঃখগুলি বাদ দিয়া। অবশ্য ইহা অতি সুন্দর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া থাকে। কিন্তু এ ধারণাটী একেবারেই আগাগোড়াই ভুল, কারণ পূর্ণ সুখ বা পূর্ণ দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'তবে আমি কাল কি করিব?' বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাঁহার পক্ষে দারিদ্র্য, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের আবশ্যকেরও অতিরিক্ত। বাস্তবিক সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? উহারা ক্রমাগত বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, আমার মনে হইত, গাড়ী হাঁকাইতে পারিলে আমি সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন আমার তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন্ সুখকে ধরিয়া থাকিবে? এইটী আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আর এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে। প্রত্যেকের সুখ ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটী লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন রাশ-খানেক আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়ত ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিম নির্ম্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে স্বর্গ বড় সুবিধাকর হইবে না। আমরা পুনঃ পুনঃ আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, তাহার নিম্ন দিয়া নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে। আমি আমার

জীবনের অধিকাংশ এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেথানে অত্যন্ত অধিক জল, অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতি বর্ষে এই জলের প্রাবল্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। অতএব আমার স্বর্গ নিম্নদেশে নদীপ্রবাহযুক্ত উদ্যানপূর্ণ হইলে চলিবে না, আমার স্বর্গ শুষ্কভূমিপূর্ণ অধিকবর্ষাশূন্য হওয়া আবশ্যক। আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। কোন যুবক স্বর্গের চিন্তা করিলে এমন এক স্বর্গের বিষয় ভাবিবে যেখানে সে সুন্দরী স্ত্রী পাইবে। সেই ব্যক্তিই বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্ম্মাতা আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্নরূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেথানে অনন্ত ইন্দ্রিয় সুখ লাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ উন্নতি কিছুই হইবে না—যাহারা বিষয় ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি? একটু হাসিকান্না, তারপর কুকুরের ন্যায় মৃত্যু। যখন এই সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুখ ভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ, তুমি জান না, প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্রে আনন্দ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি, তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা এই যে, উহা একটী ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র—সেখানে সকলে ওডিন (Woden) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে। কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহশীকার আরম্ভ হয়। পরে আপনারাই যুদ্ধ করে ও পরস্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতসকল আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারা তখন একটী হলে (Hall) গিয়া সেই বরাহের মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন ও আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। তারপর দিন আবার সেই বরাহটী জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শীকারাদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণার একটু চাকচিক্য আছে মাত্র। আমরা সকলেই এইরূপ শূকরশীকার করিতে ভালবাস—আমরা এমন এক স্থানে যাইতে চাহি, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেমন তাহারা কল্পনা করে

জানীহি যস্মান্মম প্রকৃতি যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাং অতোঽহং কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ প্রলয়ো বিনাশস্তথা প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরোজগতঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এতদিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এই পর ও অপর দুইটী প্রকৃতি যে সকল ভূতের যোনি (অর্থাত্) কারণ, তাহাদিগকে এতদ্যোনি বলা যায়; সকল ভূতই এতদ্যোনি ইহা তুমি জান। যে কারণে আমারই প্রকৃতি-দ্বয় এই সকল ভূতের উৎপত্তি হেতু, এইজন্য আমিই কৃৎস্ন (অর্থাত্) সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশ (এই দুইটীর কারণ), এই দুইটী প্রকৃতিকে দ্বার-স্বরূপ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বরস্বরূপ আমি জগতের উৎপত্তির কারণ (হইয়া থাকি) ইহাই অর্থ ॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—হে ধনঞ্জয় অন্যৎ কিঞ্চিৎ (অপি) মত্তঃ পরতরং, নাস্তি সূত্রে মণিগণাইব ময়ি ইদং সর্ব্বং প্রোতং ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর অন্য কোন বস্তুই (এই বিশ্বের কারণান্তর রূপে) থাকিতে পারে না, সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতেই এই বিশ্ব সকল গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

ভাষ্য।—যতস্তস্মাৎ মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরং অন্যত্ কারণান্তরং কিঞ্চি-ন্নাস্তি নবিদ্যতে অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়, যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুবিদ্ধং গ্রথিতং ইত্যর্থঃ দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ সূত্রেচ মণিগণাইব ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ এই প্রকার সেই জন্যই আমিই পরমেশ্বর আমা হইতে পরতর অন্য কোন কারণান্তর নাই। আমি জগতের কারণ ইহাই অর্থ। হে ধনঞ্জয়, যে কারণে এইরূপ এইজন্য পরমেশ্বর স্বরূপ আমাতে সর্ব্বভূত (অর্থাৎ) এই পরিদৃশ্যমান সকল বিশ্ব "প্রোত" অনুগত অনুস্যূত অনুবিদ্ধ অর্থাৎ গ্রথিত রহিয়াছে, যেমন দীর্ঘতন্তুসমূহে পট কিংবা সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয় অহং অপ্সু রসোঽস্মি শশিসূর্য্যোয়োঃ প্রভাস্মি সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ (অস্মি), খে শব্দঃ (অস্মি) নৃষু পৌরুষম্ (অস্মি)॥ ৮॥

মূলানুবাদ।—হে কৌন্তেয় আমি জলে রস স্বরূপে বিদ্যমান আছি, এই প্রকার চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রভারূপে বিদ্যমান আছি, আমি সকল বেদের মধ্যে প্রণবরূপে বিদ্যমান আছি, আমি আকাশে শব্দ ও মনুষ্য নিবহে পৌরুষ রূপে বিদ্যমান আছি॥ ৮॥

ভাষ্য।—কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমিত্যুচ্যতে। রসোঽহং অপাং যঃ সারঃ স রসঃ তস্মিন্ রসভূতে ময়ি আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ইত্যর্থ এবং সর্ব্বত্র। যথাহমপ্সু রসঃ এবং প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতস্তস্মিন্ময়ি খং প্রোতং। তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ যতঃ পুংবুদ্ধির্নৃষু তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন্ কোন্ ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষিত তোমাতে এই সকল বিশ্ব প্রোত রহিয়াছে (এই প্রকার অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা সম্ভাবনা করিয়া) তাহার উত্তর দিতেছেন। জলের যাহা সার তাহারই নাম রস, সেই রস স্বরূপ আমাতে সকল জল প্রোত রহিয়াছে ইহাই অর্থ। এইরূপ ব্যাখ্যা অগ্রে সর্ব্বত্রই (করিতে হইবে), যেমন আমি জল সমূহে রস, সেই রূপই চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রভা স্বরূপে বিদ্যমান আছি। প্রণব (শব্দের অর্থ) ওঙ্কার, (তাহা) সকল বেদেতেই (আছে), সেই প্রণবরূপী আমাতে সকল বেদ প্রোত রহিয়াছে। সেই প্রকার শব্দই আকাশের সারভূত, সেই শব্দরূপী আমাতে আকাশ প্রোত রহিয়াছে। সেইরূপ পৌরুষ (শব্দের অর্থ) পুরুষের স্বভাব, যাহা দ্বারা লোকে এই ব্যক্তি পুরুষ এই প্রকার বুদ্ধি উৎপাদিত হয়, সেই পুরুষ স্বভাব পৌরুষরূপে অবস্থিত আমাতে পুরুষগণ প্রোত রহিয়াছে॥ ৮॥

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯॥

অন্বয়।—পৃথিব্যাং পুণ্যঃ গন্ধোঽস্মি বিভাবসৌচ তেজঃ (অস্মি) সর্ব্বভূতেষু জীবনং (অস্মি) তপস্বিষু চ তপঃ (অস্মি)॥ ৯॥

মূলানুবাদ।—পৃথিবীতে আমি পুণ্য গন্ধরূপে বিদ্যমান আছি, অগ্নিতে আমি তেজোরূপে রহিয়াছি, সকল প্রাণীতে আমি জীবনরূপে বিদ্যমান, তপস্বীগণের মধ্যে আমি তপঃ স্বরূপে বিদ্যমান আছি ॥ ৯ ॥

ভাষ্য।--পুণ্য ইতি পুণ্যঃ সুরভির্গন্ধঃ পৃথিব্যাং চাহং তস্মিন্ময়ি গন্ধরূপে পৃথিবী প্রোতা। পুণ্যত্বং গন্ধস্য পৃথিব্যাং স্বভাবতএব দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থং। অপুণ্যত্বঞ্চ গন্ধাদীনাং অবিদ্যাধর্মাপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষসংসর্গনিমিত্তং ভবতি। তেজোদীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসৌ অগ্নৌ, তথা জীবনং যেন জীবন্তি সর্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং। তপশ্চাস্মি তপস্বিষু তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুণ্য ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। পৃথিবীতে আমি 'পুণ্য' সুরভি গন্ধ (রূপে বিদ্যমান) আছি, অর্থাৎ গন্ধ স্বরূপ আমাতে এই পৃথিবী অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, পৃথিবীতে যে গন্ধ আছে তাহার পবিত্রতাই স্বাভাবিক-জলাদিতে ও রস প্রভৃতি গুণেরও এইপ্রকার স্বাভাবিক পুণ্যতা (পবিত্রতা) আছে ইহাও সূচিত হইতেছে। পার্থিব গন্ধ বা জলাদির গুণ রসাদিতে যে অপুণ্যত্ব, তাহা অবিদ্যা ও অধর্মের দ্বারা, অপবিত্র ভূতবিশেষের সংসর্গ নিবন্ধনই হইয়া থাকে। বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নিতে আমি 'দীপ্তি' তেজঃ স্বরূপে বিদ্যমান আছি, এবং সর্ব্বপ্রাণীনিচয়ে আমি জীবন স্বরূপে বিদ্যমান, যাহার দ্বারা প্রাণিগণ জীবন-ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকেই জীবন বলা যায়। আমিই তপস্বীগণের তপস্যা অর্থাৎ তপস্যারূপ আমাতেই তপস্বীগণ প্রোত রহিয়াছে ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি র্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।--হে পার্থ সনাতনং মাং সর্ব্বভূতানাং বীজং বিদ্ধি, (অহং) বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ অস্মি। (তথা) তেজস্বিনাং তেজঃ (চ) অস্মি ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—হে পার্থ আমাকে সর্ব্বভূতের আদিকারণ বলিয়া জানিও, আমি সনাতন, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং আমি তেজস্বীগণের তেজঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্য।—বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাং হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশক্তিঃ অন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেক-শক্তিমতাং অস্মি তেজঃ প্রাগল্ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—বীজং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হে পার্থ, আমি "সনাতন"

চিরন্তন, সকল ভূতের "বীজ" প্ররোহকারণ বলিয়াও আমাকেই জানিও। আমি বুদ্ধিমান্গণের (অর্থাৎ) বিবেকশক্তিযুক্ত জীবগণের বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিবেকশক্তি, এবং তেজস্বী (অর্থাৎ) প্রাগল্‌ভ্যশালি ব্যক্তিগণের আমিই "তেজঃ" প্রগল্‌ভতা॥ ১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভঃ॥ ১১॥

অন্বয়।—অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং (অস্মি), হে ভরতর্ষভ, ভূতেষু অহং ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি॥ ১১॥

মূলানুবাদ।—আমিই বলবানগণের কাম ও রাগ বর্জ্জিত বল, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, আমি প্রাণীগণের ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামরূপে বিদ্যমান আছি॥ ১১॥

ভাষ্য।—বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজোবলবতামহং তচ্চ বলং কামরাগবিবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু রাগোরঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদিধারণার্থং বলমস্মি নতু বত্‌সংসারিণাং তৃষ্ণা রাগকারণং। কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ধর্ম্মেন শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধোযঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামো যথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থঃ অশনপানাদিবিষয়ঃ কামোঽস্মি হে ভরতর্ষভ॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—বলং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—বল শব্দের অর্থ 'ওজঃ' সামর্থ্য, আমি বলবান্গণের (ওজঃ) হইয়া আছি, সেই বল (কিন্তু) কামরাগবিবর্জ্জিত। কাম ও রাগ (এই অর্থে দ্বন্দ্বসমাস করিলে) কামরাগ (এই পদটী নিষ্পন্ন হয়); অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সকলকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ তাহাকে কাম বলা যায়, সন্নিকৃষ্টে বিষয় সমূহে যে ভোগ বাসনা তাহাই রাগ (শব্দ প্রতিপাদ্য); সেইকাম ও রাগ বিবর্জ্জিত (বলরূপে আমি বলবান্গণের মধ্যে বিদ্যমান আছি এই প্রকার অন্বয়); ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাণিগণের দেহ ধারণের উপযোগী বলই আমার স্বরূপ কিন্তু তৃষ্ণা ও রাগ নিমিত্ত বল নহে। এবং ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থের সহিত অবিরুদ্ধ যে কাম সকল প্রাণিতে বিদ্যমান আছে ও যে কামের দ্বারা দেহ ধারণের জন্য অশন পানাদি হইয়া থাকে আমি সেই কাম (রূপে দেহীগণের মধ্যে) বিদ্যমান আছি, হে ভরতর্ষভ! (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ)॥ ১১॥

যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবারাজসাস্তামসাশ্চযে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২॥

অন্বয়।—যে সাত্ত্বিকা ভাবা যে রাজসা (ভাবাঃ) যেচ তামসাঃ (ভাবাঃ) তান্ (সর্ব্বান্) মত্তঃ এব (উৎপন্নান্) বিদ্ধি (জানীহি) অহং তেষু ন (বর্ত্তে), তে তু ময়ি (বর্ত্তন্তে)॥ ১২॥

মূলানুবাদ।—যে সকল পদার্থ সাত্ত্বিক রাজস বা তামস তাহা সকলই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা জানিও, ঐ সকল পদার্থ আমাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে আমি কিন্তু তাহাদের অপেক্ষায় থাকি না॥ ১২॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ, যেচৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্বৃত্তা ভাবাঃ পদার্থারাজসা রজোনির্বৃত্তাস্তামসাস্তমোনির্বৃত্তাশ্চ যেকেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে ভাবাঃ তান মত্ত এব জায়মানান্ বিদ্ধি সর্ব্বান সমস্তানেব। যদ্যপিতে মত্তোজায়ন্তে তথাপি ন তু অহং তেষু তদধীনস্তদ্বশঃ যথাসংসারিণস্তে পুনর্ময়ি মদ্বশাঃ মদধীনাঃ॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও (শুন) যে সকল "ভাব" পদার্থ "সাত্ত্বিক" সত্ত্বগুণ হইতে উৎপাদিত হয়, যাহারা "রাজস" রজোগুণ হইতে উৎপাদিত হয় এবং "তামস" তমোগুণ হইতে উৎপাদিত হয় অর্থাৎ প্রাণীগণের নিজ নিজ কর্ম্মবশে এ জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্যপি সেই সকল পদার্থ আমা হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি আমি তাহাদের অধীন নহি অর্থাৎ সংসারী জীবগণের ন্যায় আমি ঐ সকল বস্তুর বশীভূত নহি, কিন্তু তাহারাই আমাতে রহিয়াছে অর্থাৎ (প্রাণিকর্ম্মার্জ্জিত) সকল পদার্থই আমার বশীভূত, আমার অধীন রহিয়াছে॥ ১২॥

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥

অন্বয়।—এভিগুর্ণময়ৈঃ ত্রিভিঃ ভাবৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতং (সৎ) এভ্যঃ পরং মাং অব্যয়ং নাভিজানাতি॥ ১৩॥

মূলানুবাদ।—এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব (রাগ দ্বেষ ও মোহ) দ্বারা মোহিত এই সকল জগৎ এই ভাবত্রয় হইতে অতীত এবং অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না॥ ১৩॥

ভাষ্য।—এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং সংসারদোষবীজপ্রদাহকারণং মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্। তচ্চ কিংনিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। ত্রিভিঃ গুণময়ৈর্গুণ-বিকারৈ রাগদ্বেষমোহাদিপ্রকারৈঃ ভাবৈঃ পদার্থৈরেভিঃ যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগৎ মোহিতমবিবেকতামাপাদিতং সন্নাভিজানাতি মাং এভ্যঃ যথোক্ত গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চ অব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদি-সর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতম্ ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই আমার স্বরূপ বর্ণিত হইল, আমি সর্ব্বদা শুদ্ধ ও জ্ঞান স্বরূপ, আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা অথচ নির্গুণ, আমিই একমাত্র সংসার দোষ বীজের প্রদাহ হেতু অথচ হায়! জগৎ আমার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এইজন্য জগতের প্রতি ভগবান্ নিজ অনুক্রোশ প্রদর্শন করিতেছেন ও জগতের এই অজ্ঞান কেন হয় তাহা বলিতেছেন।—তিনটী "গুণময়" গুণবিকার (অর্থাৎ) রাগ দ্বেষ ও মোহাদি ত্রিপ্রকার ভাবের দ্বারা এই সকল প্রাণিনিচয় রূপ জগৎ মোহিত হইয়াছে। (অর্থাৎ) বিবেক শূন্যীকৃত হইয়াছে; এই প্রকার বিবেকশূন্য হইয়া আমাকে এই গুণ বিকার ত্রিবিধভাব হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছে না (এবং ইহাও বুঝিতেছে না যে) আমি "অব্যয়" ব্যয়রহিত অর্থাৎ জন্ম প্রভৃতি ছয় প্রকার ভাব বিকার আমাতে নাই॥ ১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪॥

অন্বয়।—এষা গুণময়ী দৈবী মম মায়া দুরত্যয়া যে মামেব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি॥ ১৪॥

মূলানুবাদ। এই দৈবী ও গুণময়ী আমার মায়া দুরতিক্রমণীয় যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই এই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে॥ ১৪॥

ভাষ্য।—কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তীত্যুচ্যতে—দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভূতা হি যস্মাৎ এষা যথোক্তা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া দুঃখেন অত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরত্যয়া। তত্রৈবং সতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে

তে মায়ামেতাং সর্ব্বভূতমোহিনীং তরন্তি অতিক্রামন্তি সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কি প্রকারে এই ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াকে অতিক্রমণ করিতে পারে তাহাই বলা হইতেছে—দৈবী দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণু স্বরূপ আমি, আমার আত্মভূতা মায়া (এই কারণে উহা) দৈবী; এই মায়ার স্বরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহা গুণময়ী,এই প্রকার আমার সেই মায়া "দুরত্যয়া," অনেক ক্লেশে যাহার অতিক্রমণ করা যায় তাহাকেই দুরত্যয় বলা যায়; এই প্রকার মায়ার স্বভাব হইলেও যে সকল জীব, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়ার আশ্রয়ও নিজের আত্মস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারাই এই সর্ব্বভূতবিমোহিনী মায়া হইতে উদ্ধার পায় অর্থাৎ তাহারাই সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করিতে পারে ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—মায়য়া অপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবং আশ্রিতা দুষ্কৃতিনোমূঢ়াঃ নরাধমা ন মাং প্রপদ্যন্তে ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—মায়ার প্রভাবে অপহৃতবোধ, আসুরভাববিশিষ্ট, দুরদৃষ্ট-শালী ও মূঢ় নরাধমগণ আমাকে আশ্রয় করে না ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য।—যদি ত্বাং প্রপন্না মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাত্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্তে ইত্যুচ্যতে ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণঃ মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমা নরাণাং মধ্যেঽধমানিকৃষ্টাস্তে চ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ সংমুষিতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবং হিংসানৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যদি তোমার আশ্রয় লইলেই সকলে মায়া হইতে উদ্ধার পায় তবে কেন সকল লোকই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে না? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তর হইতেছে যে (আমি) পরমেশ্বর, আমাকে "দুষ্কৃতী" পাপকারী মূঢ় "নরাধম" মনুষ্যগণের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ আশ্রয় করে না,তাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হয় এবং হিংসা মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতি অসুরজনোচিত স্বভাবকেই তাহারা পরিগ্রহ করে ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধাভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী (চ) (ইত্যেতে) চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! পীড়িত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ধনার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য।—যে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ চতুর্বিধাশ্চতুঃ প্রকারাঃ ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ হেঽর্জ্জুন আর্ত্তঃ আর্ত্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাভিভূতঃ আপন্নো জিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যোঽর্থার্থী ধনকামো জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ। হে ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহারা মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অতএব) পুণ্যকর্ম্মা (তাহারা কি করে তাহাই বলা হইতেছে), "চতুর্ব্বিধ" চারি প্রকার "সুকৃতী" পুণ্যকর্ম্মা জনসমূহ আমাকে "ভজনা করে" সেবা করিয়া থাকে। (কে কে সেবা করে?) "আর্ত্ত" আর্ত্তিযুক্ত (অর্থাৎ) তস্কর রোগ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দ্বারা নিপীড়িত, অর্থাৎ আপদ্‌গ্রস্ত। "জিজ্ঞাসু" (যে ব্যক্তি) ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করে (সে), যে ব্যক্তি "অর্থার্থী" ধনকাম (সে) এবং জ্ঞানী বিষ্ণুর তত্ত্ববিৎ, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মমপ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। তেষাং (চতুর্ণাং মধ্যে) নিত্যযুক্ত একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেই চারিজন মৎসেবকগণের মধ্যে নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি জ্ঞানীই প্রধান, জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য।—তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিৎ তত্ত্ববিত্ত্বাৎ নিত্যযুক্তঃ ভবতি একভক্তিশ্চ অন্যস্য ভজনীয়স্যাদর্শনাদতঃ স একভক্তি বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে অতিরিচ্যতে ইত্যর্থঃ। প্রিয়োহি যস্মাদহমাত্মাজ্ঞানিনোঽত স্তস্যাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধং লোকে আত্মা প্রিয়োভবতীতি। তস্মাজ্‌জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্য আত্মৈবেতি মম অত্যর্থং প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

৭৮০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

1827/1190.

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তের প্রতি ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শরীরত্যাগ না আত্মহত্যা?]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তিন চারিটী ব্রাহ্মভক্ত। অগ্রহায়ণ, শুক্লাচতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ সাল। পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশী লোকসমাগম হয়। যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাস্য হইয়া, তাঁহার দিকে মুখ করিয়া, কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন। তাঁহারা ঘরের পশ্চিমদিকের দ্বারমধ্য দিয়া, ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তার পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম-গায়ে পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর-মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয়, শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধসেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয়, এখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন—স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না।

বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন; আবার ভক্তির প্রেমের কাঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি, ভগবান্ চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ—হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে, নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল; শরীর-মধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি, ভগবান্ রামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ হরি-প্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরি-প্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

একটী ছোক্‌রা, নাম বিষ্ণু, এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন; আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ করেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হ'য়ে রয়েছে। এখানে আস্‌তো, স্কুলে পড়্‌তো, কিন্তু ব'ল্‌তো—সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল—সেখানে নির্জ্জনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ে সর্ব্বদা ব'সে ধ্যান কর্‌তো। ব'লেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কর্‌তো।

"বোধ হয় শেষ জন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল, একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হ'য়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। শুনেছি—একজন শব-সাধন ক'র্‌ছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা ক'র্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখিতে লাগ্‌লো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও ব'ল্লেন—'আমি তোমার

উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' সে ব্যক্তি মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে ব'ল্লে—'মা,একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হ'য়েছি। যে ব্যক্তি, এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধন ক'রছিল, তা'কে তোমার দয়া হ'লো না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'লো?' ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন,—'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা ক'র্‌ছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোট্‌পাট্ হ'য়েছিল, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?'

মুক্তপুরুষ ও শরীর ত্যাগ।

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে, ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে থাকে, আর তা হ'লে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীরত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটীর ছাঁচ রাখতেও পার, আবার ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পার।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটী ছোকরা আস্‌তো—উমের কুড়ি বছর হ'বে। যখন এখানে আস্‌তো, তখন এত ভাব হ'তো যে, হৃদেকে ধর্‌তে হ'তো—পাছে প'ড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা একদিন ব'ল্‌লে আর আমি আস্‌তে পার্‌বো না—তবে আমি চ'ল্লুম। কিছুদিন পরে শুন্‌লুম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[মুক্তির ব্যাঘাত—কামিনী কাঞ্চন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। "জীব চার থাক ব'লেছে—(১) বদ্ধজীব (২) মুমুক্ষুজীব, (৩) মুক্তজীব, (৪) নিত্যজীব।

"সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি যেন জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো

মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। ওদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা ক'র্‌ছে, তারা সকলেই পালাতে পারে না। দুই চারটা মাছ ধপাঙ শব্দ ক'রে পালায়। তখন লোকেরা বলে,—'ঐ মাছটা বড় পালিয়ে গেল!' এই দু'চারিটা লোক—মুক্তজীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার-জালে পড়েন না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এ বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। তারা, জালে পড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাইবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। যাতে এরা আছে, মনে করে—'আমরা হেথায় বেশ আছি।' বদ্ধ-জীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে—আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্কসাগরে মগ্ন হ'য়ে রয়েছে; কিন্তু মনে করে যে, বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না, তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর, ভগবান্ লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।

বদ্ধজীবের লক্ষণ।

"বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোনমতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট্ কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর্-দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, কোনমতে ছাড়্‌বে না। দেখ, সংসারী-লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী ম'রে গেল—কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'র্‌বে। ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই বাপ-মা সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়েছিল, সেই আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধ্‌লো, গয়না পর্‌লো, ভাল কাপড় পর্‌লো। এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো, আবার বছরে বছরে মেয়ে ছেলে হ'তে লাগ্‌লো। মোক-দ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্‌তে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও

পারে না, আবার উগ্‌রাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় ত বুঝ্‌ছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটী আর চামড়া। তবু ছাড়্‌তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

"কেশব সেনের খুড়ো—৫০ বছর বয়স—দেখি, তাস্ খেল্‌ছে যেন ঈশ্বরের নাম ক'র্‌বার সময় হয় নাই!

"বদ্ধজীবের আর একটী লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার, বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, তাহলে মরে যাবে।

[তীব্রবৈরাগ্য।]

বিজয়। মহাশয়! বদ্ধজীবের—সংসারীজীবের—মনের কি অবস্থা হলে মুক্তি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি ঈশ্বরের কৃপায় কারও তীব্রবৈরাগ্য হয়, তাহ'লে এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তবেই এই সংসার থেকে মুক্তি হ'তে পারে। (বিজয়ের প্রতি) তীব্রবৈরাগ্য কা'কে বলে? হচ্ছে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্রবৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্রবৈরাগ্য, সে ভগবান্ বৈ আর কিছু চায় না; সংসারকে পাতকুয়া দেখে; মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ্ দেখে, কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। 'বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তার পর ঈশ্বর চিন্তা ক'রবো,' একথা ভাবেই না, ভিতরে খুব রোক্।

"তীব্রবৈরাগ্য কাকে বলে, একটা গল্প শোনো। একদেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে। চাষারা সব, খানা কেটে দূর থেকে জল আন্‌ছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রলে, যতক্ষণ না জল আসে, যতক্ষণ না খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যা'বে। এদিকে স্নান করবার বেলা হ'লো। চাষার গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বল্লে—'বাবা! বেলা হ'য়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বল্লে 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' তার পর, বেলা দুই প্রহর ১টা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ কচ্ছে। স্নান করবার নামটী নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বল্লে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত

জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল করবে, কি খেয়ে দেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে, চাষা, কোদাল হাতে করে তাকে তাড়া কল্লে, আর বল্লে, তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই! চাষ বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলে পুলে কি খাবে? না খেয়ে যে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আন্‌বো, তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো।' তার স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা বরাবর সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিল। তখন একধারে বসে দেখ্‌তে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুল্‌কুল্‌ করে আস্‌ছে। তার মন তখন শান্ত ও আনন্দে পূর্ণ হ'লো। তখন বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বল্লে, 'নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।' তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস্ ভোঁস্ করে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লো! এই রোক্—তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা, সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বল্লে, 'অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই', তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না করে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে বল্লে,—'তুই যখন বল্‌ছিস্ তা চল্‌' (সকলের হাস্য)। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ'লো না। এটী মন্দ বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক্ না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[দাসত্ব ও 'কামিনী'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি এখানে আগে অত আসতে এখন আ'স না কেন?

বিজয়। এখানে আস্‌বার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সমাজের কাজ স্বীকার করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি বলছো, আমি স্বাধীন নই। কামিনীকাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার জন্য। তার পরের দাসত্ব ক'রতে হয়। স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মত কাজ করতে পার না।

"জয়পুরে গোবিন্‌জীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তারা তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল—'রাজাকে আস্‌তে বল।' তার পর রাজা আর পাঁচ-জনে, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাক্‌তে হলো না। নিজে নিজেই সব গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন্‌।' কাজে কাজেই আস্‌তে হয়; আজ ঘর তুল্‌তে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ ছেলের হাতে খড়ি, এই সব।

"'বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী, তার সাক্ষী উদম্‌ সাঁড়ী' এ গল্পতো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হলো। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, 'এরা সিদ্ধ হ'লো; লোক্‌কে যা বল্‌বে, তাই ফল্‌বে; যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয়; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।' এই ভেবে, বীরভদ্র তাদের ডেকে বল্লেন, —'তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে এস।' ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে সমাধি হ'লো। কখন্‌ জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে, হুঁস নাই। আবার ভাটা পড়েছে, তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝে ছিল—বীরভদ্র কি বল্‌বেন, গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, তাই তারা সবে পড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা কল্লে না। বাকী বারশো দেখা কর্‌লে। বীরভদ্র বল্লেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বল্লে, 'যে আজ্ঞা; কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চ'লে গেছে।' ঐ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাক্‌তে লাগ্‌লো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রাহল না; কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হ'য়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখ্‌ছো, পরের কর্ম্ম স্বীকার করে কি হ'য়ে রয়েছ! আর দেখ, অত পাশকরা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত, সাহেবের চাকরী স্বীকার করে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল "কামিনী"। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোল্‌বার যো নাই। তাই অত অপমান। অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

[ঈশ্বরলাভের পর কামিনীকাঞ্চন।]

"যদি একবার এইরূপ তীব্রবৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তা হলে আর মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না—ঘরে মেয়েমানুষের ভয় থাকে না। যদি একটা চুমুক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তাহলে লোহাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে নেবে। ঈশ্বর বড় চুমুক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুমুক পাথর। কামিনী কি করবে?

একজন ভক্ত। মহাশয়! মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে, ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে তোমাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[গুরু কে? অধিকারী নির্ণয়।]

বিজয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে হয়, তাই সদাসর্ব্বদা আস্‌তে পারি না; সুবিধা হলেই আস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ, আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, সে উপদেশ লোকে শুনবে না, সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে বা যে কোনরূপে হোক ঈশ্বরকে লাভ করতে হয়, তার পর আদেশ পেয়ে Lecture দিতে হয়। অমনি অমনি Lecture এ কি ফল হবে?

"ও দেশে একটী পুকুর আছে, নাম হালদার পুকুর। তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে করে রাখ্‌ত, পরদিন সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো, তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল করতো। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হতো না—আবার তার পর দিন সেই পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিস্‌ টাঙ্গিয়ে দিল যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ কর্‌তে পারবে না, যদি কর, তবে শাস্তি হবে।' কোম্পানির এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে করতো না।

"তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও Lecture দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্য্যের কর্ম্ম কর্‌তে পারে।

"একজন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা করেছিল। তখন বুঝ্‌তে হবে যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান্ লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ কর্‌তে পারে না।

বিজয়। মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যে Lecture উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দ গুরু ও মুক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে, জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

"আমি একদিন পঞ্চবটীর* কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, শুনে গেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকৃছে। বোধ হলো, সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকৃছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম, কি হয়েছে। দেখি যে, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়তেও পারছে না, গিলতেও পারছে না, ব্যাঙ্‌টার যন্ত্রণা ঘুচ্‌ছে না। তখন ভাবলাম, 'ওরে! যদি জাত সাপে ধর্‌তো, তাহ'লে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো; এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।'

"যদি সদ্‌গুরু হয় তাহলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসার-বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না। [ক্রমশঃ।]

---

* দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ীর ভিতরে পঞ্চবটী।

আশ্চর্য্য সমন্বয়।

(শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ,)

জগতের অধিকাংশ মানবই ভাবপ্রধান। জ্ঞান-প্রধান জীবের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভাবপ্রধান লোকেও অল্পাধিক বুদ্ধিমত্তা, আবার জ্ঞান-প্রধান মানবেও তেমন অল্পাধিক ভাবপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান ও ভাবের পূর্ণ বিকাশ যাহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহারা নরভূমে অমর বলিয়া পরিগণিত।

জ্ঞানপ্রধান জীব স্বতঃই আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী ও পুরুষকারবাদী। ভাব-প্রধান লোক আপনা হইতে স্বতন্ত্র দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কৃপাপ্রার্থী ও দৈববাদী। জ্ঞানী তর্ক বিচারে সত্যস্থাপনপ্রয়াসী। ভাবপ্রধান মানব জটিল তর্কপ্রচার পন্থাবলম্বনে কুণ্ঠিত, এমন কি ভীত। জ্ঞানপ্রধান মানব কুসংস্কার-শূন্য, নির্ভীক, ব্যবহারিক আচার বিচারে নিষ্ঠাহীন, প্রকৃতির সুনিয়ম রহস্য ভেদে ব্যগ্র; ভাবপ্রধান মানব অনেক স্থলেই কুসংস্কারাপন্ন ভয়শীল, নিষ্ঠাবান্, ও সৃষ্টিরহস্যপ্রকটনে উদাসীন। জ্ঞানী তর্কনিষ্ঠ সত্যে অবস্থিত—হিমাদ্রির মত অচল অটল; ভক্ত নিজ নিজ বিশ্বাসে অন্ধ—সেও আপনার ইষ্টে একান্ত অটল। জ্ঞানপ্রধান জীবের আত্মনিষ্ঠা ও আত্মাবস্থিতি বা স্ব স্ব রূপ দর্শনই সাধনার চরম ফল; ভাবপ্রধান লোক ইষ্ট বা ঈশ্বর ভাবে তন্ময়,—ভাববিভোর; চরম ফলাফলেও উদাসীন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে জ্ঞানীর কর্ম্ম-তৎপরতা; ভাবপ্রাবল্য ভক্তের কর্ম্মোদ্দীপক। ভক্ত পরদুঃখকাতর, সুতরাং দয়াপরবশ, জ্ঞানীও সকলকে আত্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া পরসাহায্যকারী, দয়াপরবশ না হইয়া সেবাপরবশ।

ভাবের স্থান হৃদয়, জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্ক। ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর দর্শন পায়েন; জ্ঞানী সহস্রারে পরাজ্যোতি দর্শন করেন। প্রকৃতির নিয়ম রহস্য ভেদ করিয়া জ্ঞানী সময়ে সময়ে যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, ভাবপ্রবণ ভক্ত তাহাতে নানা রঙ্ বেরঙ্ ফলাইয়া জগতে Occult Science এর প্রচার করেন। যেমন গণিত-জ্যোতিষ জ্ঞানীর আবিষ্কার; ফলিত-জ্যোতিষ, ভাবপ্রবণ লোকের গুহ্য শাস্ত্র। অথবা যেমন আত্মার ক্রমোন্নতি বিষয়ক যুক্তিসিদ্ধ পরলোকবাদ জ্ঞানীর আবিষ্কার; তাহারই উপরে ভূত-প্রেত-প্রসঙ্গ এবং যমলোক স্বর্গলোকাদির পৌরাণিকী বর্ণনা আবার ভাবপ্রবণ মানবের অদ্ভুত সংযোজনা। ভক্তের

চক্ষে সকলি অদ্ভুত—সে সকল দেখিয়াই অবাক্। জ্ঞানীর চক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না; সে স্থির, শান্ত, সমনস্ক। ভাবের গতিরোধে একজন অপারগ; অন্যজন আত্মসংযমী, সুতরাং কঠোরহৃদয় বলিয়া অনুমিত। ভক্ত সুখ দুঃখে অভিভূত; জ্ঞানীর সর্ব্বদা একভাব—এক টানা জোয়ারে তার সুখ দুঃখ ভেসে যায়। একজন চিরনীহারাবৃত হিমাচল, অন্যজন সময়ে নীহারাবৃত, সময়ে সাধারণ পাহাড়।

প্রকৃত জ্ঞানী ত্যাগী, জগদুপেক্ষাশীল, বাসনাবিলাসে প্রবল দোষদর্শী। ভক্ত প্রায়ই গৃহী, জগদস্তিত্বে একান্ত বিশ্বাসী এবং সাধারণতঃ ভোগশীল। ভক্ত নির্ব্বাণ চাহে না; কাযেই একটু ভোগবাসনা অলক্ষ্যে তাহাকে জড়াইয়া থাকে। জ্ঞানী চাহেন অনন্তে মিলন—পরম নির্ব্বাণ; তাহা একটু বাসনা থাকিতেও হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভক্ত নিরীহ; তথাপি সময়ে সময়ে সিংহবলী। জ্ঞানী উগ্র; কিন্তু সে উগ্রতায় মধুরতা আছে। ভক্তের নম্র দৃষ্টি মাটীর দিকে; জ্ঞানীর তীব্র দৃষ্টি উর্দ্ধে—আকাশগামিনী, সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী। জ্ঞানীর সাধনস্থল মহাশ্মশান, বিভূতি চিতাভস্ম; ভক্তের সাধন স্থল সম্মার্জ্জিত দেব মন্দির; বিভূতি চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য। একজন লয়দর্শী; অপরজন স্থিতিদর্শী। ভক্ত অম্বরীষ রাজার নিকটে মহাজ্ঞানী দুর্ব্বাসার লাঞ্ছনা ভক্তিভাবপ্রধানা পৌরাণিকী কল্পনামাত্র। জ্ঞানশাস্ত্র সকলের প্রতিই স্নেহদৃষ্টি করে; সেজন্য তাহাতে ভক্তাদির লাঞ্ছনাব্যঞ্জক অলীক উপাখ্যানাদি রচিত দৃষ্ট হয় না। ভক্ত নানা দল বা সম্প্রদায় গঠন করে; জ্ঞানীর কার্য্য হইতেছে সে সকল ভেঙ্গে দেওয়া। ভক্ত নামরূপে উন্মাদ; জ্ঞানী "নামরূপে বিহায়" ভূমা সমুদ্রে স্পন্দমান। গৌণজ্ঞান মায়ের অন্দর মহলে ঢুকিতে পায় না বটে; কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে তাহাই আবার মায়ের দেশকালনিমিত্তের মন্দির পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়। মুখ্যাভক্তি মায়ের অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও জন্মে জন্মে ত্রিবৃৎমায়ার চিরসঙ্গিনী কারণ, ভক্ত সে সঙ্গী হইতে জন্মে জন্মে সাধ রাখে।

উক্তরূপ গৌণভাবে উভয়ে উভয়ের বিরোধী হইয়াও মুখ্যারূপে উভয়েই আবার একফলপ্রসূ। সুতরাং, মুখ্যারূপে উভয়ই অনিন্দনীয়। বাদ বিসম্বাদ কেবল গৌণ ভক্ত ও গৌণ জ্ঞানীর মধ্যে। প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানী একই তত্ত্বে অবস্থিত। গৌণ উপায় লইয়া ভূত ও বানরের বিবাদ কখনও এ জগতে থামিবে না।

গুরুদেব বলেন বিচারে তত্ত্ব বুদ্ধিস্থ হইলে তাহার অনুভূতি হইবে ভাবাধার হৃদয়ে। সুতরাং সেই মুহূর্ত্তে মস্তিষ্ক ও হৃদয় যুগপৎ সমবলে প্রস্ফুটিত হয়; তখনই "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ", হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায় ইত্যাদি। গুরুদেব আরও বলেন, যখন প্রাচীন কালে এই জ্ঞান ও ভাব যুগপৎ ঋষি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব কবিত্বে পরিণত হইয়াছিল, তখনি বেদাদি রচিত হয়। কারণ বেদাদি পড়িলে মনে হয় যেন ভাব ও জ্ঞানের দুইটী সমান্তরাল সরল রেখা অবশেষে বেদভূমে একত্র সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে।

আজিও যেখানে জ্ঞান ও ভাব পূর্ণভাবে যুগপৎ প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়, সেখানে জগতের লোক অবনত হইয়া পড়ে। সেখানে শত সহস্র জ্ঞানী ও ভক্ত আত্মোৎসর্গ করে। অধুনাতন জগতে গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান ভক্তির এক আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। যে মহাসমন্বয়াচার্য্যের নাম আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সমভাবে পূজিত ও ঘোষিত হইতেছে। তিনিই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

কৃষিব্যাঙ্ক বা পল্লীভাণ্ডার।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।] [৪৫৬ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বোল্লিখিত 'পল্লীভাণ্ডার' সংস্থাপিত হইলে সমগ্র দেশের একটা মহা অভাব বিমোচিত হয়, এবং ইহার দ্বারা গ্রামের তাবৎ কৃষিজীবীগণ ও কামার, কুমার, ছুতার, ডোম, চামার, মুচী প্রভৃতি সকলে যেমন একদিকে স্বাধীনভাবে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে কাজ করিতে পারে, আবার সেই পল্লীভাণ্ডারের সাক্ষাৎ কার্য্যকারিতা নিবন্ধন সেই সকল শ্রমজীবীগণও স্বস্ব পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ ক্রেতার অনুসন্ধান করিবার হস্ত হইতে নিস্কৃতি পায়, সুতরাং সেই সময়টা পথে পথে না ঘুরিয়া স্বীয় কার্য্যে সংযুক্ত করিতে পারে। পল্লীভাণ্ডার যেমন একদিকে টাকা কড়ি ধার দিবে, অন্যদিকে গ্রামের উৎপন্ন সামগ্রীও খরিদ করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। ভাণ্ডার যদি নিজেই ঋণদাতা হয় এবং ঋণগৃহীতা ও অপর লোকের শ্রমজাত পণ্য দ্রব্যের ক্রেতা হয়, তাহা হইলে উভয়দিক হইতে লাভবান্ হইতে পারে—১ম,—ঋণের সুদ হিসাবে; ২য়,—সুলভে খরিদ,ও লাভে বিক্রয় করিয়া। স্থানীয় তাবৎ জিনিষ যদি ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে, তবে অল্পদিন মধ্যেই আবার স্থানান্তর হইতে

খরিদ্দার আসিয়া সেই সকল দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া যাইবে—তখন আর সেই সকল সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে পাঠাইবার আবশ্যক হইবে না। স্থানীয় অবং উৎপন্ন দ্রব্য—ক্ষেত্রজাত ফসল হউক বা শ্রমজাত পণ্য দ্রব্য হউক,—ভাণ্ডার যদি ক্রমান্বয়ে খরিদ ও বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে স্থানীয় লোকেরাও অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে কার্য্য করিতে তৎপর হইবে। জিনিষ উৎপন্ন করিবার জন্য যখন অর্থের অভাব নাই এবং বিক্রয় করিবার জন্যও কোন ক্লেশ নাই, তখন কেন না তাহারা অধিকতর পরিশ্রম করিবে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল জিনিষ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে? শিক্ষিত ব্যক্তিরা খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, কিন্তু অশিক্ষিত শ্রমজীবীগণকে অর্থ খাটাইয়া ভরণপোষণ দেয়। শেষোক্তদিগের অর্থ পাইলেই উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কাজে প্রবৃত্তি জন্মে।

ইতিপুর্ব্বে যে কয়েকটী কথার আলোচনা করা গেল, তদ্দ্বারা পল্লীভাণ্ডার সংস্থাপনের উপকারিতা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় এবং তাহার অভাবও বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। পল্লীভাণ্ডার সংস্থাপন করা যে এক বিষম বা গুরুতর ব্যাপার তাহা আমরা মনে করি না। যাঁহার কিছুমাত্র বিষয়বুদ্ধি আছে, তিনিই এ কার্য্য সুচারুরূপে চালাইয়া নিজের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন। দুই এক শত টাকা যাঁহার মূলধন আছে অথবা যিনি দুই চারি শত টাকা কর্জ্জ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে পল্লীভাণ্ডার কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করা অতি সহজ। সঞ্চিত বা সংগৃহীত টাকা ঘরে আবদ্ধ না রাখিয়া শ্রমজীবী ও কৃষকদিগকে কর্জ্জ দেওয়া এবং যথা সময়ে উহার সুদ আদায় করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। সুদের সুদ জমিতে দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, কারণ শ্রমজীবী হউক বা কৃষিজীবী হউক বা অন্য ভদ্রলোকই হউক সুদের সুদ দিতে কেবল যে কাতর হয় তাহা নহে,—অনেক সময়ে দিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং সেজন্য পীড়াপীড়ি করিলে অবশেষে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য মহাজনের টাকা ইহাতে আদায় হইতে পারে, কিন্তু ঋণগ্রহীতার যে অনিষ্ট হয়, তাহাতে সে ব্যক্তি আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপে যদি সকল মক্কেলই নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মহাজন কাহাকে লইয়া কারবার করিবে? একদিকে যেমন মক্কেলদিগকে বজায় রাখা মহাজনের কর্ত্তব্য, অন্যদিকে মহাজনকে বজায় রাখা মক্কেল—ব্যাপারীদিগেরও বিশেষ কর্ত্তব্য। উভয়ের স্বার্থ এক সূত্রে গ্রথিত—একের মঙ্গলে অপরের

মঙ্গল,—এ কথা উভয় পক্ষেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

যাহাকেই টাকা কর্জ্জ দেওয়া যা'ক, অথবা শস্য দাদন দেওয়া যাউক,—দাতা ও গৃহীতার মধ্যে একটা পাকা লেখা পড়া হওয়া আবশ্যক। সংসারে সর্ব্বদা সাবধানে চলা ভাল,—কাহার মনে কি আছে কে জানে। টাকা বা শস্য কর্জ্জ দিয়া—লেখা পড়া করা থাকিলেও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। লেখা পড়া আছে বলিয়া এরূপ মনে করা ভুল যে, সে ব্যক্তি তোমার ঘরে আসিয়া টাকা পৌছাইয়া দিবে। নালিশ পত্র করিয়া টাকা আদায় উশুল করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে নালিশ পত্র করিতে না হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে মহাজন ও মক্কেল উভয়েরই সমূহ ক্ষতি। প্রথমতঃ মক্কেল ত মহাজনের অপ্রিয়ভাজন ও অবিশ্বাসের পাত্র হয়, এবং ভবিষ্যতে মহাজনের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ আদালত করিতে কতকগুলা টাকা অপব্যয় হয়। মহাজনের পক্ষে সে পথ পরিত্যাগের চেষ্টা করা যে কেন উচিত তাহাও আমরা বলিব। আদালত অভিযোগে লোকে ভয় পায়,—তারপর ইহাতে সমূহ সময় নষ্ট হয় অধিকন্তু শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল কারণে নালিশ প্রভৃতির সঙ্কল্প একবারে পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সহজে ঋণ আদায় হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য—তবে যে স্থলে অনিবার্য্য তাহার কথা স্বতন্ত্র।

গ্রাম বা পল্লীস্থ দুই চারিজন ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। একজনের অর্থ ও চেষ্টা অপেক্ষা পাঁচজনের টাকা ও যত্নে যে অধিকতর পরিমাণে কার্য্য হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। একজন যদি টাকা সরবাহের চেষ্টা করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি উহাকে খাটাইবার পন্থা ও সুযোগ অন্বেষণে রত থাকেন,—তৃতীয় ব্যক্তি জিনিষ পত্র বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে টাকা আমদানীর যেমন সুবিধা হয়, টাকা যথা নিয়মে খাটাইবারও তেমনি সুবিধা হয়; কিন্তু একই ব্যক্তিকে তাবৎ কার্য্য পরিদর্শন করিতে হইলে, অনেক সময়ে টাকার অনাটন ঘটিতে পারে, আবার কোন সময়ে টাকা আদায়ের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে পারে অথবা সংগৃহীত পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার পক্ষেও ব্যাঘাত হইতে পারে। সমধিক টাকার কারবার হইলে ত নানা অসুবিধা হইবারই

কথা,—অল্প টাকার কারবার হইলে ততোধিক অসুবিধা হয়, তাহা ব্যতীত অল্প টাকার কারবারে ঝঞ্ঝাট যথেষ্ট থাকে কিন্তু কার্য্যের পরিসরের অল্পতাবশতঃ যে অল্প পরিমাণ লাভ হয়, তাহাতে তাহার নিজ অভাব পূরণ হইয়া উঠে না।

পাঁচজনে মিলিত হইয়া কারবার হউক অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের হউক, ভাণ্ডারে টাকার সচ্ছলতা রাখিবার জন্য তহবিলে সর্ব্বদা টাকা মজুত থাকা আবশ্যক। নিজ নিজ তহবিলে টাকা না থাকিলে সন্নিকটে ও সহজে যাহাতে আবশ্যক মত টাকা যোগাড় করিতে পারা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য, নতুবা কার্য্য কালে টাকার অনাটন হইলে সমূহ ক্ষতি হইবে। গ্রামে কি, সহরে কি, অনেক লোকেরই অল্পাধিক টাকা আছে, কিন্তু সুবিধামত তাহারা উহাকে খাটাইতে পারে না। সন্নিকটে কোন সম্ভ্রান্ত বা বিশ্বাসী লোক টাকা লেন দেনের কারবার করিতেছেন বলিয়া তাহারা যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে সেই আবদ্ধ টাকাকে খাটাইবার জন্য অল্প সুদে কর্জ্জ দিতে পারে—অনেক স্ত্রীলোকও ইহাতে নির্ভয়ে টাকা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে গ্রাম বা পল্লীস্থিত তাবৎ লোকের টাকা সুদে খাটিলে, পল্লীভাণ্ডার দ্বারা আরো একটা যে মহান্ উপকার সাধিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য। পল্লীভাণ্ডারের অন্যতম অঙ্গ—

আড়দারী প্রথা। ইহার দ্বারা পল্লীর ও সন্নিকটস্থিত তাবৎ গ্রামের লোকের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আড়দারী করিতে হইলে সমধিক টাকার প্রয়োজন। আড়দারী কাজে সর্ব্বদা টাকা কিছু মজুত রাখা বিশেষ আবশ্যক। স্থানীয় বা দূরবর্ত্তী গ্রামের ব্যাপারীগণকে পূর্ব্বেই কিছু কিছু টাকা দাদন দিয়া রাখিতে হয় এবং ব্যাপারীগণ যখন নিজ নিজ বিক্রয়ের দ্রব্য আনিয়া আড়তে উপস্থিত করিবে, তখন তাহাদিগকে কতক মুদ্রা দেওয়া আবশ্যক এবং অবশিষ্ট কিছু দিন পরে দিলে চলিবে—ইতিমধ্যে বাজারের অবস্থা বুঝিয়া যত শীঘ্র হয়, সেই সকল জিনিষ বিক্রয় করিয়া টাকাটা হস্তগত করিয়া রাখাও উচিত। ব্যাপারী বা চাষিগণকে অগ্রে টাকা কিছু দাদন দিয়া রাখিলে সুবিধা এই যে, তাহারা নিজ নিজ পণ্য দ্রব্য আর অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় না করিয়া মহাজনের অর্থাৎ দাদন-দাতার নিকটেই আনিয়া উপস্থিত করিবে এবং বাজার দর অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিবে। ব্যাপারীগণ যে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করে তাহার কারণ এই যে, তাহারা মহাজনের নিকট হইতে টাকা অগ্রিম পাওয়ায় জিনিষ উৎপন্ন করিবার সুবিধা পায়, অপরন্তু জিনিষটা আনিবা

মাত্রই সমুদায় না হইলেও,—অধিকাংশ টাকাটা চুকাইয়া পায়, এবং জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পায়। তাহা ব্যতীত নগদ টাকার একটা বিশেষ মূল্য আছে। আজ যাহার নিকট একশত টাকার জিনিষ বিক্রয় করা গেল, তাহার নিকট হইতে যদি সেই টাকা আদায় করিতে ছয়মাস বা এক বৎসর সময় লাগে, তাহা হইলে ক্রেতার লাভ আছে কিন্তু ইহাতে বিক্রেতার বিশেষ ক্ষতি। বিক্রেতা যদি সেই জিনিষ নগদ মূল্যে একশত টাকার স্থানে নব্বই টাকায় বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাহার লাভ, কেন না সেই দীর্ঘকাল, ছয়মাস হউক, বা এক বৎসর হউক—টাকাটা বৃথা আবদ্ধ থাকিয়া দশ টাকা মাত্র অধিক দিত, কিন্তু উপস্থিত নব্বই টাকাটা হস্তগত হইলে অভাব পক্ষে বারো মাসে বারো বার ঘুরিলে অন্ততঃ পঁচিশ টাকা লাভ স্বরূপ আদায় দিবে ইহা নিশ্চয়। তবে কথা হইতেছে যে, টাকা না বসিয়া থাকে। টাকা ঘুরিতে গেলে কিছু লাভ না লইয়া ঘরে ফিরে না। টাকাকে যখন খাটাইতে হইবে, তখন দেখিতে হইবে যে, উহা অসৎ পাত্রে বা বেকার কাজে না যায়। ব্যবসা করিবার সময়—

দুইটী প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—১ম কিসে দুই পয়সার সাশ্রয় হয় বা দুই পয়সা কম খরচ হয়;—২য়,—কিসে টাকাটা শীঘ্র শীঘ্র এবং বারম্বার ঘুরিতে পারে। যাহাকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায়, তাহাদিগের সমষ্টিই বৃহদায়তনের পুষ্টদণ্ড। এইজন্য সাশ্রয় ও লভ্য সামান্য হইলেও তাহা কোনমতে উপেক্ষা করা উচিত নহে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"Take care of the decimals and the dividends will look to themselves." অবিবেচনার সহিত অনর্থক কতকগুলা ব্যয় করিয়া ফেলিলে, শেষে মূলধনে আঘাত লাগে, এবং অল্প পুঁজির মূলধনে সামান্য আঘাত লাগিলেই তাহাকে আর উঠিয়া পথ্য করিতে হয় না। লেখকের কোন বিশেষ বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক কয়লার কারবার করেন। মূলধন হাজার টাকা। রাণিগঞ্জ অঞ্চল হইতে যথা নিয়মে কয়লা আমদানী হইতে লাগিল। এই দুই হাজারী ব্যবসায়ের জন্য ৪।৫টী মোহরী নিযুক্ত হইল, পিয়ন নিযুক্ত হইল, বন্ধুবরের নিজের জন্য প্রতিদিন কলিকাতার সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী নিযুক্ত রহিল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে দর্শন দিতেন, আমি কিন্তু তাঁহার চাল-চলনটা বড় ভাল বুঝিলাম না এবং সে কথা তাঁহাকে ব্যক্ত করাতে তিনি কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন এবং সেই অবধি আর আমার নিকট আনা বন্ধ করিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে একদিন সাক্ষাৎ হইলে বিষয় কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন তৎসমুদায় লোকসান হইয়া গিয়াছে—পরন্তু কিছু ঋণও হইয়াছে। অর্থ খরচ বিষয়ে ঐরূপ অবিবেচনা করিলে পরিণামে অন্যরূপ ফল আশা করা বৃথা। [ক্রমশঃ।]

যে, বন্যশূকর প্রতিদিন শীকার করা ও খাওয়া হয় আবার পরদিন পুনরায় বাঁচিয়া উঠে।

দর্শন বলেন, এমন এক আনন্দ আছে, যাহা নিরপেক্ষ, যাহার পরিণাম নাই, সুতরাং আমাদের ঐহিক সুখভোগ, আমরা যাহা করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আবার বেদান্তই কেবল প্রমাণ করেন যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ, সেই ব্রহ্মানন্দেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানি না। যেখানেই দেখিবে, কোনরূপ আনন্দ, এমন কি, চোরের চৌর্য্য-কার্য্যেও যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ, কেবল উহা বাহ্যবস্তু কতকগুলির সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহা বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদয় সুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে—ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। প্রথমে অজ্ঞান মিথ্যা সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সমুদয়ই—সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। তখন সমুদয়ই—উন্নতভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সমুদয় পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সেইগুলি ত্যাগ করিতে হইবে; পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিণতরূপে। অতএব আমাদিগকে সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিতে হইবে। এগুলি সেই প্রকৃত বস্তুর, তাহাকে সুখই বল আর দুঃখই বল, বিভিন্ন ক্রমমাত্র। "বেদ সকল যাঁহাকে ঘোষণা করেন, সকলপ্রকার তপস্যা যাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে তোমায় বলিব, তিনি ওঁ।" বেদে এই ওঙ্কারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ব্যাখ্যাত আছে।

এক্ষণে যম নচিকেতার প্রশ্ন—মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়, তাহার উত্তর দিতেছেন। "জ্ঞানবান্ আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মানও না, কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না। হন্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হনন

করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভয়েই সত্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মা কাহাকেও হননও করেন না অথবা স্বয়ংও হত হন না।" ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 'জ্ঞানবান্' শব্দটার উপর বিশেষ লক্ষ্য কর। ক্রমশঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়ত বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রভেদ। মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুর পার্থক্য, প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। প্রত্যেকের পশ্চাতে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত, নিত্যানন্দময়, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই সেই আত্মা—তিনি পুণ্যবানে পাপাতে, সুখী দুঃখীতে, সুন্দর কুৎসিতে, মনুষ্য পশুতে, সর্বত্র একরূপ। তিনিই জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার প্রকাশের তারতম্যেই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি অধিক প্রকাশিত, কাহারও ভিতর বা অল্প, কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থই নাই। কাহারও পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের শরীরের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে বলিয়া শরীরের কোন ভেদ হইল না। কেবল পোষাকেই—যাহা শরীরের অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবৃত রাখিতেছে—তাহাতেই ভেদ দেখা যাইতেছে। আবরণ, অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্যানুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এই খানেই বুঝিয়া রাখা ভাল যে, বেদান্তদর্শনে ভালমন্দ বলিয়া দুইটী পৃথক্ বস্তু নাই। সেই এক জিনিষই ভাল মন্দ দুই হইতেছে, আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত; এবং বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে জিনিষকে আমি সুখকর বলিতেছি, কাল আবার একটু পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া ঘৃণা করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তুটার বিভিন্ন মাত্রার জন্যই ভেদ উপলব্ধি হয়, সেই জিনিষটাতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভালমন্দ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যে উত্তাপ আমার শীতনিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ হইল? অতএব যদি আত্মা শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে ব্যক্তি অসৎকার্য্য করিতে যায়, সে আপনার স্বরূপের বিপরীতাচরণ করিতেছে—সে আপনার স্বরূপ জানে না। ঘাতকব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে মাত্র,

উঁহার জ্যোতি প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কখন তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না। "অণুর অণু, বৃহতেরও বৃহৎ সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গুহাপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলশোকশূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে অবস্থিতের ন্যায়,—অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা আর দুঃখ করেন না। এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না।"

'এই যে বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না,' একথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কর্ম্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋষিরা চিন্তা জগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতে থামিবার পাত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীশ্চিয়ানরা বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। খ্রীশ্চিয়ানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মনুষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া তাহা লিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা—জগতে সমুদয় পদার্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ বেদে উহা আছে। বেদের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন সৃষ্ট মানব অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেক শব্দই পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্ত্তার সমুদয় মনের ভাবই যেন এই গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এ কার্য্য নীতিসঙ্গত কেন? না, বেদ বলিতেছেন। এ কার্য্য অন্যায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতাদৃশী শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই ঋষিগণের সত্যানুসন্ধানে কি সাহস, দেখ। তাঁহারা বলিলেন, না, বারম্বার বেদপাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, এত পক্ষপাতিতা হইল। এই জন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে। 'যাহারা অসৎকর্ম্মকারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা কখন ইহাঁকে লাভ করিতে পারে না।' কেবল যাহাদের হৃদয় পবিত্র, যাহাদের কার্য্য পবিত্র, যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, তাহাদিগের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

আত্মা সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে

রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে রথের রশ্মি দৃঢ় থাকে ও সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই সেই বিষ্ণুর পরম পদে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, সেই রথ অবশেষে বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়। সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাঁহার আদি অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাঁহাকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন—এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে গমন কর। "উঠ, জাগো, এবং যে পর্যন্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পহুঁছিতে পার, সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।"

এক্ষণে দেখিতেছ, সমুদয় উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই অপরোক্ষানুভূতি। এতৎ সম্বন্ধে মনে সময়ে সময়ে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিবে আরো নানা সন্দেহ আসিবে, কিন্তু এ সকলগুলিতেই আমরা দেখিব, আমরা আমাদের পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্ব্ব সংস্কারের অতিশয় প্রভাব। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিগতত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য অতি কর্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা উহা শ্রবণ করি আর দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার চিন্তা করি, তবে উহারা আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর ঐ সকল কথা শুনিয়া ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা—কার্যকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজনবাদীদের মতে সুখের অন্বেষণ করা অনেকের পক্ষে কর্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের সুখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় সুখ অন্বেষণ করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিষয়সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর সুখী কেবল আহার পানে। কোন বৈজ্ঞানিক সব বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কতিপয় তারার অবস্থান জানিবার জন্য

হয়ত কোন পর্ব্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন। তিনি যে অপূর্ব্বসুখের আস্বাদলাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে পারে। হয়ত বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্য্যন্ত করিবারও সঙ্গতি নাই। তিনি হয়ত কয়েক টুকরা রুটি ও একটু জল খাইয়াই পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিবেন, 'ভাই কুকুর, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয় আবদ্ধ; তুমি ঐ সুখ ভোগ করিতেছ। তুমি উহা হইতে উচ্চতর কিছুই জান না। কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। আর যদি তোমার নিজের ভাবে সুখ অন্বেষণের অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।' এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমুদয় জগৎকে আপনভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমুদয় জগতের মাপকাটি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার সুখও যে তাহাতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখনই তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক হিতবাদীর সহিত ধর্ম্মবাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক হিতবাদী বলেন, দেখ আমি কেমন সুখী। আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু ও সকল তত্ত্ব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। উহারা অনুসন্ধানের অতীত। ওগুলির অন্বেষণে না যাইয়া আমি বেশ সুখে আছি। বেশ, ভাল কথা। হিতবাদিগণ, তোমরা যাহাতে সুখে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট না করিয়া সুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করুন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দেয় আর বলে, যদি এরূপ না কর, তবে তুমি মূর্খ, আমি বলি, তুমি ভ্রান্ত, কারণ, তোমার পক্ষে যাহা সুখকর, তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। যদি আমাকে কয়েকখণ্ড সুবর্ণের জন্য ধাবিত হইতে হয়, তবে আমার জীবনধারণ করা বৃথা হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এইমাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, যাহাদের এই নিম্নতর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধর্ম্মাচরণ সম্ভব। আমাদিগকে ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হইবে, যতদূর আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া লইতে হইবে। যখন আমাদের ইহসংসারের দৌড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের চক্ষের সমক্ষে পরলোক প্রতিভাত হইতে থাকে।

এ বিষয়ে আর একটী মহৎ প্রশ্ন আমার মনে উঠিতেছে। ইহা শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কখন কখন আর একরূপ ধারণ করিয়া উদয় হয়—তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, কিন্তু তাহা বড় আপাতরমণীয়। এ কথা তুমি সকল সময়েই শুনিতে পাইবে। অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। উহা এই যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে আর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন তেমনিই থাকিবে। অবশ্য এ কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু এ কথা না বলিয়া ত আর পথ দেখিতেছি না। ইহা বাতরোগের মত। মস্তক হইতে তাড়াইয়া দাও, উহা পায়ে যাইবে। ঐ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলে অন্য স্থানে যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন, উহা কোন মতে যাইবে না। দুঃখও এইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত। বর্ত্তমানকালে পরস্পর পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা বড় বেশী উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, তাহাও ত আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধিমাত্র। যদি আমার কোন বিষয় অতি সুস্পষ্টরূপে বোধ হয়, তাহা এই যে, বাসনাতে কেবল দুঃখই আনয়ন করে—উহা ত যাচকের অবস্থামাত্র। সর্ব্বদাই কিছুর জন্য যাচ্ঞা—কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই—চাই—সব জিনিষ চাই। সমুদয় জীবনটী কেবল তৃষ্ণাগ্রস্ত যাচকের অবস্থা—বাসনার দুরপনেয় তৃষ্ণা। যদি বাসনাপূরণ করিবার শক্তি যোগখড়ির নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হয়, তবে বাসনার শক্তি গুণখড়ির নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অন্ততঃ জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি একটী তরঙ্গ কোথাও উত্থিত হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটী গর্ত্ত উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের সুখ উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চই অপর কোন মানুষের অথবা কোন পশুর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—পশুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা তাহা-

দের সমুদয় খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করিয়া বলিব, সুখ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি বড় সুখী হইবে? না, তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে। কিরূপে সুখের যুগ আসিবে, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। এত প্রত্যক্ষের বিষয়। আনুমানিক বিচার দ্বারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কখন হইবার নয়।

পূর্ণতা সর্ব্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্ত স্বরূপ—সেই অনন্ত স্বরূপ ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তুমি, আমি সকলেই সেই অনন্ত স্বরূপ ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা। কিন্তু ইহা হইতে কতকগুলি জর্ম্মান্ দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ ব্যক্ত হই, যতদিন না আমরা সকলে পূর্ণ পুরুষ হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত,আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা—অতএব ইহার এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীম সসীম হইব—একথা ত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এমতে সন্তুষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তাহাদিগকে সখের ধর্ম্ম দিবার জন্য, ইহা বেশ উপযোগী বটে; কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জ্জরিত করা হয়—ধর্ম্মের পক্ষে ইহা মহাহানিকর। আমাদের জানা উচিত জগৎ এবং মানব—ঈশ্বরের অবনত ভাব মাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে—আদম প্রথমে পূর্ণ মানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্ম্মই নাই, যাহাতে বলে না যে, মানব পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা হীন হইয়া হইয়া পশু হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখন অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু দেখিব, ইহা অসম্ভব। তখন এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। তখন আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক্ হইতে ফিরিয়া পশ্চাদ্দিকে যাত্রা আরম্ভ হইবে।

ইহার নাম ত্যাগ। তখন আমরা যে জালের ভিতর পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তখনই নীতি এবং দয়াধর্ম্ম আরম্ভ

হইবে। সমুদয় নৈতিক অনুশাসনের মূলমন্ত্র কি? 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'। আমাদের পশ্চাদ্দেশে যে অনন্ত রহিয়াছেন, তিনি আপনাকে বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই 'অহং'এর আকার ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ক্ষুদ্র আমি তুমির উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় এই ফলের উৎপত্তি,—এক্ষণে এই 'আমি'কে আবার পেছু হটিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, তিনি এতদিন বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে চক্রে ফেলিয়াছেন,—তাঁহাকে ঐ চক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বল, 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু', ততবারই তুমি ফিরিবার চেষ্টা করিতেছ, আর যতবার তুমি অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—'অহং, অহং, ন ত্বং।' ইহা হইতে জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। 'আমি' মরিয়া যাইবে। 'আমার' জীবনের জন্য তখন কে যত্ন করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে সমস্ত বৃথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাসনা—সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সুখে থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

যদি আমরা পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে উহা সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয়? তোমরা জান, ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল ইহাই যে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু ইহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মিয়াছে—উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর নহে? দুই দিকেই সমান যুক্তি—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্ত্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিরূপে সত্য হইবে? যাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা গেল।

অবশ্য অনন্ত জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমরা ক্রমাগত

অথবা অযোগবাহবর্ণ সমূহ, 'অট্' কিম্বা 'শর্' কোনও প্রত্যাহার বিশেষে পাঠ না করিয়া, অবিশেষরূপে উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

তাহা করিবার প্রয়োজন কি ?

অযোগবাহ বর্ণ সমূহের স্থান বিশেষে পাঠ না করিয়া, সর্ব্বত্র পাঠ করিলে, এই ফল হইবে যে, সংযোগ, উপধা সংজ্ঞা, অলোহস্ত্যা বিধি, দ্বির্বচন, স্থানিবদ্ভাব-প্রতিষেধ ইত্যাদি স্থলেও অযোগবাহ বর্ণ প্রযুক্ত, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

অযোগবাহবর্ণ সমূহ, স্থান বিশেষে বিশেষরূপে না পাঠ করিবার সংযোগ সংজ্ঞা প্রয়োজন, —যাহাতে 'উঽজ্জক," এই স্থলে, 'উ'কার প্লুতস্বর বিশিষ্ট হয়। হলোহনন্তরাঃ সংযোগঃ ।১।১।৭। (অচ অর্থাৎ স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এমন যে হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণ, তাহার সংযোগ সংজ্ঞা হয়।) এই সূত্রানুসারে, "উজ্জক"র মধ্যবর্ত্তী উপধ্মানীয় বর্ণ, 'জ'কারের সহিত মিলিত হইয়া, সংযোগ সংজ্ঞা হইল। যেহেতু উপধ্মানীয় বর্ণ, যদি কোনও স্থান বিশেষে বিশেষ করিয়া পাঠ করা না যায়, তবে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, হল্ সংজ্ঞাতে পাঠ করা যাইবে ; সুতরাং উপধ্মানীয়ের হল্ ও 'জ'কারের 'হল্,' উভয়ে মিলিয়া সংযোগ সংজ্ঞা হইবে। সংযোগে গুরু ।১।৪।১১। (সংযোগ পরে থাকিলে, হ্রস্ব স্বরও গুরু স্বর বিশিষ্ট হয়) এই সূত্রানুসারে, সংযোগ বর্ণ 'জ' কার পরে আছে বলিয়া 'উজ্জক' এর 'উ'কার গুরু সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইল। গুরোরনৃতোহনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্ ।৮।২।৮৬। (অর্থ পূর্ব্বে উক্ত) এই সূত্রানুসারে, সংযোগের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরু স্বর বিশিষ্ট 'উ'কার, প্লুত সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইবে। অতএব উপধ্মানীয় বর্ণ সর্ব্বত্র পাঠ প্রযুক্ত, এই স্থলে 'উ'কার প্লুত উচ্চারণ হইবে। নতুবা, এই স্থলে প্লুত স্বর সিদ্ধ হইত না।

ভাষ্যমূল।—উপধা সংজ্ঞাচ প্রয়োজনম্। তুক্কৃতম্। নিষ্কৃতম্। তুষ্পীতম্। নিষ্পীতম্। ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্যেতি ষত্বং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষরূপে পাঠ করিবার উপধা সংজ্ঞার জন্যও প্রয়োজন। তাহা হইলে, তুষ্কৃতম্, নিষ্কৃতম্, তুষ্পীতম্, নিষ্পীতম্ ইত্যাদি স্থলে, "ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য ৮।৩।৪১। (ইকার এবং উকার, উপধাতে আছে এমন যে প্রত্যয়ের বিসর্গ ভিন্ন অন্য বিসর্গ, তাহার স্থানে 'ষ' হয়, ক বর্গ এবং প বর্গ পরে থাকিলে,) এই সূত্রানুসারে, ষত্ব সিদ্ধি হইবে। যদি বিসর্গ, অল্ সংজ্ঞা মধ্যে পাঠ না হইত ; তবে "অলোহন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা ।১।১।৬৫। (অন্ত্য অল্ এর অর্থাৎ অন্ত্য বর্ণের যে পূর্ব্ববর্ণ, তাহার উপধা সংজ্ঞা হয়,) এই

সূত্রানুসারে, (বিসর্গের অল্ সংজ্ঞাভাব প্রযুক্ত, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইকার উকারের উপধা সংজ্ঞা না হওয়াতে,) ষত্বও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং দুষ্কৃতম্ নিষ্পীতম্, ইত্যাদি সুসঙ্গত প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। ন ইদুদুপধগ্রহণেন বিসর্জ্জনীয়ো বিশেষ্যতে। কিংতর্হি। সকারো বিশেষ্যতে। ইদুদুপধস্য সকারস্য যো বিসর্জ্জনীয় ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অযোগবাহ বর্ণান্তর্গত বিসর্গের, সর্ব্বত্র পাঠে, ইহা কখনও প্রয়োজন হইতে পারে না। কেন না, "ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য," এই সূত্রে, 'বিসর্গের স্থানে ষ হয়', এইরূপে বিশেষণ করিব না।

তবে কি? অর্থাৎ বিসর্গকে বিশেষ্য না করিয়া কি করিবে?

সকারকে বিশেষ্য করা যাইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, ই কার বা উকার উপধাতে আছে যাহার, এমন যে স কার, তাহার স্থানে বিসর্গ, তাহার স্থানে ষ কার হয়। এরূপ করিলে, দুষ্কৃতম, দুষ্পীতম্, ইত্যাদি স্থলে, ষত্ব সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবোপধা গ্রহণং ন করিষ্যতে। ইদুদ্ভ্যাং তু পরং বিসর্জ্জনীয়ং বিশেষয়িষ্যামঃ। ইদুদ্ভ্যামুত্তরস্য বিসর্জ্জনীয়স্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা "ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য" সূত্রে, উপধা শব্দের গ্রহণই করিব না। কিন্তু 'ই কার বা উকার হইতে পরে আছে যে বিসর্গ,' এইরূপ বিশেষণ করিব। তাহা হইলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে যে, ই কার বা উকারের পরস্থিত যে বিসর্গ, তাহার স্থানে ষ কার হয়।

ভাষ্যমূল।—অনোঽস্ত্রাবিধিশ্চ প্রয়োজনম্। বৃক্ষস্তরতি প্লক্ষস্তরতি অনোঽস্ত্যস্য বিধেয়ো ভবন্তীত্যনোঽস্ত্যস্য সত্বং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহের, অলোঽন্ত্যা বিধির জন্যও অবিশেষ রূপে পাঠের প্রয়োজন। যেমন, 'বৃক্ষস্তরতি' 'প্লক্ষস্তরতি' শব্দে, 'বৃক্ষঃ' এবং 'প্লক্ষঃ' শব্দের বিসর্গস্থানে 'স'কার হইয়াছে; আর তজ্জন্য "বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ" (১) এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে। এবং এই সূত্রে, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, "বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ" সূত্রে যে 'বিসর্গ'স্থানে 'স'কার বিধান করিল, সেই বিসর্গটী—শব্দের আদিস্থিত বিসর্গের, মধ্যস্থিত বিসর্গের, অথবা অন্তঃস্থিত বিসর্গের? এই শঙ্কা নিবারণ জন্য পুনঃ পরিভাষা-সূত্র করিয়াছেন

(১) বিসর্গ স্থানে সকার হয়, 'খর্' প্রত্যাহারান্তর্গত পরে থাকিলে।

যে, "অলোহন্ত্যস্য। ১। ১। ৫২। (সূত্রে, যেখানে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা কোন আদেশ নির্দ্দিষ্ট করিবে, সেখানে সেই আদেশটী, তাহার অন্তস্থিত অল্ প্রত্যাহারান্তর্গত একটী মাত্র বর্ণের স্থানে হইবে।) এই সূত্রানুসারে 'ষষ্ঠীবিভক্তি দ্বারা যে কোন আদেশ, তাহা অন্তস্থিত 'অলে'র স্থানেই হইবে; সুতরাং "বিসর্জ্জনীয়স্য", এখানে ষষ্ঠীবিভক্তি থাকাতে অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানেই 'স' আদেশ হইবে। অতএব "বৃক্ষঃ" ও "প্লক্ষঃ" শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গেরই স কার হইবে; পূর্ব্বাপরস্থিত কোন বর্ণের নহে। যদি বিসর্গের অবিশেষ রূপে পাঠ না হইত, তবে বিসর্গের অল্ সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হইত না; 'অলোহন্ত্য' সূত্রেও নির্দ্দেশ হইত না; সুতরাং 'বৃক্ষঃ' শব্দের বিসর্গের স্থলে সকার হইত না। 'বৃক্ষস্তরতি,' 'প্লক্ষস্তরতি' প্রভৃতি পদও সিদ্ধ হইত না। অতএব "অলোহন্ত্য" সূত্রানুসারে যে সকল বিধি প্রাপ্ত হইবে, সে সকল বিধি অন্ত্য 'অল্' মাত্র বর্ণের স্থানেই হইবে, বলিয়া 'বৃক্ষঃ' ও 'প্লক্ষঃ' শব্দের বিসর্গস্থানেও সত্ব সিদ্ধ হইবে।"

ভাষ্যমূল—এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। নির্দ্দিশ্যমানস্যাদেশাভবন্তীতি বিসর্জ্জনীয়স্যৈব।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্জ্জনীয়াদি অযোগবাহ বর্ণের অবিশেষরূপে পাঠ করা ইহাও (অলোহন্ত্য সূত্রের জন্যও) প্রয়োজন হইতে পারে না। কারণ, যাহার স্থানে যে আদেশ হয়, তাহা নির্দ্দিশ্যমান বর্ণেরই হয়; সুতরাং 'বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ' সূত্রে যখন স্পষ্টরূপে বিসর্জ্জনীয়েরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তখন তাহারই স্থানে 'স' আদেশ হইবে। পূর্ব্বাপর অপর কোন বর্ণের স্থানে কদাপি হইতে পারে না; সুতরাং 'অলোহন্ত্য' বিধির জন্য, বিসর্গের অবিশেষ রূপে পাঠ কদাপি প্রয়োজন হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—দ্বির্বচনং প্রয়োজনম্। উরঃ কঃ। উরঃ পঃ। অনচি চ। অচ উত্তরস্য যরো দ্বে ভবত ইতি দ্বির্বচনং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষ রূপে পাঠের, দ্বির্বচন (দ্বিত্ববিধান) ও প্রয়োজন। বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ, অবিশেষ রূপে পাঠ না করিয়া স্থান বিশেষে পাঠ করিলে, হয়ত 'যর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠও হইত না; সুতরাং বিসর্গের দ্বিত্বও হইত না।

যেমন—'উরঃ কঃ', 'উরঃ পঃ' এই স্থলে, অনচি চ। ৮। ৪। ৪৭। ('অচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত যে, 'যর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার দ্বিত্ব

হয়; কিন্তু 'অচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে হয় না) এই সূত্রানুসারে, 'অচ্' এর পরস্থিত 'যর্'এর দ্বিত্ব হয় বলিয়া, 'উরঃ' এর (র্) রেফের উত্তরবর্ত্তী 'অ'কারের (অকার অচ্ মধ্যে পঠিত বলিয়া) পরস্থিত বিসর্গ 'যর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করাতে, বিসর্গের দ্বিত্ব হইল। সুতরাং বিকল্পে 'উরঃ কঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—স্থানিবদ্ভাবপ্রতিষেধশ্চ প্রয়োজনম্। যথেহভবতি উরঃ কেণ উরঃ পেণ ত্যড্ব্যবায় ইতি ণত্বম্। এবমিহাপি স্থানিবদ্ভাবাৎ প্রাপ্নোতি। বৃক্ষোবস্কেন মহোরস্কেনেতি। তত্রানল্বিধাবিতি প্রতিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ অবিশেষ রূপে পাঠের, স্থানিবদ্ভাব নিষেধেও প্রয়োজন; যেমন 'উরঃ কেণ' 'উরঃ পেণ' ইত্যাদি স্থলে, অট্ কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি (১) এই সূত্রানুসারে অট্ ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হয়।

বিশেষ বিবৃতি, যথা—বিসর্গ যদি অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা না যায়; তবে "উরঃ কেণ" ইহার'উরস্' শব্দের 'স'কারের স্থানে যে বিসর্গ হইয়াছে, সেই বিসর্গের, "স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ । ১ । ১ ৫৬। (যাহার স্থানে যে আদেশ হয়, সেই আদিষ্ট বর্ণ ও তাহার পূর্ব্ববৎ স্থানির ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অল্বিধি অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত বিধি হইলে, স্থানির ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয় না।) এই সূত্রানুসারে, স্থানিবদ্ভাব অর্থাৎ সত্ব প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং 'উরঃ কেণ' ইহার বিসর্গেতে সত্বধর্ম্ম মানিলে, রকারের পরে সকার ব্যবধান থাকিলে ণত্ব প্রাপ্তি হয় না বলিয়া 'উরঃ কেণ' এই স্থলেও ণত্ব প্রাপ্তি হইবে না। আর যদি বিসর্গকে অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা যায়, তবে বিসর্গও একটী বর্ণ বলিয়া কথিত হইবে। অতএব অল্ বিধিতে অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত বিধিতে, স্থানিবদ্ভাব হয় না বলিয়া, বিসর্গেরও স্থানিবদ্ভাব হইবে না; অথচ "অট্" মধ্যে পাঠ হেতু, "অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি" এই সূত্রানুসারে, রেফের পরে বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও বিসর্গ 'অট্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ বলিয়া, 'উরঃ কেণ' এর 'ণ'কার মূর্দ্ধন্য হইবে। অন্যথা বিসর্গের স্থানে স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া, সকারের স্থানে বিসর্গ হওয়াতে বিসর্গে সত্ব ধর্ম্ম মানাতে, 'উরঃ কেণ' এর ণ' কার মূর্দ্ধন্য হইত না।

আবার পক্ষান্তরে, বিসর্গের 'অট্' প্রত্যাহারে পাঠ করিবার প্রয়োজন এই যে, এইরূপ করিলে অর্থাৎ বিসর্গের 'অট্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ না করিলে,

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বৃঢ়োস্কেন" "মহোরস্কেন" ইত্যাদি স্থলেও 'স' কারের, স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত বিসর্গত্ব ধর্ম্ম মানিয়া 'ণ' ত্ব প্রাপ্ত হইবে কিন্তু বিসর্গকে যদি 'অল্' প্রত্যাহার মধ্যে যে কোন স্থানে পাঠ করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই একটী বর্ণ বিশেষ মানিতে হইবে আর যদি বিসর্গকে 'অল্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করিয়া একটী বর্ণ বিশেষই মানা গেল, তবে অল বিধিতে' অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত বিধিতে স্থানি দ্ভাব নিষেধ হয় বলিয়া, 'বৃঢ়োরস্কেন' ইত্যাদি স্থলে, 'স'কারের স্থানে বিসর্গরূপ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত ণত্ব রূপ বিধি প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহার নিষেধই সিদ্ধ হইবে। অতএব 'বৃঢ়োরস্কেন,' 'মহোরস্কেন' ইত্যাদি 'ণ ত্ব রহিত প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

মন্তব্য।—"বৃঢ়োরঃ কেন" ইহার বিসর্গ স্থানে, 'স'কার হইয়া 'বৃঢ়োরস্কেন' পদ হইয়াছে। এই স্থলে শঙ্কা এই হইতে পারে যে, বিসর্গের যখন 'অট্' বা কোনও প্রত্যাহার মধ্যেই পাঠ করা হইল না, তখন রেফের পরে বিসর্গ থাকিলে অর্থাৎ বৃঢ়োরস্কের সকারে, বিসর্গত্ব ধর্ম্ম মানিলেও বিসর্গ যখন অট্ মধ্যে পাঠ হয় নাই তখন, 'অট্ কুপ্বাঙ্নুম্' সূত্রেরও প্রাপ্তি হইবে না; অতএব বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও ত 'ণ'ত্ব প্রাপ্তি হইবেই না, তবে আর "বৃঢ়োরস্কেন" ইত্যাদি স্থলে কিরূপে দোষ প্রাপ্তি হইবে।

বিসর্গের যখন 'অট্' বা অন্য কোনও প্রত্যাহার মধ্যেই পাঠ করা যাইবে না, তখন তাহা মাহেশ্বর বা পাণিনি কর্ত্তৃক বর্ণত্ব মধ্যে অগৃহীত বলিয়া, বিসর্গকে কোন বর্ণে মধ্যেই গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব বিসর্গ যদি কোন বর্ণই না হইল, তবে রেফের পরে কোন বর্ণ ব্যবধান না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত "রষাভ্যাংনোণঃ সমানপদে" (১) এই সূত্রানুসারেই ণত্ব বারণ কে করিবে?

আর যদি বল 'ক'কার যে ব্যবধান আছে তাহার কি উপায় হইবে?

তাহার ত "অট্ কুপ্বাঙ্" সূত্রে, 'ক' বর্গের পাঠ হেতু, ক কার ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব প্রাপ্তি হইবেই, সুতরাং 'বৃঢ়োরস্কেন' স্থলেও ণত্ব প্রাপ্ত হইবে; তন্নিবারণার্থই বলা হইয়াছে যে, বিসর্গ প্রভৃতি অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষ রূপে পাঠ করা, 'স্থানিবদ্ভাব' নিষেধের জন্য ও প্রয়োজন।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত এই হইল যে, অনুস্বার বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহ, মাহেশ্বর কৃত 'অ ই উ ণ' প্রভৃতি সূত্রের, স্থান বিশেষে পাঠ না করিয়া অবিশেষ রূপে, সর্ব্বত্রই পাঠ করা প্রয়োজন।

---

(১) ইহার অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা।—(১) অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষ রূপে পাঠের, স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করিবার জন্যও প্রয়োজন। তাহার কারণ এই যে যেমন, "উরঃ কেণ" "উরঃ পেণ" প্রভৃতি স্থলে, রেফের পরে বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও বিসর্গের 'অট্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হেতু, "অট্‌কুপ্বাঙ্‌ নুম্ব্যবায়েঽপি" এই সূত্রানুসারে ণত্ব হইয়াছে; সেরূপ 'বৃক্ষোরস্কেন' 'মহোরস্কেন' এই সকল স্থলেও রেফের পরে সকার ব্যবধান থাকিলেও 'স' কারের 'স্থানিবদ্ভাব' আনিয়া, বিসর্গ স্থানে 'স'কার হওয়াতে, 'স'কারের বিসর্গত্ব ধর্ম্ম আনিয়া 'স' কার ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হইবে ?

তাহা হইবে না; কারণ, বিসর্গকে অবিশেষ রূপে সর্ব্বত্র পাঠ করাতে, বিসর্গের 'অল্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু 'স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ'(২) এই সূত্রে 'অল্' অর্থাৎ একটী বর্ণাশ্রিত মাত্র বিধিতে, স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করাতে, 'স'কারের স্থানিবদ্ভাবও প্রাপ্তি হইবে না; সুতরাং বিসর্গ স্থানে উৎপন্ন 'বৃক্ষোরস্কেন' এর সকার ব্যবধান থাকিলে, পরের 'ন' কারেরও মূর্দ্ধন্য হইবে না, কুত্রাপি কোন দোষও ঘটিবে না। অতএব 'স্থানিবদ্ভাব প্রতিষেধের জন্যও বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণের সর্ব্বত্র অবিশেষ রূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনরিমেবর্ণা অর্থবন্ত আহোস্বিদনর্থকাঃ।

অর্থবন্তো বর্ণা ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেক বর্ণানামর্থদর্শনাৎ *।

অর্থবন্তো বর্ণাঃ। কুতঃ। ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেকবর্ণানামর্থদর্শনাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—'অ ই উ ণ্' প্রভৃতি মহেশ্বরকৃত সূত্রে, প্রত্যেকটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট অথবা অর্থশূন্য ?

প্রত্যেক বর্ণই অর্থ বিশিষ্ট; যেহেতু ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাতন প্রভৃতি একটী একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। *।

এক একটী বর্ণ সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অর্থবিশিষ্ট।

কেন ? যেহেতু; ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতন, ইহাদের একটী একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাতে কিছু ক্লিষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হয় বলিয়াই পর ব্যাখ্যা করা হইল।

(২) অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—ধাতব একবর্ণা অর্থবন্তো দৃষ্টান্ত। এতি। অধ্যেতি। অধীত ইতি ।

বঙ্গানুবাদ।—ধাতু সমূহ যে, একটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবান্ দৃষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ; যথাঃ—এতি, অধ্যেতি, অধীত (১) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—প্রাতিপদিকান্যেকবর্ণান্যর্থবন্তি। আভ্যাম্। এভিঃ। এষু।

বঙ্গানুবাদ।—প্রাতিপদিক সমূহ, এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অর্থ-বিশিষ্ট, যথাঃ—আভ্যাম্, এভিঃ, এষু (২) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—প্রত্যয়া একবর্ণা অর্থবন্তঃ। ঔপগবঃ। কাপটবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—একবর্ণ বিশিষ্ট প্রত্যয় সকল অর্থ বিশিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত যথাঃ—ঔপগবঃ, কাপটবঃ। এই সকল স্থলে, অপত্যার্থে অন্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। 'অণ'এর 'ণ' কার ইৎ গিয়া 'অ' মাত্র কটী বর্ণ অবশিষ্ট থাকে। এক্ষণে 'অ'কার একটী মাত্র বর্ণেরই অপত্যার্থ বোধ করাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নিপাতা একবর্ণা অর্থবন্তঃ। অ অপেহি। ই ইন্দ্রং পশ্য। উ উত্তিষ্ঠ। অ অপক্রাম। ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেকবর্ণনা-মর্থদর্শনান্মন্যামহে অর্থবন্তোবর্ণা ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—এক একটী নিপাতন বর্ণ সমূহ অর্থ বিশিষ্ট। দৃষ্টান্ত যথাঃ—অ অপেহি, ই ইন্দ্রং পশ্য, উ উত্তিষ্ঠ, অ অপক্রাম। (৩) ইত্যাদি। এইরূপে ধাতুর, প্রাতিপ্রদিকের, প্রত্যয়ের এবং নিপাতনের প্রত্যেক বর্ণেরই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ দর্শন করিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি যে, বর্ণ সমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট।

বার্ত্তিকমূল।—বর্ণব্যত্যয়ে চার্থান্তরগমনাৎ।*

বার্ত্তিকার্থ।—কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে, সেই অর্থবোধ না হইয়া অন্য অর্থ বোধ হয় বলিয়া বর্ণ সমূহ স্বতন্ত্ররূপে অর্থ বিশিষ্ট।*

ভাষ্যমূল।—বর্ণব্যত্যয়ে চার্থান্তরগমনান্মন্যামহে অর্থবন্তোবর্ণা ইতি।

(১) 'ইণ গতৌ' ধাতুর 'ণ' ইৎ হইয়া 'ই' মাত্র একটি বর্ণ থাকে। এতি এবং অধ্যেতি, শব্দ, ইণ্ ধাতু, আর অধীত শব্দ 'ঈঙ্ অধ্যয়নে', ঙ্ ইৎ বিশিষ্ট ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে।

(২) অস্মদ্ শব্দের স্থানে, 'আভ্যাম্' এর 'আ', এভিঃ ও এষুর 'এ'কার, অর্থ বিশিষ্ট একাক্ষর হইয়াছে।

(৩) 'অ' বিস্তু, 'ই' বিস্ময়, 'উ' বিতর্ক এবং পুনঃ 'অ' বিস্তু অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে।

কূপঃ সূপো যূপ ইতি। কূপ ইতি সককারেণ কশ্চিদর্থো গম্যতে। সূপ ইতি ককারাপায়ে সকারোপজনে চার্থান্তরং গম্যতে। যূপ ইতি ককার-সকারা পায়ে যকারোপজনেঽর্থান্তরং গম্যতে। তেন মন্যামহে যঃ কূপে কূপার্থঃ স ককারস্য যঃ সূপে সূপার্থঃ স সকারস্য যো যূপে যূপার্থঃ স যকারস্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—কোনও শব্দের একটী মাত্র বর্ণ ব্যত্যয় হইলে, অন্যার্থ বোধ হয় বলিয়া ও আমরা মনে করিয়া থাকি যে, বর্ণ সমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অর্থ-বিশিষ্ট। যেমন ;—কূপঃ, সূপঃ, যূপ ইত্যাদি। 'ক'কারের সহিত মিলিত 'কূপ' এই শব্দের কোনও এক প্রকার অর্থের বোধ হয়, অর্থাৎ গভীর ক্ষুদ্র জলাশয় বিশেষকে বুঝায়।

আবার কূপ শব্দের ককার বাদ দিয়া 'ঊপ' এই অংশ রাখিয়া ককার স্থানে স কার উৎপন্ন হইলে, অন্য অর্থ বিশিষ্ট সূপ শব্দ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দাইলকে বুঝাইয়া থাকে।

পুনরায় 'ক'কার এবং সকার উভয় বর্ণ বাদ দিয়া 'য'কার উৎপন্ন হইলে, 'ঊপ' অংশের সহিত 'য'কার যোগ দিলে, যে 'যূপ' শব্দ হইবে, তাহার আবার অন্য অর্থ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ পশুবন্ধন জন্য যজ্ঞভূমিস্থ কাষ্ঠ বিশেষকে বুঝা-ইবে। এই জন্যই আমরা মনে করিয়া থাকি যে, 'কূপ' শব্দে যে কূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা 'ক' কারের, 'সূপ' শব্দে যে সূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা 'স'কারের এবং 'যূপ' শব্দে যে যূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা 'য'কারেরই। সুতরাং ইহা দ্বারা এক একটী বর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ বিশিষ্ট ; ইহাই প্রতি-পন্ন হইতেছে।

বার্ত্তিকমূল।—বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ *।

বঙ্গানুবাদ।—কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ অভাব হইলে, অনর্থগতি অর্থাৎ অর্থের অভাব বোধ হয় ; এই জন্যও আমরা বলিব যে, বর্ণ সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট। *

ভাষ্যমূল।—বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতের্মন্যামহেঽর্থবন্তোবর্ণা ইতি। বৃক্ষ ঋক্ষঃ। কাণ্ডীর আণ্ডীরঃ। বৃক্ষ ইতি সবকারেণ কশ্চিদর্থোগম্যতে ঋক্ষ ইতি বকারাপায়ে সোঽর্থো ন গম্যতে। কাণ্ডীর ইতি সককারেণ কশ্চিদর্থো গম্যতে আণ্ডীর ইতি ককারাপায়ে সোঽর্থো ন গম্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—কোনও একটী শব্দ হইতে একটী বর্ণের অভাব হইলেই আর

13/61

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম—কথিত।] [৫৫৩ পৃষ্ঠার পর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের উপায়]

বিজয়। মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না?

[অহঙ্কার ও উপাধি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।"

"দেখ না, আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই।

"এই দেখ, এই গামছাখানা দিয়ে আমি মুখের সামনে আড়াল্‌ কর্‌ছি। আর আমায় তোমরা দেখতে পা'রছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্‌ সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবুও এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পা'রছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটী উপাধি হয় আর জীবের স্বভাব বদ্‌লে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখ্‌বে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে (stick) ছড়ী, এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি সিস্‌ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময়, সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌ করে টান্‌ দিতে থাকবে।

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়; আর সে মানুষ থাকে না।

"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া কর্‌তো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে বেড়াতে গিছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি,সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে, বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর? বলি— আছো কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বল্লুম, 'ওরে হৃদে! এ লোক টার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ত্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল, তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল, আর বল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্‌!' টাকার এতো অহংকার।

অহংকার কখন্ যায়; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

"জ্ঞানলাভ হলে অহংকার যেতে পারে। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

"বেদে আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়, সমাধি হলেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ গুহ্য, নাভি— সেই তিন ভূমি; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনী কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়, তখন সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, 'একি! একি!' তারপর কণ্ঠ, সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয়,কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া হয় না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে। সহস্রার সপ্তমভূমি। সেখানে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়!

বিজয়। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিবার পর যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে আর পাওয়া যায় না।

"নুনের ছবি ('লবণ পুত্তলিকা') সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। কিন্তু সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর, কে খপর দিবেক? যে দেবে, সে মিসে গেছে। সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয় আর সমাধি হয়, কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

বজ্জাৎ 'আমি'।

"যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি'ই খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই 'আমি' মাঝখানে আছে বলে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দুটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ, এক জল; লাঠিটার দরুণ দুটা দেখাচ্ছে। 'অহং'ই ঐ লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাক্‌বে।

"বজ্জাৎ 'আমি' কাকে বলে? যে 'আমি' বলে,—আমায় জানে না! আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড় লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরী করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তার পর চোরকে খুব করে মারে, তাতেও ছাড়ে না, আবার পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। 'বজ্জাৎ আমি' ব'লে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে? এত বড় আস্পদ্ধা!

'অহং' কিন্তু যায় না।

বিজয়। যদি অহং না গেলে সংসার-আসক্তি যাবে না—সমাধি হবে না, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অব[illegible] সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে, হবে [illegible] আমি কৃষ্ণময় [illegible]?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই একটী লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় অহং যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে আবার এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো, ফেঁকড়ী বেরিয়েছে।

দাস আমি।

"একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস, এই ভাবে থাকো। 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত'

এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই। মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টর মধ্যে নয়। জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামগুণ কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।

"যেমন জলের রাশির উপর বাঁশ না রেখে একটী রেখা কাটা হয়েছে ; যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি', কি 'ভক্তের আমি', কি 'বালকের আমি' যেন 'আমি'র রেখা মাত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! আপনি বজ্জাৎ 'আমি' ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ছেন, দাস 'আমি'তে দোষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বরের দাস', 'আমি তাঁর ভক্ত' এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বরলাভ হয়।

বিজয়। আচ্ছা, যার 'দাস আমি' আছে, তার কামক্রোধাদি কিরূপ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক ভাব যদি হয়, তা হলে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট কর্‌তে পারে না।

"পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিং

"নারকেল গাছের ...ঝরে পড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটী টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে, তার বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালক কোন জিনিসের উপর টান কর্‌তেও যতক্ষণ, তাকে ছাড়্‌তেও ততক্ষণ। একখান পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধপয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো, কিন্তু প্রথমে খুব আঁট করে বল্‌বে এখন—'না, আমি দেবো—

না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে।' বালকের আবার সব্বাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই,তাই জাতিবিচার নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়', তো সে ছুঁতোর হলেও একপাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই, পাইখানায় গিয়ে হাতে মাটী দেয় না।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।

"কেউ কেউ সমাধির পরও এই 'ভক্তের আমি' দাস আমি নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ভক্ত 'তুমি ভগবান্', এই অভিমান ভক্তের আছে। ঈশ্বরলাভের পরও এ অভিমান থাকে, সব 'আমি' একেবারে যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বরলাভ হয়। এরি নাম ভক্তিযোগ।

এই ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি মনে কর্‌লে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। কিন্তু ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ছেলে, তুমি মা', এই সব অভিমান রাখ্‌তে চায়।

বিজয়। যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। কিন্তু বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তমভূমির কথা বলেছি। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে তবে মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়। কিন্তু জীব কলিতে অন্নগত প্রাণ, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয না। [illegible] ন নই, আমি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের [illegible] .র রোগ শোক জরা মৃত্যু কৈ?' এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো না কেন, আবার কোনখান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। এই অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, মনে কর্‌লে মূলশুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখো, গাছের একটী ফেঁকড়ী দেখা দিয়েছে। দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।

"আর 'চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি, 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি, 'তুমি ভগবান্, আমি

তোমার দাস।' পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচ্ খেলানো ভাল। ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগান কর্‌বো, তাঁকে চিন্তা করে নাচ্‌বো, তাঁর ভক্তের সঙ্গে আনন্দ কর্‌বো, এই আমার সাধ। সেব্যসেবকভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না।

"'আমিই সেই' 'আমিই সেই' এসব অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পাবে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজে নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

দ্বিবিধা ভক্তি।

"কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটী নাম রাগভক্তি। প্রেম অনুরাগ, না হলে ভগবান্ লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

"আর এক রকম ভক্তি আছে, তার নাম বৈধী ভক্তি। এতো জপ্ কর্‌তে হবে, উপোসকর্‌তে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা কর্‌তে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক কর্‌তে কর্‌তে তবে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই।" সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

"কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। হয়তো স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ...বে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্যে পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আস্‌বে বলে তাই জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, তা হলে পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। যদি ঈশ্বরের উপরঅনুরাগ, প্রেম আপনি আসে, তা হলে জপ, তপ, কর্ম্ম, ত্যাগ হয়ে যায়। হরি প্রেমে মাতোয়ারা হলে আর বৈধীকর্ম্ম কে কর্‌বে?

"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।

উত্তম অধিকারী।

"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা কর্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা কর্‌তে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি (Solution of silver) মাখান থাকে, তা হলে যা ছবি পড়ে, তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাক্‌লে উপদেশ ধারনা হয় না।

ঈশ্বর দর্শন (God-vision); উপায়।

বিজয়। মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাঁকে দর্শন কর্‌তে গেলে, ভক্তি হলেই হয়।

*শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমা-*ভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন, ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা। স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভালবাসা রাগভক্তি এলে স্ত্রী,পুত্র, আত্মীয়, কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটী কর্ম্মভূমিমাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কলিকাতায় কর্ম্মভূমি—বাসা করে থাক্‌তে হয়, কর্ম্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে।

"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্‌লে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশ্‌লায়ের কাটী যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ্‌ কাটী লোকশান্‌ হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

"শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বল্লেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখিরা বল্লে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। তুমি কি প্রলাপ বোক্‌চো? শ্রীমতী বল্লেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তা হলে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।

(বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে,—

'প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ,
তোমারে কি যায় জানা!'

"এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা হলে সাকারনিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।

ত্যাগ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।)

শান্তি কোথা, বলি যথাতথা ভ্রমে জীব আপন পাশরা।
দেহভগ্ন, মন চিন্তা মগ্ন তবু কেহ নহে আশাছাড়া॥ ১
মৃত্যুজরা, আধিব্যাধি পীড়', হেরি জীব তবু দৃষ্টিহীন্।
বর্ত্তমান্ হেরে জ্যোতিষ্মান্ কামিনীকাঞ্চন রসেলীন্॥ ২
জন্মি কেন, কেন বা মরণ, কোথা যাব ক'জন ভাবয়?
যদিভাবে, তখনিত ডুবে, বিজুলী জলদে যথা লয়॥ ৩
ছলে বলে, এ ভব মণ্ডলে, কামিনীকাঞ্চন লাভ করি।
বুদ্ধিমান্ ব'লে অভিমান্ জীবের, না ব্যতিক্রম হেরি॥ ৪
বাক্যজালে, জানায় সকলে মম সম কেবা ভবে আর?
ক্ষুধাতুর বায়স চতুর—সদা তার পূরীষ আহার!!! ৫
প্রতিজনে সুধালে বিজনে, 'সুখলাভ করেছ কি ভাই'।
মর্ম্মভেদি উঠে সেই কাঁদি 'সুখশান্তি এসংসারে নাই'॥ ৬
বাহিরেতে কত রকমারি, যেন সুখ শান্তি নিরবধি।
ভিতরেতে বহে দিনে রেতে, তপ্তধারা বৈতরণী নদী॥ ৭
মান মদে, কিবা উচ্চপদে বিদ্যালাভে অথবা সুযশে।
ধনেজনে, প্রিয়আলিঙ্গনে, কিছুতেই শান্তি নাহি বাসে॥ ৮
তবে শান্তি লাভ বুঝিভ্রান্তি, আস্তিকের ছল বিড়ম্বণ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম পুরাণ কোরাণ সকলি কি নিশার স্বপণ? ৯
সর্ব্বত্যাগী পর হিতে রত, মহাজন্ মিছা নাহি বলে।
অনুক্ষণ তোমার মতন কামিনীকাঞ্চনে নাহি টলে॥ ১০
সাধু বাক্য শাস্ত্রের শাসন, তাই জীব শুন একবার।
সম্মুখেতে পাওকি দেখিতে জরা মৃত্যু ঘোর অন্ধকার? ১১
ভোগে সুখ নাহি চিরদুখ—দিনে দিনে বাড়ায় বাসনা।
ত্যাগ—ত্যাগ—মন্ত্র মহাভাগ দিবানিশি করেন সাধনা॥ ১২
ত্যাগ বিনে—এ তিনভুবনে শান্তিলাভ দৈব বিড়ম্বন।
বীরহিয়া, সকল ছাড়িয়া— ভগবানে করে অন্বেষণ॥ ১৩

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৫২৮ পৃষ্ঠার পর।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ কে? পুনামেলিতে ইঁহার জন্ম। ইনি বাল্য হইতেই শ্রীবরদরাজের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। একমাত্র বরদরাজই তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার। সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত। কিসে বরদরাজের সুখ সম্পাদন করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদাই সুশীতলজলসিক্তব্যজনহস্তে তাঁহার প্রিয়তমকে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল সেবন করাইতেছেন। কোথায় উত্তম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কোথায় অমৃতোপম ফল পক্ক হইয়াছে, এ সমুদয় তিনি বিশেষ অবগত আছেন। যথাসময়ে সমুচিত মূল্য দিয়া, কিম্বা ভিক্ষা করিয়া, হৃদয়পতির জন্য আনয়ন করিতেছেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না, বলিত, ইনি শ্রীবরদরাজের নিত্যদাস, বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন। কাঞ্চিনিবাসিগণ তাঁহাকে নিরতিশয় ভক্তি ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্বভাব বালকের মত। অভিমান কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। সর্ব্বদাই হাস্যমুখ। যিনি তাঁহাকে দেখিতেন, তিনি দুঃখের কালিমা মুছিয়া, প্রফুল্লতার দীপ্তিতে স্বীয় বদনকে শোভাময় করিতেন। মনোমালিন্য, হৃদয়সন্তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিলে ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। মধুঋতু যেখানে যান, সেই খানেই যেমন মধুবর্ষণ করেন, শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও সেইরূপ যেখানে যাইতেন, সেই খানেই স্বর্গের সুখ শান্তি বিস্তার করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অতি পরিচিত বলিয়া ভাবিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে ফেলিতেন না। কারণ, তাঁহার স্বভাব অধিকাংশ সময়েই অলৌকিক আকার ধারণ করিত। তাঁহার সহিত কোন অদৃশ্য পুরুষ অহরহঃ থাকিতেন। লোকের সহিত বাক্যালাপ কালে, তিনি সকলকে ভুলিয়া গিয়া সেই পুরুষের কথা শুনিতেন, শুনিয়া কখন কখন হাসিতেন, কখন কখন কত কি বলিতেন। দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইত। কিন্তু কেহ তাঁহাকে উন্মাদ বলিতেন না, কারণ তাঁহার বদন এমন এক প্রকার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে গঠিত ছিল যে, দেখিলে অতি কঠোরপ্রকৃতিও গলিয়া যাইত। কে সেই অদৃশ্য পুরুষ? সকলেই একবাক্যে বলিতেন, "সাক্ষাৎ শ্রীবরদরাজ।" "তিনি শ্রীহস্তিগিরিপতির সহিত কথোপকথন করেন, তিনি শ্রীহরির মুখ-স্বরূপ, তাঁহার ভিতর দিয়া শ্রীবরদরাজ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন।" ইহা সকলেই

কহিতেন। অথচ, তিনি আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেন, ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর এবং যত্ন করিতেন, শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। কেবল কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রব্যবসায়ী তাঁহাকে উন্মত্ত বা ভণ্ড বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁহাদের মধ্যে একজন।

অষ্টম অধ্যায়।

স্তোত্ররত্ন।

শ্রীরামানুজদর্শনাবধি আলওয়ান্দার তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত। তাঁহার কল্যাণার্থ সর্ব্বদাই তিনি শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করেন। যাহাতে যাদবের শিষ্যত্ব ছাড়িয়া তিনি পরম বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করেন, বৃদ্ধ যামুনাচার্য্য তাহারই জন্য প্রতিদিন শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আবেদন করেন। শ্রীরামানুজকে তিনি পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। একদা তাঁহার কল্যাণ কামনা করিয়া অপূর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ স্তোত্ররত্ন তিনি ত্রিলোকনাথের শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিলেন। এই স্তোত্রমালার সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত অদ্যাবধি আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ সুমধুরভাবে কেহ কখন আপনার হৃদয়ের গভীর অনুরাগ, প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সহৃদয় ভাবুক আস্বাদন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে বিষ্ণুপাদনিঃস্যন্দিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার পবিত্রতা ও শীতলতা বর্ত্তমান আছে, এবং ইহার প্রতিবর্ণই যেন সুধাসিক্ত হইয়া শ্লোকাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম কয়েকটি শ্লোক স্বীয় গুরু পিতামহ নাথমুনির শ্রীপাদবন্দনার্থ রচিত।

> ভগবদ্বন্দনং স্বাদ্যং গুরুবন্দনপূর্ব্বকম্।
> ক্ষীরং শর্করয়া যুক্তং স্বদতে হি বিশেষতঃ॥

শ্রীগুরু বন্দনা করিয়া ভগবদ্বন্দন করিলে তাহা অধিকতর স্বাদু হয়, কারণ, দুগ্ধ স্বভাবতঃ স্বাদু হইলেও শর্করা-যোগে অধিকতর সুস্বাদু হয়। সমগ্র স্তোত্রটি এই,—

> নমোঽচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্টজ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে।
> নাথায় মুনয়েঽগাধভগবদ্ভক্তিসিন্ধবে॥ ১॥

যাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যরাশি অচিন্তনীয়, অদ্ভুত এবং নিরবচ্ছিন্ন, যিনি

ভগবদ্ভক্তির অতলস্পর্শ সাগরস্বরূপ আমি সেই মদীয় প্রভু নাথমুনিকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

তস্মৈ নমো মধুজিদংঘ্রিসরোজতত্ত্ব-
জ্ঞানানুরাগমহিমাতিশয়ান্তসীম্নে।
নাথায় নাথমুনয়েহত্র পরত্র চাপি
নিত্যং যদীয়চরণৌ শরণং মদীয়ম্ ॥ ২ ॥

ভগবৎপাদপদ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানভক্তিজনিত পরম মহত্ত্বের যিনি শেষ সীমা স্বরূপ, যাঁহার শ্রীচরণযুগল আমার নিত্য আশ্রয়স্থল, যিনি ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্রই আমার প্রভু সেই নাথমুনিকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

ভূয়ো নমোহপরিমিতাচ্যুতভক্তিতত্ত্ব
জ্ঞানামৃতাব্ধিপরিবাহশুভৈর্বচোভিঃ।
লোকেহবতীর্ণপরমার্থসমগ্রভক্তি-
যোগায় নাথমুনয়ে যমিনাং বরায় ॥ ৩ ॥

হরিভক্তির তত্ত্বজ্ঞানরূপ অপার সুধাসমুদ্র হইতে উত্থিত মহাবন্যাস্বরূপ লোকহিতকর উপদেশরাশি লইয়া, জীবনিবহের পরমার্থসাধক সমগ্রভক্তি-যোগরূপে যিনি ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি সংযমীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি পুনর্ব্বার সেই নাথমুনিকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

তত্ত্বেন যশ্চিদচিদীশ্বরতৎস্বভাব-
ভোগাপবর্গতদুপায়গতীরুদারঃ।
সন্দর্শয়ন্নিরমিমীত পুরাণরত্নং,
তস্মৈ নমো মুনিবরায় পরাশরায় ॥ ৪ ॥

যে উদারচরিত্র মুনিবর চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর ও তাহাদের স্বরূপ, ভোগ, মোক্ষ এবং তাহাদের প্রাপ্ত্যুপায় যথাযথ বর্ণন করিয়া পুরাণরত্ন (বিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, আমি সেই মহর্ষি পরাশরকে নমস্কার করি ॥৪॥

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥ ৫ ॥

চিরকাল ধরিয়া যাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগল মদ্বংশীয়গণের মাতা পিতা যুবতী সন্তান, দাস, ধন, রত্ন প্রভৃতি রূপে বিরাজ করিতেছেন, আমাদের সেই আদি

কুলগুরু, মহাত্মা পরাঙ্কুশের বকুলপুষ্পসুশোভিত শ্রীচরণে মস্তক অর্পণ করিয়া আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যন্মূর্দ্ধ্নি মে শ্রুতিশিরঃসু চ ভাতি যস্মিন্
অস্মন্মনোরথপথঃ সকলঃ সমেতি।
স্তোষ্যামি নঃ কুলধনং কুলদৈবতং তৎ
পাদারবিন্দমরবিন্দবিলোচনস্য ॥ ৬ ॥

যাহা আমার এবং বেদসমূহের শিরোদেশে (উপনিষদ্ সমূহে) সর্ব্বদাই বিরাজ করেন, আমাদের যাবতীয় বাসনা-গতি যেখানে গিয়া মিলিত হয়, যাহা আমাদের বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত ধন ও কুলদেবতা, আমি সেই কমলনয়নের পাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব ॥ ৬ ॥

তত্ত্বেন যস্য মহিমার্ণবশীকরাণুঃ
শক্যো ন মাতুমপি শর্বপিতামহাদ্যৈঃ।
কর্ত্তুং তদীয়মহিমস্তুতিমুদ্যতায়
মহ্যং নমোঽস্তু কবয়ে নিরপত্রপায় ॥ ॥

শিব ব্রহ্মাদিও যাঁহার মহিমাসাগরের এক অণুস্বরূপ বিন্দুরও পরিমাণ করিতে সমর্থ হয়েন না, আমার ন্যায় লজ্জাহীন কবি যে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এইজন্য আমাকেও নমস্কার ॥ ৭ ॥

যদ্বা শ্রমাবধি যথামতি বাপ্যশক্তঃ
স্তৌম্যেবমেব খলু তেঽপি সদা স্তুবন্তঃ।
বেদাশ্চতুর্মুখমুখাশ্চ মহার্ণবান্তঃ
কো মজ্জতোরণুকুলাচলয়োর্বিশেষঃ ॥ ৮ ॥

অথবা অশক্ত হইলেও যথাসাধ্য যথামতি তাঁহার স্তুতি করি, কারণ, বেদসমূহ এবং ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ এইরূপেই সর্ব্বদা তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন। মহাসাগরের মধ্যে পরমাণু এবং কুলপর্ব্বত উভয়ই নির্ব্বিশেষে মগ্ন হইয়া যায়। ৮ ॥

কিঞ্চৈষ শক্ত্যতিশয়েন ন তেঽনুকম্প্যঃ
স্তোতাপি তু স্তুতিকৃতেন পরিশ্রমেণ।
তত্র শ্রমস্তু সুলভো মম মন্দবুদ্ধেঃ
ইত্যুদ্যমোঽয়মুচিতো মম চাব্জনেত্র ॥ ৯ ॥

আরও, স্তবকর্ত্তা স্বীয় কবিত্ব শক্তির জন্য যে তোমার অনুগ্রহণীয়, তাহা

নহে, কিন্তু তাহার পরিশ্রমের জন্যই তুমি তাহাকে দয়া কর। এরূপ হইলে, আমি বাস্তবিকই তোমার কৃপাপাত্র হইবার আশা করি, কারণ, অল্প-বুদ্ধিহেতু স্তব রচনায় আমার বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে। সুতরাং শ্রম আমার পক্ষে অতি সুলভ বলিয়া, হে নলিননেত্র, এ উদ্যম আমার উচিতই হইয়াছে ॥ ৯ ॥

নাবেক্ষসে যদি ততো ভুবনান্যমূনি
নালং প্রভো ভবিতুমেব কুতঃ প্রবৃত্তিঃ।
এবং নিসর্গসুহৃদি ত্বয়ি সর্ব্বজন্তোঃ
স্বামিন্নচিত্রমিদমাশ্রিতবৎসলত্বম্ ॥ ১০ ॥

হে প্রভো, তুমি না দৃষ্টিপাত করিলে ভুবন সমূহ অবস্থান করিতেই সমর্থ হয় না, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিতে কিরূপে সক্ষম হইবে? সর্ব্বজন্তুর তুমি এইরূপ স্বাভাবিক সুহৃদ্ বলিয়া, হে স্বামিন্! আশ্রিতগণের প্রতি তোমার ঈদৃশ স্নেহ, কিছু বিচিত্র নহে ॥ ১০ ॥

স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়েশিতৃত্বং
নারায়ণ ত্বয়ি ন মৃষ্যতি বৈদিকঃ কঃ।
ব্রহ্মা শিবঃ শতমখঃ পরমস্বরাড়ি-
ত্যেতেঽপি যস্য মহিমার্ণববিপ্রুষস্তে ॥ ১১ ॥

হে নারায়ণ, কোন্ বেদজ্ঞ পণ্ডিত তোমাকে স্বাভাবিক, অনন্ত ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করিবেন? কারণ, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও পরব্রহ্ম, ইঁহারাও তোমার মহিমাসমুদ্রের এক এক বিন্দুস্বরূপ ॥ ১১ ॥

কঃ শ্রীঃ শ্রিয়ঃ পরমসত্ত্বসমাশ্রয়ঃ কঃ
কঃ পুণ্ডরীকনয়নঃ পুরুষোত্তমঃ কঃ।
কস্যাযুতাযুতশতৈককলাংশকাংশে
বিশ্বং বিচিত্রচিদচিৎপ্রবিভাগবৃত্তম্ ॥ ১২ ॥

তোমা ভিন্ন শ্রীদেবীর শ্রীবিধান কে করিতে পারে? বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় কে হইতে পারে? কাহার নয়ন পদ্মের ন্যায় মনোহর? পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কাহার সহস্র কোটি ভাগের অতি ক্ষুদ্রাংশের অংশে এই জড় চৈতন্যে বিভক্ত বিচিত্র বিশ্ব রচিত হইয়াছে? ॥ ১২ ॥

বেদাপহারগুরুপাতকদৈত্যপীড়া-
দ্যাপদ্বিমোচনমহিষ্ঠফলপ্রদানৈঃ

সোহব্যঃ প্রজাঃ পশুপতিঃ পাবপাতি কস্য
পাদোদকেন স শিবঃ স্বশিরোধৃতেন ॥ ১৩ ॥

অপহৃত বেদ উদ্ধার করিয়া, ব্রহ্মার শিরচ্ছেদ হেতু মহাপাতক হইতে শিবকে উদ্ধার করিয়া, দৈত্যপীড়াদিরূপ বহুবিধ আপদের হস্ত হইতে ত্রিভুবনকে মুক্ত করিয়া, এবং ভক্তগণকে উৎকৃষ্টতম ফল প্রদান করিয়া, অন্য কে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন? স্বমস্তকস্থিত কাহার পাদোদকদ্বারা পশুপতি শিব প্রজাকুলকে পরিপালন করিয়া থাকেন? ॥ ১৬ ॥

কস্যোদরে হরবিরিঞ্চিমুখঃ প্রপঞ্চঃ
কো রক্ষতীমমজনিষ্ট চ কস্য নাভেঃ।
ক্রান্ত্বা নিগীর্য্য পুনরুদ্গিরতি ত্বদন্যঃ
কঃ কেন বৈষ পরবানিতি শক্যশঙ্কঃ ॥ ১৮ ॥

শিববিরিঞ্চিপ্রমুখ এই ত্রিজগৎ কাহার উদরে অবস্থান করিতেছে, কে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন? কাহার নাভি হইতে ইহা জন্মিয়াছে? তোমা ভিন্ন অন্য কে ইহাকে ধরিয়া নিগীরণ পূর্ব্বক, পুনরায় উদ্গীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও পরাধীন বলিয়া পরিগণিত হয়েন? ॥ ১৯ ॥

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৪ ॥

তুমি অত্যুৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ দ্বারা রচিত শীল, রূপ, ও চরিত্র সম্পন্ন বলিয়া তমঃপ্রধান, আসুরস্বভাববিশিষ্ট, জীবগণ তোমায় জানিতে সক্ষম হয় না। সাত্ত্বিক শাস্ত্র সমূহ দ্বারাই তুমি জ্ঞেয়; সে সকল তাহাদের পক্ষে অতি দুরূহ। জৈমিনি ব্যাস প্রভৃতি সুবিখ্যাত ধর্ম্মবিদ্ ও আত্মবিদ্‌গণের মীমাংসা সাহায্যেই তোমায় জানিতে পারা যায়, সুতরাং তোমায় তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৬ ॥

দেশকালনিমিত্তরূপ সীমাত্রয় অতিক্রম করিয়া তোমার যে মহেশ্বরস্বভাব সম ও বিষম আকারে অবস্থান করিতেছে, এবং তুমিও যাহাকে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ, কোন কোন ভাগ্যবান্, সর্ব্বদা কেবলমাত্র তোমাতেই চিত্ত স্থাপন করিয়া, তাহার দর্শন পাইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ যদ্
দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও বুদ্ধিতত্ত্ব নামক দশাধিক আবরণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, মূল প্রকৃতি, পুরুষ, পরমপদ, এবং পরাৎপর ব্রহ্ম, এ সমস্তই তোমার শক্তিসম্ভার ॥ ১৭ ॥

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচিঃ
মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ ॥ ১৮ ॥

তুমি স্বভাবতঃ ক্রোধজিৎ, দানশীল, গুণবান, সরল পবিত্র, শান্ত, দয়ালু, মাধুর্য্যপূর্ণ ধীর, সমদর্শী, কর্ম্মপারগ, কৃতজ্ঞ, এবং সমস্ত সদ্গুণামৃতের সাগর ॥ ১৮ ॥

উপর্য্যুপর্য্যব্জভুবোঽপি পূরুষান্
প্রকল্প্য তে যে শতমিত্যনুক্রমাৎ।
গিরস্ত্বদেকৈকগুণাবধীপ্সয়া
সদাস্থিতা নোদ্যমতোঽতিশেরতে ॥ ১৯ ॥

যে সকল বেদবাক্য পদ্মযোনি ব্রহ্মাপেক্ষা শতগুণে অধিক, তদপেক্ষা শত গুণে অধিক, এই ক্রমে অসংখ্য পুরুষসমূহ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহারা তোমার এক একটী গুণের সীমা নির্ণয় করিবার জন্যই সর্ব্বদা নিযুক্ত। তাহাদের এ উদ্যম কখন শেষ হইবার নয় ॥ ১৯ ॥

ত্বদাশ্রিতানাং জগদুদ্ভবস্থিতি-
প্রণাশসংসারবিমোচনাদয়ঃ।
ভবন্তি লীলাবিধয়শ্চ বৈদিকা-
স্ত্বদীয়গম্ভীরমনোঽনুসারিণঃ ॥ ২০ ॥

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জন্মমরণাদির হস্ত হইতে মুক্তি প্রভৃতি ভক্ত-

গণের চিত্তে তোমার দুর্বোধ্য ইচ্ছাস্বরূপ, বেদমার্গানুসারী লীলারূপে প্রতিভাত হয়॥ ২০॥

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥ ২১॥

বাক্য মনের অতীত পুরুষকে বার বার নমস্কার, বাক্য মনের একমাত্র আধারকে বার বার নমস্কার। অনন্ত, অচিন্ত্য প্রভাবশালীকে বারবার নমস্কার, অপার করুণার একমাত্র সমুদ্রকে বার বার নমস্কার॥ ২১॥

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥ ২২॥

আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা নই, আত্মজ্ঞ নই, কিম্বা তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত নই। আমার কিছুই নাই, তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। অতএব তোমার শরণাগতরক্ষক পদতলে আশ্রয় লইলাম॥ ২২॥

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে॥ ২৩॥

হে মুকুন্দ! পৃথিবীতে এমন কোন নিন্দিত কর্ম্ম নাই, সহস্র সহস্র বার যাহার অনুষ্ঠান না করিয়াছি, এক্ষণে তাহার বিষময় ফলভোগ কালে, নিরুপায় হইয়া তোমার সম্মুখে ক্রন্দন করিতেছি॥ ২৩॥

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তঃ-
চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীং
অনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ২৪॥

অনন্ত সংসারসাগরে বহুকাল ধরিয়া ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তোমাকে কূল-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন্, তাহাতে তুমিও এক্ষণে দয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ২৪॥

সরলরেখায় চলিয়া উন্নতি করিতেছি, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বন্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্দ্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে। অবশ্যই ইহা এইরূপই হইবে—তবে হয়ত পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারে। এই কারণেই আমি সর্ব্বদাই প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের মতই ধরিয়া থাকি—যখন দেখি, কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল, সকলেই বলিতেছেন—এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা সকলে পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খুব জোর, উহা সেই সত্যের একটী ভয়ানক বিসদৃশ অনুকৃতি—ছায়ামাত্র। সকল অজ্ঞান ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য দৌড়িতেছে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া কেবল আহার পানে মত্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই সকল সুখকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্ম্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ মত সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ে মৃত্যু বিদ্যমান। আমাদিগকে মৃত্যু অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কখন সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের প্রতি অংশই ত্যাগ। আমরা জীবনের সেই সেই মুহূর্ত্তই বাস্তবিক সাধুভাবাপন্ন হই ও প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করি, যে যে মুহূর্ত্ত আমরা 'আমি'র চিন্তা হইতে বিরত হই। 'আমি'র তখন বিনাশ হয়—আমাদের ভিতরের 'প্রাচীন মনুষ্যের' মৃত্যু হয়, তখনই আমরা সত্যে উপনীত হই। আর বেদান্ত বলেন—সেই সত্যই ঈশ্বর—তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তিনি সর্ব্বদাই তোমাতে এবং তোমার সহিত আছেন। তাঁহাতেই সর্ব্বদা বাস কর। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে। তখন তুমি দেখিবে, ইহাই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃত্যু। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের সমুদয় জীবনকে কেবল শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে।

আত্মার মুক্তস্বভাব।

আমরা পূর্ব্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা,—আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিব,—সেই ছান্দোগ্য রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন—অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অনাবশ্যকীয় বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্‌টিতে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্দ্ধাংশের উপর এখনও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি পাঠে একটী মহৎ লাভ হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ্‌গুলিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি সমুদয় একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত—উদাহরণ স্থলে আমরা ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিতে পারি, উহাকে আমরা সর্ব্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরিতে পারি, উহাতে কর্ম্মকাণ্ডের লেশমাত্র নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন না কোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটী তোড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐ সকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাও না, আর অনেকে ইহা বেদ পাঠের একটী বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বাস্তবিকও কথা তাহাই কারণ, বেদকে লোকে এরূপ পবিত্রতার চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিতর যেরূপ নানাবিধ গোঁজামিল চলিয়াছে, বেদে তাহা হইতে পায় নাই। বেদে খুব উচ্চতম চিন্তা আবার অতি নিম্নতম চিন্তার সমাবেশ—সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্য খুঁটিনাটি, সকলই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয় সমূহ হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন ভাব সকল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন—সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু মূল যেমন তেমনিই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা

জানি লোকের চিন্তাশক্তি যেমন উন্নত হইতে থাকে, ততই লোকে ধর্ম্ম সকলের পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন উচ্চভাবের সংযোজন করিতে থাকে। এখানে একটী, ওখানে একটী নূতন কথা বসান হয়—কোথাও বা এক আধটী কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তার পর টীকাকারেরা ত আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখনই করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা আদতেই ধরা যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি—দেখিতে পাই, কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থূল আধিভৌতিক ধারণা সকল হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণা সকলের বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিরূপে বেদান্তে উহাদের চরম পরিণতি। অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে বড় বেশী নাই। ইহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ কেবল কতকগুলি ঘটনা স্মরণে রাখিবার উপায় স্বরূপ যেন লিখিতেছেন—তাঁহাদের যেন ধারণা—এ সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুস্কিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারি না। কারণ এই, যাঁহাদিগের সময়ের লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত নাই—আর যা একটু আধটু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি, তাহারা তখন উচ্ছ্বাসাত্মক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন আমরা পাশ্চাত্য জাতির রাজনৈতিক উন্নতির বিষয়ে একটী বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোন প্রকার অনিয়ন্ত্রিত শাসন সহ্য করিতে পারে না, তাহারা কোন প্রকার বন্ধন—কেহ তাহাদের উপর শাসন করিতেছে, ইহা সহ্য করিতেই পারে না, তাহারা যেমন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারনা লাভ করিতেছে, বাহ্য স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে দর্শনেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; তবে এ আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা—এই মাত্র প্রভেদ। বহু দেববাদ হইতে ক্রমশঃ লোকে একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসন-

কর্ত্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের অসহ্য হইল, তাহা নহে, একজনও তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও তাঁহাদের অসহ্য হইল। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে গিয়া এইটীই আমাদের প্রথমে দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। এই ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে উহার চরম পরিণতি হইয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদেই অবশেষে আমরা এই পরিণতি দেখিতে পাই। তাহা এই যে জগদীশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করণ। ঈশ্বরের সগুণ ধারণা গিয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর তখন জগতের শাসনকর্ত্তা একজন ব্যক্তি থাকেন না—তিনি তখন আর একজন অনন্তগুণসম্পন্ন মনুষ্যধর্ম্মাবিশিষ্ট নন, তিনি তখন ভাবমাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন; আমাদিগের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণা হইতে নির্গুণ ধারণায় পঁহুছান গেল, তখন মানুষও আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের সগুণত্বও উড়িয়া গেল—মানুষও একটী তত্ত্ব মাত্র। সগুণ ব্যক্তি বহির্দ্দেশে বিরাজিত—প্রকৃততত্ত্ব অন্তর্দ্দেশে—পশ্চাতে। এইরূপে উভয় দিক হইতেই ক্রমশঃ সগুণত্ব চলিয়া যাইতে থাকে, এবং নির্গুণত্বের আবির্ভাব হইতে থাকে। সগুণ ঈশ্বরের ক্রমশঃ নির্গুণ ধারণা—এবং সগুণ মানবেরও নির্গুণ মানুষভাব আসিতে থাকে। তখন এই দুই দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত দুইটী ধারার ক্রমশঃ বর্ণনা পাওয়া যায়। আর উপনিষদ্ এই দুইটী ধারা যে যে ক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মিলিয়া যায়, তাহার বর্ণনাতে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ কথা—তত্ত্বমসি। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই কেবল আছেন, আর সেই পরমতত্ত্বই এই বহুধাজগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিষদের কার্য্য এইখানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিচার দার্শনিকদিগের জন্য রহিল। স্বভাবতঃই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। যদিই স্বীকার করা যায় যে, এক নির্গুণতত্ত্বই পরিদৃশ্যমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসা—এক কেন বহু হইল; এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মানুষের অমার্জ্জিত বুদ্ধিতে স্থূলভাবে উদয় হয়—জগতে দুঃখ অশুভ রহিয়াছে কেন? সেই প্রশ্নটীই স্থূলভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মমূর্ত্তি

পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি, ঐন্দ্রিয়িক দৃষ্টি হইতে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে ঐ প্রশ্নের বিচার। কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল? আর উহার উত্তর—সর্ব্বোত্তম উত্তর ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ—বাস্তবিক উহা বহু হয় হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব কেবল আপাত প্রতীয়মানমাত্র, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নির্গুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত নির্গুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আইসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এমত স্বীকার করেন নাই। দ্বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদ—ঐ মত বড় উন্নত বা মার্জ্জিত নহে। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না—তাঁহারা ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারই অধিকার নাই—কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমাদিগকে শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সমুদয়ই পূর্ব্ব হইতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি সুখ দুঃখ ভোগ করিব, সবই পূর্ব্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে; আমাদের কর্ত্তব্য—ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরো অধিক কষ্ট পাইব মাত্র। কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে? বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তাঁহাদের মত সম্মত বেদের অর্থও আছে; তাঁহারা সেইগুলিই প্রমাণ বলিয়া সকলকে তাহা মানিতে বলেন এবং তদনুসারে চলিতে উপদেশ দেন।

আর কতকগুলি দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মায়াবাদী ও দ্বৈতবাদিগণের মাঝামাঝি। তাঁহারা পরিণামবাদী। তাঁহারা বলেন, জীবাত্মার উন্নতি ও অবনতিই—বিভিন্ন পরিণামই—জগতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাঁহারা রূপকভাবে বর্ণন করেন, সকল আত্মাই একবার

সঙ্কোচ, আবার বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সমুদয় জগতই যেন ভগবানের শরীর। ঈশ্বর সমুদয় প্রকৃতির এবং সকল আত্মার আত্মা স্বরূপ। সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ—কিছু কাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই সঙ্কোচের কারণ অসংকর্ম্ম। মানুষ অসংকার্য্য করিলে তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন্ না সে আবার সংকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে। ভারতীয় এই সকল বিভিন্ন প্রণালীতে এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে, জগতের সকল প্রণালীতেই একটী সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি উহাকে 'মানুষের দেবত্ব' বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম নামের উপযুক্ত এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহা কোন না কোন রূপে—পৌরাণিক বা রূপক ভাবে হউক, অথবা দর্শনের মার্জ্জিত সুস্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব প্রকাশ না করেন যে, জীবাত্মা, যাহাই হউক, অথবা ঈশ্বরের সহিত উহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উহা স্বরূপতঃ শুদ্ধ স্বভাব ও পূর্ণ। ইহা তাহার প্রকৃতিগত—পূর্ণানন্দ ও ঐশ্বর্য্য তাহার প্রকৃতি—দুঃখ বা অনৈশ্বর্য্য নহে। এই দুঃখ কোনরূপে তাঁহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জ্জিত মত সকলে এই অশুভের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া শয়তান বা আহিমান এই অশুভ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অশুভের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে। অন্যান্য মতে একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকে বা দুঃখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মায়াবাদ প্রভৃতি দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটী বিষয় সকলগুলিতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্ত স্বভাব। এই সকল দার্শনিক মত ও প্রণালীগুলি কেবল মনের ব্যায়াম—বুদ্ধির চালনা মাত্র। একটী মহৎ উজ্জ্বল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার রাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব।

বেদান্ত বলেন, অন্য যাহা কিছু, তাহা উঁহার উপাধি স্বরূপ মাত্র। কিছু যেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবস্বভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতিশয় সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিতেও তেমনি

উহা বর্ত্তমান। ঐ দেব স্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবে উহার কার্য্য হইতে থাকিবে। আমাদিগকে উহাকে আহ্বান করিতে হইবে, তবে উহা প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমকি প্রস্তরে অগ্নি বাস করে, সেই অগ্নিকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্যক। অগ্নি দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে বাস করে; ঘর্ষণ আবশ্যক কেবল উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য। অতএব এই অগ্নি, এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে, কারণ, গুণ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, সুতরাং উহারা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্ত স্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সৎ চিৎ আনন্দ আত্মার স্বভাব, আত্মার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার স্বরূপ, আর আমরা যে সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, তাহারা আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—উহা কখন বা আপনাকে মৃদু, কখন বা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার প্রকাশ মাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি, সকলই সেই একত্বের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এইরূপ, জ্ঞানও, উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরূপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিতের, সেই জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পাদদেশের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞানে এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। এই কারণে বৈদান্তিক মনীষীগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে সকল সুখভোগ করি, এমন কি, অতি ঘৃণিত আনন্দ পর্য্যন্ত, আত্মার স্বরূপভূত সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ মাত্র।

এই ভাবটীই বেদান্তের সর্ব্ব প্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয়, আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্ম্মেরই এই মত, আমি এমন কোন ধর্ম্মের কথা জানি না, যাহার মূলে এই মত নাই। সকল ধর্ম্মের ভিতরই এই সার্ব্বভৌমিক ভাব রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কথা ধর:—উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্র স্বভাব ছিলেন, অবশেষে তাঁহার অসৎ কার্য্যের দ্বারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপক বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয় যে, ঐ গ্রন্থলেখক আদিম মানবের (অথবা তাঁহারা উহা যেরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকুন না কেন) অথবা প্রকৃত

মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে সকল দুর্ব্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি, তাহারা উহার উপর পতিত আবরণ বা উপাধি মাত্র, এবং সেই ধর্ম্মেরই পরবর্ত্তী ইতিহাস ইহা দেখাইতেছে, তাঁহারা সেই পূর্ব্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভবনীয়তা, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন। প্রাচীন ও নব সংহিতা লইয়া সমগ্র বাইবেলের এই ইতিহাস। মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারাও আদম এবং আদমের জন্মপবিত্রতায় বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা এই, মহম্মদের আগমনের পর হইতে সেই লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই, তাঁহারাও নির্ব্বাণনামক অবস্থা বিশেষে বিশ্বাসী; উহা এই দ্বৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্ব্বাণ অবস্থাও ঠিক তাহাই, আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম্ম এই, সেই বিনষ্ট নির্ব্বাণ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্ম্মেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, যাহা তোমার নয়, তাহা তুমি কখন পাইতে পার না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নহ। তুমি তোমার নিজের জন্মপ্রাপ্ত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য্য এই ভাবটী তাঁহার নিজকৃত কোন গ্রন্থের নাম প্রদানচ্ছলে বড় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'স্বারাজ্য সিদ্ধি' অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃ প্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমাদিগকেই উহা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ কেবল আমাদের ভ্রমমাত্র। তোমার রাজ্যনাশ হয় নাই—ইহাই কেবল প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্ম্ম প্রণালীই এই এক বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা ইহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা অর্চ্চনা করিলে ও নিজে কোন বিশেষ নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। অপর কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি প্রকৃতির অতীত পুরুষের সম্মুখে আপনাকে পাতিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে। অপর কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি ঐরূপ পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসিতে পার, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। উপনিষদে এই

(সেই) অর্থ বোধ হয় না; এই জন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণ সকল প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট। যেমন,—বৃক্ষ ঋক্ষ কাণ্ডীর আণ্ডীর ইত্যাদি। এই সকল স্থলে, বৃক্ষ শব্দের বকারের সহিত এক অর্থ হয় অর্থাৎ গাছকে বুঝায়; কিন্তু ব কারের অভাব হইয়া 'ঋক্ষ' হইলে, আর সেই অর্থ অর্থাৎ গাছকে বুঝায় না। এইরূপ,'কাণ্ডীর' এই শব্দের ক কারের সহিত কোনও একটী অর্থ অর্থাৎ শরধারী পুরুষকে বুঝায়; কিন্তু ক কারের অভাব হইয়া 'আণ্ডীর' হইলে আর সেই অর্থ অর্থাৎ বাণধারীকে বুঝাইবে না।

ভাষ্যমূল—কিং তর্হ্যুচ্যতেঽনর্থগতেরিতি ন হ্যপায়োপজনাভ্যামর্থস্য গতির্ভবতি। এবং তর্হীদং পঠিতব্যং স্যাদ্ বর্ণানুপলব্ধৌ চাতদর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ"; এই বার্ত্তিকে, 'অনর্থ গতেঃ', এই শব্দের দ্বারা কি তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, একবারে কোনও অর্থেরই প্রতীতি হইবে না; এবং সেই হেতুই বর্ণসমূহ অর্থবিশিষ্ট বলিতে হইবে?

তাহা নহে। কেননা, এস্থলে—"অর্থের+গতি=অর্থগতি" এইরূপ ষষ্ঠী তৎ-পুরুষ সমাস, কদাপি সাধনায় হইবে না। তবে এখানে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে যে, একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, সেই শব্দের আর সেই অর্থ বোধগম্য হইবে না অর্থাৎ অন্য অর্থ বোধ হইবে।

ভাষ্যমূল—কিমিদমতদর্থগতেরিতি। তস্যার্থস্তদর্থঃ তদর্থস্য গতিস্তদর্থগতিঃ ন তদর্থগতিরতদর্থগতিরতদর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, তবে 'অতদর্থগতেঃ' এখানে কিরূপ সমাস হইবে?

"তাহার+অর্থ=তদর্থ, তদর্থের+গতি (বোধ)=তদর্থগতি, ন+তদর্থগতি =অতদর্থগতি, অতদর্থগতির।" এইরূপ সমাস করিব। "তাহা হইলেই কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, সেই শব্দের সেই অর্থই মাত্র বোধ হইবে না, কিন্তু অর্থান্তর বোধ হইবে;" এইরূপ অর্থ হইবে।

ভাষ্যমূল—অথবা সোঽর্থস্তদর্থস্তদর্থস্য গতিস্তদর্থগতির্ন তদর্থগতিরতদর্থগতির-তদর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—অথবা এইরূপ সমাস করিব যে, "সেই যে+অর্থ=তদর্থ,

তদর্থের + গতি = তদর্থগতি, ন + তদর্থগতি = অতদর্থগতি ; তাহার = অতদর্থগতির" ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল— স তর্হি তদা নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন কর্ত্তব্যঃ। উত্তরপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা— উষ্ট্রমুখমিব মুখমস্য উষ্ট্রমুখঃ। খরমুখঃ। এবমতদর্থগতেরনর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বার্ত্তিকের এরূপ অর্থই হয়, তবে বার্ত্তিককারের সেইটী নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য? না, তাহা কর্ত্তব্য নহে। তবে উত্তরপদলোপবাচক সমাস, এই থানে দেখিতে হইবে। যেমন ;—উষ্ট্রের মুখের ন্যায় মুখ ইহার = উষ্ট্রমুখ। খরের (গাধার) মুখের ন্যায় মুখ ইহার = খরমুখ। এই সকল স্থলে যেমন, *উত্তরপদলোপী সমাস হইয়াছে, সেইরূপ এই স্থলেও, সেই অর্থের গতি (বোধ) হয় না, এই উদ্দেশ্যে অনর্থগতি, সেই হেতু "অনর্থগতেঃ" (হেত্বর্থে পঞ্চমী) এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

মন্তব্য— 'বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ," এই বার্ত্তিকে, 'অনর্থগতি' শব্দের, 'কোনও অর্থই বোধ হয় না,' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, এই দোষ হইবে যে, 'বৃক্ষ' শব্দের 'ব' কার অভাব হইয়া, 'ঋক্ষ' শব্দ হইলে, সেই 'ঋক্ষ' শব্দে, ভল্লুক বা নক্ষত্রকে বুঝায় কিরূপে? এই শঙ্কা নিবারণের জন্যই 'অনর্থগতি' শব্দের পূর্ব্বোক্ত রূপ সমাস ও বিগ্রহ বাক্য করা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্—সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চ*।

বার্ত্তিকানুবাদ—সংঘাত অর্থাৎ একত্র মিলিত শব্দের অর্থবত্ত্বা হেতুও আমরা মনে করি যে, বর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট।

ভাষ্যমূলম্—সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চ মন্যামহেঽর্থবন্তো বর্ণা ইতি।

যেষাং সংঘাতা অর্থবন্তোঽবয়বা অপি তেষামর্থবন্তঃ। যেষাং সমুদায়া অর্থবন্তঃ সমুদায়া অপি তেষামর্থবন্তঃ। তদ্যথা। একশ্চক্ষুষ্মান্দর্শনে সমর্থঃ তৎসমুদায়শ্চ শতমপি সমর্থম্। একশ্চ তিলস্তৈলদানে সমর্থঃ তৎসমুদায়শ্চ খার্য্যপি তৈলদানে সমর্থা।

ভাষ্যানুবাদ।—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসমূহ একত্র মিলিত হইলে, সেই একত্র মিলিত শব্দ, অর্থবিশিষ্ট হয় বলিয়াও আমরা মনে করি যে, বর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট। কারণ, যাহারা একত্র মিলিত হইলে অর্থবিশিষ্ট হয়, তাহাদের অবয়ব সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপেও অর্থবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আবার যাহাদের একটী একটী অবয়ব (বর্ণ) পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট, তাহারা

(সেই সকল বর্ণ) একত্র মিলিত হইলে অর্থবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ;—একজন চক্ষুষ্মান্ লোক যদি দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তবে সমুদয় চক্ষুষ্মান্ লোক, এমন কি, একশত চক্ষুষ্মান্ লোকও দর্শনে সমর্থ হইবে। একটী তিল যদি তৈলপ্রদানে সমর্থ হয়, তবে সমুদায় তিল, এমন কি, এক খারী তিলও তৈলপ্রদানে সমর্থ হইবে।

ভাষ্যমূলম্—যেষাং পুনরবয়বা অনর্থকাঃ সমুদায়া অপি তেষামনর্থকাঃ। তদ্যথা ;—একোঽন্ধো দর্শনেঽসমর্থস্তৎসমুদায়শ্চ শতমপ্যসমর্থম্। একা চ সিকতা তৈলদানেঽসমর্থা তৎসমুদায়শ্চ খারী শতমপ্যসমর্থম্।

ভাষ্যানুবাদ।—পক্ষান্তরে, যে সকল শব্দের অবয়ব (বর্ণ) সমূহ অর্থশূন্য, তাহাদের সমুদায় অর্থাৎ অর্থহীন বর্ণসমূহ মিলিত হইয়া যে শব্দটী হইবে, সেই সকলই অনর্থক হইবে। যেমন ; একজন অন্ধ দর্শনে অসমর্থ হইলে, সেইরূপ সমুদায়, এমন কি, শত শত অন্ধও দর্শনে অসমর্থ হইয়া থাকে। একটী বালুকা তৈল প্রদানে অসমর্থ হইলে,সেইরূপ সমুদায়, এমন কি, শত শত খারী বালুকাও তৈল প্রদানে অসমর্থ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্—যদি তর্হীমে বর্ণা অর্থবন্তঃ অর্থবৎ কৃতানি প্রাপ্নুবন্তি। কানি। অর্থবৎ প্রাতিপদিকমিতি প্রাতিপদিকসংজ্ঞা প্রাতিপদিকাদি স্বাদ্যুৎপত্তিঃ। সুবন্তং পদমিতি পদসংজ্ঞা।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল বর্ণ যদি প্রত্যেকে অর্থবিশিষ্টই হয়, তবে অর্থবিশিষ্ট শব্দের উত্তর যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্মও প্রাপ্তি হউক।

সেই সকল কর্ম্ম কি ?

অর্থবিশিষ্ট শব্দ, প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবিশিষ্ট (১) হইয়া থাকে, অতএব প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবিশিষ্ট হইবে। আবার প্রাতিপদিক হইলেই সেই প্রাতিপদিক হইতে সু, ঔ, জশ্ প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে বলিয়া, স্বাদি বিভক্তির উৎপত্তি হইবে। 'সু' আদি বিভক্তির উৎপত্তি হইলেই, সু, ঔ

(১) অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ ।১।২।৪৫। (ধাতু প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন, অর্থবিশিষ্ট শব্দের প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়।) যেমন,—'রাম' শব্দ প্রাতিপদিক হইয়াছে। আবার প্রাতিপদিক কখনও বিভক্তি শূন্য থাকে না ; এইজন্য, প্রাতিপদিক হইলেই তাহার উত্তরভাগে,'সু, ঔ, জশ্,' প্রভৃতি বিভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং রামঃ, রামৌ, রামাঃ প্রভৃতি পদ হইতে থাকে।

জশ্ প্রভৃতি অন্তে আছে যার তাহার পদসংজ্ঞা হয় বলিয়া, পদসংজ্ঞা হইবে। (১)

ভাষ্যমূলম্ অত্র কো দোষঃ। পদস্যেতি ন লোপাদীনি প্রাপ্নুবন্তি। ধনং বনমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—হইলই বা প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ রূপে পদসংজ্ঞা, তাহাতে দোষ কি?

প্রত্যেক বর্ণেরই পদসংজ্ঞা হইলে, এই দোষ হইবে যে, পদের অন্তস্থিত ন কারের লোপ হয় (২) বলিয়া, ন লোপ প্রভৃতি যে যে কার্য্য পদের উত্তর হইয়া থাকে। সেই সকল কার্য্যই প্রাপ্তি হইবে। অতএব, 'ধনং, বনম্' ইত্যাদি স্থলেও ধ্ ন্ অ ম্, ব্ ন অ ম্, ইত্যাদি প্রত্যেকটীর পদসংজ্ঞা হওয়াতে, 'ন' কারও পদসংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঐ 'ন' কারের লোপই হইবে। 'ধনম্,' 'বনম্' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য বলিব যে, বর্ণ সকল অর্থ বিশিষ্ট নহে? এই দোষনিবারণ, নিম্ন বার্ত্তিকানুসারে হইবে।

বার্ত্তিকমূলং—সংঘাতস্যৈকার্থ্যাৎসুবভাবো বর্ণাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—একত্র মিলিত বর্ণসমূহেরও একই অর্থ বোধ হয় বলিয়া, একটী একটী বর্ণের উত্তর আর পৃথক্ পৃথক্ রূপে 'সুপ্' উৎপত্তি হইবে না। *।

ভাষ্যমূলম্ সংঘাতস্যৈকত্বমর্থঃ। তেন বর্ণাৎসুবোৎপত্তির্ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বর্ণসমূহের পৃথক্ পৃথক্ আংশিক অর্থ থাকিলেও একত্র মিলিত হইলে, একটী অর্থ বোধ হয়; এইজন্যই বর্ণের উত্তর আর সু, ঔ, জশ্,

(১) সুপ্তিঙন্তং পদম্।১।৪।১৪। 'সুপ্' এবং 'তিঙ্,' অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদের 'পদ' সংজ্ঞা হয়। সু, ঔ, জশ্। অম্, ঔট্, শস্। টা, ভ্যাম্, ভিস্। ঙে, ভ্যাম্, ভ্যস্। ঙসি, ভ্যাম্, ভ্যস্। ঙস্, ওস, আম্, ঙি, ওস্, সুপ্। ইহাদের প্রথম শব্দ 'সু' এবং অন্ত্য বর্ণ 'প্' এই আদি অন্ত্য মিলিয়া 'সুপ্,' প্রত্যাহার হয়।

তিপ্, তস্, ঝি। সিপ্, থস্, থ। মিপ্, বস্, মস্। ত, আতাম্, ঝ। থাস, আথাম্, ধ্বম্। ইট্, বহি, মহিঙ্। ইহাদের আদি অক্ষর 'তি' এবং অন্ত্যবর্ণ 'ঙ্,' এই আদি অন্ত্য বর্ণ মিলিয়া 'তিঙ্' প্রত্যাহার হয়।

(২) নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য।৮।২।৭। প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবিশিষ্ট যে পদ তাহার অন্তস্থিত ন কারের লোপ হয়।

প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি হ বে না। সুতরাং পদসংজ্ঞাও হইবে না, ন-লো-পাদিও হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনর্থকাস্তু প্রতিবর্ণমর্থানুপলব্ধেঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রত্যেক বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ বোধ হয় না বলিয়া, বর্ণসমূহ স্বতন্ত্র রূপে অর্থহীন জানিবে। *।

ভাষ্যমূলম্।—অনর্থকাস্তু বর্ণাঃ। কুতঃ? প্রতিবর্ণমর্থানুপলব্ধেঃ। ন হি প্রতিবর্ণমর্থা উপলভ্যন্তে। কিমিদং প্রতিবর্ণমিতি। বর্ণং বর্ণং প্রতিবর্ণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে প্রমাণিত হইল যে, বর্ণসমূহ অর্থবিশিষ্ট; এক্ষণে পুনঃ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, "বর্ণসমূহ অর্থশূন্য"।

কেন?

প্রত্যেক বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোন অর্থই প্রতীতি হয় না বলিয়া।

প্রত্যেক বর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোনও অর্থ প্রতীতি করাইতে পারে না।

এই যে 'প্রতিবর্ণ' শব্দ প্রয়োগ করিলে, এই প্রতিবর্ণ কাহাকে বলে?

বর্ণ বর্ণ প্রতিবর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেকটী বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিবর্ণ বলে।

বার্ত্তিকমূলম্—বর্ণব্যত্যয়াপায়োপজনবিকারেষর্থদর্শনাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কোনও শব্দ হইতে কোনও বর্ণের ব্যতিক্রম, লোপ, আগম, অথবা বিকার প্রাপ্ত হইলে ও সেই অর্থ দর্শন হেতু, বর্ণসমূহ অর্থহীন। *।

ভাষ্যমূলম্—বর্ণব্যত্যয়াপায়োপজনবিকারেষর্থদর্শনান্মন্যামহেঽনর্থকা বর্ণা ইতি। বর্ণব্যত্যয়ে। কৃতেস্তর্কঃ। কসেঃ সিকতাঃ। হিংসেঃ সিংহঃ। বর্ণব্যত্যয়ো-নার্থব্যত্যয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—কোনও শব্দ হইতে, বর্ণসমূহ ব্যতিক্রম (পরিবর্ত্তন হইলে, কোনও বর্ণ লোপ হইলে, কোনও বর্ণের আগম হইলে অথবা কোনও বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও সেই শব্দের সেই অর্থই দেখা যায়; এই জন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহের পৃথক্ কোন অর্থ নাই।

বর্ণের ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইলেও যে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত যথা;—কৃত শব্দের স্বাভাবিক যে অর্থ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া 'তর্ক' শব্দ হইলেও অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। 'কৃত' শব্দেরও যে অর্থ

ছিল, 'তর্ক' শব্দও সেই অর্থেই রহিয়াছে। এইরূপ 'কসি' শব্দের স্থানেও 'সিকতা' শব্দ হইয়াও বালুকা অর্থ পরিত্যাগ করে নাই; এবং 'হিংস' শব্দেরও স্থানে, 'সিংহ' আদেশ হইয়া তাহার হিংসা অর্থটী পরিত্যাগ হয় নাই। এই সকল স্থলে বর্ণব্যত্যয় হইয়াও অর্থব্যত্যয় হয় নাই, অতএব বর্ণসকল স্বতন্ত্র অর্থবিশিষ্ট নহে।

ভাষ্যমূলম্—অপায়োলোপঃ। ঘ্নতঃ ঘ্নন্তি ঘ্নন্তু অঘ্নন্। বর্ণাপায়ো নার্থাপায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—কোন বর্ণ লোপ হইলে অর্থলোপ হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত—অপায় অর্থে লোপ বুঝায়। 'হন্' (হিংসা ও গতি অর্থ বিশিষ্ট ধাতু) ধাতুর 'ন্' কার লোপ হইয়া 'ঘ্নতঃ' এবং 'অ' কার লোপ হইয়া 'ঘ্নন্তি,' 'ঘ্নন্তু,' 'অঘ্নন্' হইয়াছে; কিন্তু সেই হিংসা এবং গতি অর্থই রহিয়াছে। এই সকল স্থলে, বর্ণের লোপ হইল; কিন্তু অর্থের লোপ হইল না।

ভাষ্যমূলম্—উপজন আগমঃ। লবিতা। লবিতুম্। বর্ণোপজনো নার্থোপজনঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—উপজন অর্থে আগমকে বুঝায়। লূঞ্ (লবন অর্থাৎ ছেদন-অর্থ-বাচক ধাতু) ধাতুর স্থানে গুণাদি আদেশ হইবার পর 'ইট্', অর্থাৎ 'ই' কারের আগম হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু 'ই'কারের আগম হইলেও ছেদন অর্থই রহিয়াছে। এই সকল স্থলে, বর্ণের আগম হইল, কিন্তু অর্থের আগম হইল না।

ভাষ্যমূলম্—বিকার আদেশঃ। ঘাতয়তি। ঘাতকঃ। বর্ণবিকারোনার্থবিকারঃ। যথৈব বর্ণব্যত্যয়াপায়োপজনাবিকারাভবন্তি তদ্বদর্থব্যত্যয়াপায়োপজনবিকারৈর্ভবিতব্যম্। ন চেৎ তদ্বৎ। অতোমন্যামহেঽনর্থকা বর্ণা ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বিকার অর্থে আদেশকে বুঝায়। 'হন্' (হিংসা ও গতি অর্থ বাচক ধাতু) ধাতুর স্থানে 'ঘাত' আদেশ হইয়া 'ঘাতয়তি' 'ঘাতকঃ' শব্দ হইয়াছে; কিন্তু 'হন্' ধাতুর, যে হিংসা ও গতি অর্থ ছিল, তাহার বিকৃতি হইয়া 'ঘাত' আদেশ হইলেও হিংসা এবং গতি অর্থই রহিয়াছে। এই সকল স্থলে বর্ণের বিকার হইল; কিন্তু অর্থের বিকার হইল না।

বর্ণসমূহ যদি প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ বিশিষ্ট হইত, তবে যেমন যেমন বর্ণের পরিবর্ত্তন, লোপ, আগম এবং বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন তেমন অর্থেরও পরিবর্ত্তন, লোপ, আগম ও বিকার হওয়া উচিত। অথচ এই

সকল স্থলে সেরূপ হয় নাই ; এ জন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহের পৃথক্ কোন অর্থ নাই।

ভাষ্যমূলম্—উভয়মিদং বর্ণেষূক্তম্। অর্থবন্তোঽনর্থকা ইতি চ। কিমত্র ন্যায্যম্। উভয়মিত্যাহ। কুতঃ। স্বভাবতঃ। তদ্যথা। সমানমীহমানানাং চাধীয়ানানাং কেচিদর্থৈর্যুজ্যন্তে অপরে ন। ন চেদানীং কশ্চিদর্থবানিতি কৃত্বা সর্ব্বৈরর্থবদ্ভিঃ শক্যং ভবিতুং কশ্চিদ্বানর্থক ইতি কৃত্বা সর্ব্বৈরনর্থকৈঃ। তত্র কিমস্মাভিঃ শক্যংকর্ত্তুম্।

ভাষ্যানুবাদ।—এই উভয় প্রকারই বর্ণসমূহে (পাণিনিপ্রভৃতিকর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছে। অর্থবিশিষ্ট এবং অর্থরহিত।

"এ কিরূপ উত্তর হইল," বর্ণসমূহ অর্থবানও বটে, নিরর্থকও বটে ; একটী বস্তু কি কখনও অর্থবিশিষ্ট এবং অর্থশূন্য, এরূপ বিপরীত হইতে পারে?" এইরূপ আশঙ্কায়ই প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, এই দুইটীর এ স্থলে কোন্‌টী ন্যায্য বলিয়া মানিতে হইবে, বর্ণসমূহ অর্থবিশিষ্ট, কি নিরর্থক ?

"উভয়ই হইবে," এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন ?

স্বভাবতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। যেমন ;—সমান চেষ্টাশীল বিদ্যার্থিগণের মধ্যে মাত্র কেহ কেহ অর্থযুক্ত হয় অর্থাৎ অর্থ বোধে সমর্থ হয় ; কিন্তু অপর কেহ অর্থাৎ তদতিরিক্ত বিদ্যার্থিগণ অর্থবোধে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে কোনও একজন বিদ্যার্থী, অর্থবোধে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া যে, সকলেই অর্থজ্ঞ বিদ্যার্থিগণের সমান হইতে সমর্থ হইবে অথবা কোনও বিদ্যার্থী অর্থবোধে অসমর্থ হইয়াছে বলিয়া যে, সকল বিদ্যার্থীগণই অর্থবোধে অসমর্থ হইবে, তাহা নহে। অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই এরূপ হইয়া থাকে ; আমরা তাহার কি করিতে সমর্থ ?

মন্তব্য।—ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই কোন কোন বর্ণ অর্থ বিশিষ্ট ; আবার কোন কোন বর্ণ অর্থশূন্য ; এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত নাই।

ভাষ্যমূলম্—যদ্ধাতুপ্রত্যয়প্রাতিপদিকনিপাতা একবর্ণা অর্থবন্তোঽতোঽন্যে ঽনর্থকা ইতি। স্বাভাবিকমেতৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু ; ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় ও নিপাত কেবল ইহারাই মাত্র, এক একটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট দেখা যায়, সেই

হেতুই বিশেষরূপে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা ভিন্ন সকল বর্ণই স্বয়ং অর্থশূন্য। ইহা বর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ভাষ্যমূলম্—কথং য এষ ভবতা বর্ণানামর্থবত্তায়াং হেতুরুপদিষ্টঃ। অর্থবন্তো বর্ণা ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেকবর্ণানামর্থদর্শনাদ্বর্ণব্যত্যয়ে চার্থান্তরগমনাদ্বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চেতি। সংঘাতান্তরাণ্যেবৈতান্যেবং জাতীয়কানি অর্থান্তরেষু বর্ত্তন্তে। কূপঃ সূপো যূপ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কিরূপে আপনি ইহা বর্ণসকলের অর্থবিশিষ্টত্বে হেতু দেখাইলেন যে, বর্ণ সকল অর্থবিশিষ্ট; কেননা, ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাতন, ইহাদের এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখা যায়; বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে, অর্থান্তর উপলব্ধি হয়; কোনও একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, সেই অর্থের উপলব্ধি না হইলে,সেই অর্থের উপলব্ধি হয় না এবং একত্র মিলিত বর্ণ সমূহ অর্থবিশিষ্ট হয়? তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পূর্ব্বে যে সকল কারণ দেখাইলেন, তাহাতে বর্ণ সকল অর্থবিশিষ্ট বলিয়া কিরূপে প্রমাণিত হইল? কারণ, সংঘাতান্তর অর্থাৎ বর্ণসমূহ একত্র মিলিত হইয়া যে, একটী শব্দান্তর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই উৎপন্ন শব্দান্তরটীই এইরূপ বিজাতীয় উৎপন্ন হইয়াছে যে, পূর্ব্ব শব্দ হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন;— কূপ, সূপ, যূপ ইত্যাদি,এই সকল স্থলে 'কূপ' শব্দের 'উপ' অংশ 'স' কারের সহিত মিলিত হইয়া 'সূপ' বা 'য' কারের সহিত মিলিত হইয়া যে 'যূপ' হইয়াছে তাহা নহে। ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ অর্থবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ শব্দ।

ভাষ্যমূলম্—যদি হি বর্ণব্যত্যয়কৃতমর্থান্তরগমনং স্যাদ্ ভূয়িষ্ঠঃ কূপার্থঃ সূপে স্যাৎসূপার্থশ্চ কূপে কূপার্থশ্চ যূপে যূপার্থশ্চ কূপে সূপার্থশ্চ যূপে যূপার্থশ্চ সূপে। যতস্তু খলু ন কিংচিৎ সূপস্য বা যূপে যূপস্য কূপে কূপস্য বা যূপে সূপস্য বা কূপে কূপস্য বা সূপে যূপস্য বা সূপে। অতো মন্যামহে সংঘাতান্তরাণ্যেতান্যেবং জাতীয়কান্যর্থান্তরেষু বর্ত্তন্ত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণ ব্যত্যয় করিলেই অর্থান্তর বোধ হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উপ শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, কূপার্থ সূপ শব্দে হইতে থাকিবে; সূপার্থ কূপ শব্দে; কূপার্থ যূপ শব্দে, যূপার্থ কূপ শব্দে, সূপার্থ যূপ শব্দে এবং যূপ শব্দের যে যজ্ঞীয়পশুবন্ধনকাষ্ঠরূপ অর্থ, তাহা সূপ শব্দেও নিবৃত্ত হইতে থাকিবে।

যেহেতু ইহা নিশ্চিত রূপে সত্য যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সূপের অর্থ যূপ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে কথোপকথন ও তাঁহাদের প্রতি উপদেশ। ৺বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ সাল। আজ রবিবার। ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংস দেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল, মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা ১টা ২টার সময় কালীবাটীতে পঁহুছিলেন। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ আহারান্তে ঘরে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মল্লিকাদি আরও কয়েক জন ভক্ত বসিয়াছিলেন।

রাসমণির কালীবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গনের পূর্ব্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। সারি সারি শিব মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্দ্ধ মণ্ডলাকার বারাণ্ডা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুর বাড়ীর পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদূরব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত—যেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন—ও পূর্ব্বে উদ্যানের প্রবেশদ্বারদ্বয় পর্য্যন্ত। পরমহংস দেবের ঘরের কোলে দু একটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ শ্বেত ও পদ্ম করবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে "পিটার জল মধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতেছেন" সে ছবি খানিও আছে। আর একটী বুদ্ধদেবের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তক্তপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে আসনে

উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্ত্তি এক দৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালের খরস্রোতে যেন সাগরসঙ্গমে পঁহুছিবার জন্য কত ব্যস্ত। পথে কেবল একবার মহাপুরুষের আরাম মন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক একটী পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত। বয়স ৬০,৬৫ হইবে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজ ভগবান রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহার কাছে কাশী-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন।

[জ্ঞানযোগ ও নির্ব্বাণ মত।]

মণিমল্লিক। আর একটী সাধুকে দেখিলাম। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর কর্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই। শম দম তিতিক্ষা এই সব চাই। এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা কর্‌ছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে। বলে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বল্‌ছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর কিছু থাকে না।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও জ্ঞানযোগ।]

পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিল, কিন্তু আমি মা, মা, কর্‌তুম, তবু আমায় খুব মান্‌তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না? শুন্‌লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা ক'য়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বল্লে, "ভক্তের সঙ্গ কর্‌বার কামনা ত্যাগ ক'রো, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত ক'র্‌বে।" বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে বিচার করেছিল, আমায় আবার

ব'ল্লে 'আপনি একটু শুনুন'। একটা সভায় বিচার হয়েছিল—শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে ব'ল্লে 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ শুনে আমায় একদিন ব'ল্লে 'ও সব ত্যাগ করেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটী, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।' আমি কি ব'ল্‌বো, ব'ল্লাম—কে জানে, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও অভিমান।]

একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মান্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁষ হ'য়ে রৈল। একটু হুঁষ হবার পর কা! কা! কা! এই শব্দ কেবল করতে লাগলো।

একজন ভক্ত। মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, তা'হলে এতো বাহিরের কাজ যা ক'চ্ছে সে সব কম প'ড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জান্‌তে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কারুর কারুর নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক দিন ক'র্‌তে ক'র্‌তে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ ক'র্‌ছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগ্‌নে বাপ মা এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত। *]

মাষ্টার। দয়াও কি একটা বন্ধন?

---

* "গুণত্রয়ব্যতিরিক্তম্"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। তমোগুণে সংহার, রজোগুণে সৃষ্টি, আর সত্ত্বগুণে পালন। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণের পার। তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।

"যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁহুছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন।

"একটী লোক বনের পথ দিয়া যা'চ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধ'র্‌লে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। তখন একজন চোর ব'ল্লে আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে। এই কথা ব'লে খাঁড়া দিয়ে কাট্‌তে এলো। তখন আর একজন চোর ব'ল্লে, নাহে কেটে কি হবে; একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে ব'ল্লে, 'আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই'। তখন তার বন্ধনটী খুলে দিয়ে সেই চোরটী ব'ল্লে 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, আমি তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি'। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে ব'ল্লে, 'এই রাস্তা ধ'রে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে'। তখন লোকটী চোরকে ব'ল্লে, 'ম'শাই আপনি আমার অনেক উপকার ক'রেছেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসুন'। চোর ব'ল্লে, 'না আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে'।

"সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কে'ড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ ক'র্‌তে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজোতমঃ থেকে জীবকে বাঁচায়। সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার-বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যা'বার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার নিজের বাড়ী দেখ, ঐ দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত অনেক দূরে।

"ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে কালাপানীতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

"চা'রজন বন্ধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখ্‌তে

পেলে। খুব উঁচু পাঁচীল। তখন ভিতরে কি আছে দেখ্‌বার জন্য সকলে বড় উৎসুক হ'ল। পাঁচীল বেয়ে একজন দেখ্‌তে উঠ্‌লো। উঁকি মেরে যা দেখ্‌লে, তাতে অবাক্‌ হ'য়ে "হা হা হা হা" বলে ভিতরে প'ড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যে উঠে সেই "হা হা হা হা" ক'রে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে?

"জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, এঁরা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারেন নাই; ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হ'লে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ ব'লেছে, 'আপনি যদি না পারিস্‌ মন, তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে'না'। মনের লয় হওয়া চাই, আবার "রামপ্রসাদে"র লয় অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র ক'রেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়াছেন। আবার কেউ কেউ বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত ব'ল্‌বেন, আরো কত লোক-শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' একটু রেখে দিয়েছিলেন।

[দল (সাম্প্রদায়িকতা) ও ব্রহ্মজ্ঞান ; কেশবচন্দ্র সেন]

একজন ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কি দলটল থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবসেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হ'চ্ছিল। কেশব ব'ল্লে আরও বলুন। আমি ব'ল্লুম, আর ব'ল্লে দলটা থাকে না। তখন কেশব ব'ল্লে, তবে আর থাক্‌ ম'শাই। (সকলের হাস্য।) তবু আমি কেশবসেনকে বল্লুম, 'আমি' 'আমার' এটী অজ্ঞান। 'আমি কর্ত্তা' আর 'আমার এই সব স্ত্রী পুত্র বিষয়, মান সম্ভ্রম', এভাব অজ্ঞান না হ'লে হয় না। তখন কেশবসেন ব'ল্লে, মহাশয় 'আমি' ত্যাগ ক'রলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি ব'ল্লুম, কেশব, আমি সব 'আমি' ত্যাগ কর্‌তে ব'লছিনা, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্ত্তা' 'আমার স্ত্রী পুত্র' 'আমি গুরু' এসব অভিমান, "কাঁচা আমি", এইটী ত্যাগ কর। এইটী ত্যাগ ক'রে "পাকা আমি" হ'য়ে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্ত্তা, তিনি কর্ত্তা।

[আদেশ ও ধর্ম্মপ্রচার।]

একজন ভক্ত।—"পাকা আমি" কি দল ক'র্‌তে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কেশবসেনকে বল্লুম, আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোক শিক্ষা দিচ্চি, এ "আমি" "কাঁচা আমি"। মতপ্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবত কথা ব'ল্‌তে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, তা হ'লে দোষ নাই। তাঁর 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, "পাকা আমি"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীযুত অমৃত, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য ইত্যাদি ব্রাহ্ম-ভক্তদের সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র। ইংরাজী ১৮৮৩ খৃঃ ২৯শে মার্চ্চ।

মধ্যাহ্নে ভোজনের পর ভগবান্ রামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন; দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা। চৈত্র মাসের গঙ্গা। বেলা ২টার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুত অমৃত ও মধুরকণ্ঠ শ্রীযুত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলা গুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কত কতবার মন হরণ করিয়াছেন।

রাখালের অসুখ হইয়াছে। এই কথা ভগবান্ রামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তদের বলিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখ, রাখালের অসুখ হইয়াছে। সোডা (Soda) খেলে কি ভাল হয় গা ? কি হবে বাপু ! (রাখালের প্রতি) রাখাল ! তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

'সমাধি মন্দিরে'।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ নারায়ণ বালকের দেহধারণ

ক'রে এসেছেন। একদিকে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ আত্মা বালক ভক্ত রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু, সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। পরমহংসদেব সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব।

ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির। গোবিন্দ নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার রামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন সব চলিয়া গিয়াছে। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে প'ড়িয়া রহিয়াছে। আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় ছেলের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি?

এই সময়ে একটী গেরুয়া কাপড়পরা অপরিচিত একটী বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—

গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গেরুয়াদৃষ্টে) আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পর্‌লেই হলো! (হাস্য)। একজন বলেছিল, "চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী"—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক্ বাজায় (সকলের হাস্য)।

"বৈরাগ্য তিন চার প্রকার আছে। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয় ত কর্ম্ম নাই,—গেরুয়া প'রে কাশী চলে গেল। তিনমাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটী কর্ম্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।' আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না, ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে, সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটী না হয়, তাহলে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে শাদাকাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্চে, আর বাহিরে গেরুয়া বড় ভয়ঙ্কর।

মিথ্যা ও নববৃন্দাবন নাটক।

এমন কি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গি'ছিলাম। কি একটা আনলে, ক্রস্ (Cross)। আবার জল ছড়াতে লাগ্‌লো, বলে—শান্তিজল! একজন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি কব্‌ছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। কু—বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ রাখায় দোষ হয়। মনধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ্ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখ্‌লে মিথ্যার রঙ্ ধরে যাবে।

• (শ্রীযুত কেশব সেন ও খোসামুদে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একদিন নিমাইসন্ন্যাস কেশবের বাড়ীতে দেখতে গি'ছিলাম। যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন কেশবকে বল্লে, 'কলির চৈতন্য হচ্চেন আপনি।' কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, 'তাহলে ইনি কি হলেন?' আমি বল্লাম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।' কেশবের লোক-মান্য হবার ইচ্ছা ছিল।

নিত্যসিদ্ধ ও রাগভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি)। নরেন্দ্র রাখাল টাখাল এই সব ছোক্‌রা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব—বসান শিব নয়।

"নিত্যসিদ্ধ একটা থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

"সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে, আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছী যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

"নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর বসে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয়রসের দিকে যায় না।

"সাধ্যসাধনা করে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান কর্‌তে হ'বে, এইরূপ পূজা করতে হবে, এ সব 'বিধিবাদীয়' ভক্তি। যেমন ধান হলে, মাঠ পার হতে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

"রাগভক্তি, প্রেমভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হলো।

"বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো।

"এই রাগভক্তি, এই অনুরাগ, ঈশ্বরে এই ভালবাসা না এলে তাঁহাকে লাভ হয় না।"

অমৃত। মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

(সমাধিতত্ত্ব ; সবিকল্প ও নির্বিকল্প।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনেছো, আরশুলা কুমুরে পোকা চিন্তা করে কুমুরে পোকা হয়ে যায়? কি রকম বোধ হয় জানো? যেমন হাঁড়ীর মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত। একটুও কি অহং থাকে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। যেমন সোণার একটু কণা সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। যেমন বড় আগুন, আর তার একটী ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাক্‌লে তবে আস্বাদন হয়।

"কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড় সমাধি', নির্ব্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা হয়, মুখে বলা যায় না। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিলো। একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারাকারিত'। তখন আর কে উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!"

কৃষিব্যাঙ্ক বা পল্লীভাণ্ডার।

[শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।] [৫৬০ পৃষ্ঠার পর।

কৃষিব্যাঙ্ক বা পল্লীভাণ্ডারের তহবিল হইতে যে কেবল নগদ মুদ্রাই কর্জ্জ দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। দেশে অনেক ক্ষেত্রজাত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক জিনিষ সদ্য বিক্রয় না করিয়া কৃষকগণ যদি তাহা হইতে অন্য কোন ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। ক্ষেত্রে ইক্ষু হইলে তাহা যদি সদ্য বিক্রয় করা না যায় এবং সেই ইক্ষু মাড়িয়া যথারীতি জ্বাল দিয়া গুড় ও দোলো প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হইতে পারে। যেখানে তুলা জন্মে, সেখানকার লোকেরা তাবৎ কার্পাস, গাছ হইতে উঠাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে; কিন্তু এরূপ না করিয়া যদি সেই সকল কার্পাসের খোলা বাছিয়া বীজ বাহির করিয়া পরিষ্কার করতঃ বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে সদ্যোজাত কার্পাস অপেক্ষা ইহার মূল্য অধিক হইবে। তাহা ব্যতীত উহার জন্য যে মজুরী খরচ হয়, তাহা দেশে থাকিয়া যায়, কত লোক প্রতিপালিত হয়। গ্রামের সন্নিকটে যত সর্ষপ জন্মে, তাহা চাষাগণ অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া ফেলে, কিন্তু ঘানিতে উহা ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিলে কতকটা মজুরী হিসাবে টাকাটা স্থানীয় লোকেরা পাইতে পারে, আর অবশিষ্ট খোলের অংশটা গরু-বাছুরে খাইতে পারে, জমিতে সার দিবার জন্য অপর লোকেও ক্রয় করিতে পারে। বৎসর মধ্যে কত সহস্র সহস্র টাকার বিলাতী জিনিষ সহর হইতে মফঃস্বলে বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়, আর সেই সকল জিনিষ বিক্রয় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের টাকা সহরে গিয়া পড়ে—এইরূপ অনেক রকমে পল্লীগ্রামের টাকা বাহিরে চলিয়া যায়, কাজেই স্থানীয় লোকের অর্থাভাব হয়, জন মজুরের কাজের অভাব হয়, কিন্তু চামার ও মুচীদিগকে যদি চামড়া ও সুতা প্রভৃতি সময়মত যোগান যায়, তাহা হইলে গ্রামের লোকে সেই সব সুলভমূল্যের জুতা ব্যবহার করিতে পারে, এবং অতিরিক্ত যাহা থাকে, তাহা অপর স্থানে প্রেরণ করিতে পারা যায়। অর্থাভাববশতঃ দরিদ্র প্রজাগণ সমধিক পরিমাণে বা উন্নত প্রণালীতে স্থানীয় অভাব বা রুচি-মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে অক্ষম। কৃষিভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষগণ মনে করিলে গ্রামের বা গ্রামসমষ্টির মধ্যে স্থানীয় অভাব ও উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণানুসারে

স্থানে স্থানে ছোটখাট কারখানা স্থাপন করিলে স্ব স্ব অর্থোপার্জ্জনের একটা বেশ নূতন পথ হয়। যে জেলায় সমধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মে, তথায় দুই পাঁচটা বরণ কোম্পানীর আক-মাড়া (Cane-crusher) কল অথবা বিহিয়ার মিল্‌নী (Mylne) কোম্পানীর গুড় তৈয়ারির কল রাখিলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। এই কল চাষীদিগকে রোজ হিসাবে ভাড়া দিয়া যেমন রোজগার হয়, আবার সেই চাষীদিগের নিকট হইতে ইক্ষু খরিদ করিয়া সেই কলে পিশিয়া যথানিয়মে জ্বাল দিয়া গুড় ও দোলো চিনি তৈয়ার করা যাইতে পারে। একটা মাখন তুলিবার কল রাখিয়া গ্রামের গোয়ালা ও গৃহস্থদিগের নিকট হইতে দুগ্ধ খরিদ করিয়া যথানিয়মে মাখন তৈয়ার করিয়া কত পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়! গরিব দুঃখী লোকে যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, তাহার সুতা মোটা এবং সে প্রকার সুতা স্থানীয় লোকের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া তন্তুবায়ের কারখানা করিলে মন্দলাভ হয় না। সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল জাতি আধুনিক সভ্যতালোক এখনও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা স্থানীয় কাপড়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাল কাপড় প্রস্তুত করাইতে হইলে বিলাতি সুতা বা বোম্বাই সুতা আনাইয়া তন্তুবায়দিগকে সরবরাহ করিতে পারিলে তাহাদিগের অবিরাম কাজ চলিতে পারে দুইপয়সা অধিক উপার্জ্জন হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে মহাজনও লাভবান হইতে পারেন। দেশের মধ্যে খুচরা কাজ অনেক পড়িয়া রহিয়াছে, কত নাম করিব? উহারই ভিতর হইতে বাচিয়া বিবেচনার সহিত কাজ করিলে অল্প মূলধনে অনেক কাজ করিতে পারা যায়। বিগত দুই বৎসর পূর্ব্বে আসামে যাইবার সময় অনেক আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—দুই এক থান এণ্ডি কাপড় পাঠাইতে। আসাম উহার জন্য প্রসিদ্ধ, সুতরাং সকলকেই আশা দিয়াছিলাম, উহা পাঠাইব বলিয়া,-- এবং নিজেও যথেষ্ট পরিমাণে আনিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু হরি---হরি! নামে তালপুকুর - ঘটী ডোবে না! ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ও গ্রামে ঘুরিয়া একবৎসর মধ্যে একটী থানও সন্ধান করিতে পারি নাই!! গৃহস্থ-লোকে যাহা প্রস্তুত করে, তাহা স্বীয় পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য; আর অর্থাভাববশতঃ যাহারা মহাজন মাড়োয়ারিদিগের দাদন লয়,তাহারাই দুই একটা থান মহাজনদিগকে দেয়, উহা সুতরাং সাধারণের জন্য নহে। এইত এণ্ডির ব্যাপার, অথচ এই এণ্ডি কাপড়ের জন্য ভারতের সাহেবগণ লালায়িত-- অষ্ট্রেলিয়ার সাহেবগণ লালায়িত। বিক্রয়ের যথেষ্ট খরিদ্দার আছে. কিন্তু জিনিশ ত মিলে

না। কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া এণ্ডি রেসমের চাষ করিলে কেমন হয়? চাষের উৎপন্ন রেসম গৃহস্থদিগকে দিয়া উহা হইতে কাপড় তৈয়ার করাইয়া লইলেই বা কেমন হয়? (ক্রমশঃ)

ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম্. বি, অনুবাদিত।)

মানব জাতির অদৃষ্ট-রচনা-বিষয়ে যে সকল 'শক্তি' কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, সে সকলের মধ্যে আমরা যাহার বিকাশকে 'ধর্ম্ম' বলি, তাহা অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক শক্তিমান নহে। সকল সমাজেই কোথাও না কোথাও এই মহাশক্তির ক্রিয়া ভিত্তিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বিভিন্ন মনুষ্যকে সমষ্টিবদ্ধ করণার্থে যে মহান্ শক্তি ক্রীড়া করিয়াছে, তাহা এই ধর্ম্ম-শক্তি হইতে উৎপন্ন। অনেকানেক বিষয়ে ধর্ম্মবন্ধন—জাতি, দেশ, এমন কি পরিবার-বন্ধন অপেক্ষাও যে সমধিক প্রবল, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। একই ঈশ্বর-উপাসক ও একই ধর্ম্ম-বিশ্বাসি-ব্যক্তিগণ যে এক পরিবারোৎপন্ন লোক, অধিক কি সহোদরগণাপেক্ষা সমধিক শক্তি ও দৃঢ়তার সহিত পরস্পরের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ইহা সকলেই বিশেষ অবগত আছেন।

ধর্ম্মের প্রারম্ভ-নির্দ্ধারণে অনেক চেষ্টা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমাগত প্রাচীন ধর্ম্ম সকলকে এই অধিকার স্থাপন করিতে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই অলৌকিক; তাহারা মানব-মস্তিষ্ক-উদ্ভূত নহে, কিন্তু অন্যত্র উহাদের উৎপত্তি। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইটি মত কতক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে; একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রেতাত্মা মত, অপরটী অনন্তের ক্রমাভিব্যক্তি। একদল এই মত সমর্থন করেন যে, পিতৃলোকের পূজা ধর্ম্মজ্ঞানের আরম্ভ। মনুষ্য মৃত আত্মীয়গণের স্মৃতি জাগরূক রাখিতে ইচ্ছা করেন। দেহ বিগলিত হইলেও তাহাদিগকে জীবিত জ্ঞান করেন ও তাহাদিগকে আহার প্রদান করিতে এবং কতক পরিমাণে পূজা করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহা ইহা হইতেই উৎপন্ন। মিসরবাসী, বাবিলোনিয়ান ও চীনদিগের এবং আমেরিকা ও অপরাপর স্থানের অন্যান্য জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম

সকল অনুশীলন করিলে এই পিতৃ-পূজাই যে ধর্ম্মের আরম্ভ, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীন মিসরবাসীদিগের মধ্যে আত্মার প্রাথমিক জ্ঞান 'দ্বৈত'-বোধক ছিল। এই মনুষ্য-শরীর-মধ্যে তৎসদৃশ হস্ত ও পদযুক্ত অপর একটী জীব আছেন। কেহ মৃত হইলে এই 'দ্বৈত', শরীর হইতে বাহির হইয়া যান ও জীবিত থাকেন। কিন্তু পরিত্যক্ত দেহ যতদিন অখণ্ডিত থাকে, ঐ 'দ্বৈতের' জীবন ততদিন স্থির থাকে। এই নিমিত্ত মিসরবাসীদিগের মধ্যে দেহ অখণ্ডিত রাখিতে এতাদৃশ আগ্রহাতিশয্য আমরা দেখিতে পাই; এবং এই জন্যই দেহ সকল রক্ষা করিতে তাঁহারা ঐ সকল বৃহদায়তন পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কারণ, যদি বাহ্যশরীরের কোন অংশ আহত হয়, 'দ্বৈত'ও ঠিক সেইরূপেই আহত হইবে। ইহা স্পষ্ট পিতৃ-উপাসনা। প্রাচীন বাবিলোনিয়ানদিগের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এই 'দ্বৈতের' জ্ঞান আমরা দেখিতে পাই। এই 'দ্বৈত' সকল প্রকার স্নেহজ্ঞানপরিশূন্য। ভোজ্য ও পানীয় প্রদানার্থ ও নানারূপে সাহায্যগ্রহণার্থ ইহা জীবিতদিগকে ভয় প্রদর্শন করিত; ইহা নিজ সন্তান, স্ত্রী বা কন্যার প্রতিও স্নেহশূন্য হইত। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যেও এই পিতৃ পূজার নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। চীনদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি স্পষ্টতঃ পিতৃ-পূজা বলা যাইতে পারে এবং এখনও ইহা সেই মহাদেশের সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। বস্তুতঃ বলিতে গেলে পিতৃপূজারূপ ধর্ম্মই কেবল মাত্র চীনে বিরাজ করিতেছে। অতএব, একদিকে পিতৃপূজাই ধর্ম্মের সূচনা, এই মতবাদ যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহাদের পক্ষীয় প্রতিজ্ঞা উত্তম সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

অপর দিকে কতকগুলি পণ্ডিত প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন। যদিও আমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পিতৃ-পূজার প্রমাণ দেখিতে পাই, তথাপি তাঁহাদিগের প্রাচীনতম পুস্তকে তাহার কোনরূপ নিদর্শন নাই। আর্য্য জাতির অতি প্রাচীনতম পুস্তক ঋগ্বেদসংহিতায় আমরা ইহার কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাই না। আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহাতে প্রকৃতির উপাসনাই দেখিতে পান বলিয়া অনুমান করেন। মানব-মন যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্টিত, দেখা যায়। ঊষা, সন্ধ্যা, ঝটিকা, প্রকৃতির বিস্ময়কর মহান্ শক্তি সকল ও তাহাদের সৌন্দর্য্য মানব-মনের চিন্তাশীলতা উন্মেষিত করিয়াছে এবং ইহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে, ইহাদের বিষয় কিছু অবগত হইতে মানব-মন অভিলাষী। এইরূপ চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহারা এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা

আত্মা-বিশিষ্ট করিয়া এবং কখন সুন্দর, কখন অপ্রাকৃতিক দেহ দান পূর্ব্বক ব্যক্তিগত গুণ আরোপ করিয়াছেন। এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় ব্যক্তিত্ব আরোপিত হউক বা না হউক, ইহারা সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইলে সকল চেষ্টার পর্য্যবসান হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপই দেখা যায়। তাহাদিগের সমস্ত দেবতাখ্যান এই প্রকৃতির সূক্ষ্মভাবের পূজা ব্যতীত আর কিছু নহে। প্রাচীন জর্ম্মান, স্কান্‌ডিনেবিয়ান এবং অপর সমস্ত আর্য্য জাতির মধ্যেও এইরূপ ছিল। এইরূপে প্রাকৃতিক শক্তিসকলে ব্যক্তিত্ব আরোপণেই যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, এদিকেও প্রবল পক্ষ সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই উভয় মত বিরুদ্ধ বোধ হইলেও আর এক তৃতীয় ভিত্তিতে ইহাদের সম্মিলন করা যাইতে পারে। আমার মতে ইহাই ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্কুর এবং আমি ইহাকে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি। পিতৃলোকের বা মৃতের প্রেতাত্মার অন্বেষণেই মানব প্রবৃত্ত হউন বা দেহ বিগলিত হইলে কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হউন কিম্বা বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তরালস্থ শক্তির ক্রিয়া অবগত হইতে অনুরাগী হউন, তিনি যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে যত্নবান, ইহা নিশ্চিত। তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি ইহার বহির্দ্দেশে যাইতে চান। ধর্ম্মের আরম্ভবিষয়ে কোনরূপ অলৌকিক ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই। ধর্ম্মের প্রাথমিক অস্পষ্ট বোধোদয় যে স্বপ্ন হইতে আসিবে, ইহা আমার মনে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অমৃতত্বের প্রাথমিক জ্ঞান মানব স্বপ্ন হইতেই প্রাপ্ত হয়। ইহা কি একটী অতি আশ্চর্য্য অবস্থা নহে? বালক এবং অজ্ঞ লোকেরা তাহাদের স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার মধ্যে সামান্য প্রভেদই দেখিতে পায়। মনুষ্য স্বতঃই ইহা দেখিতে পায়, যখন স্বপ্নাবস্থায় দেহ মৃতবৎ, তখন মন তাহার জটিল কার্য্যসমূহে ব্যাপৃত থাকে; ইহা অপেক্ষা আর কি স্বাভাবিক হইতে পারে? অতএব এই দেহ বিগলিত হইলেও চিরকাল যে এইরূপ কার্য্য চলিতে থাকিবে, এই সিদ্ধান্তে মনুষ্য সহজেই উপনীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমার বিবেচনায় অলৌকিকের ইহাই সহজ ব্যাখ্যা এবং স্বপ্ন-জ্ঞান হইতেই মানবমন উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করে। অবশ্য সময়ে অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিয়াছিল যে, এই সকল স্বপ্ন জাগ্রদবস্থায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না এবং স্বপ্নাবস্থায় মনুষ্যের নূতন

সত্তা থাকে, এরূপও নহে, কিন্তু সে কেবল জাগ্রদবস্থার অনুভবসকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে মাত্র।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

কনখল।

পূজনীয় উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়—

আমি জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইলাম —

গত জুলাই মাসে ৩ জন সাধু রোগী আশ্রমে চিকিৎসিত হইয়াছে (in-door patients), তন্মধ্যে একজন আশ্রমে কয়েক দিন থাকার পর তাঁহার জানিত কেহ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যায় এবং অবশিষ্ট ২ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বহিঃস্থ দশজন সাধু এবং নয়জন গরীব গৃহস্থও চিকিৎসাধীন ছিল, তন্মধ্যে ৬ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের ঔষধ নেওয়া বন্ধ করে, একজন আগষ্ট মাসে আরোগ্য লাভ করে এবং অবশিষ্ট সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

আগষ্ট মাসে ৬ জন রোগী আশ্রমে চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ১ জন সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিল, তৎপরে আরোগ্য লাভ করে। ২৪ জন বাহিরের (out-door patients) রোগীও চিকিৎসা করা হয়, তন্মধ্যে ১২ জন সাধু এবং ১২ জন গৃহস্থ। ৫ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের ঔষধ নেওয়া বন্ধ করে, ৪ জন সেপ্টেম্বর মাসেও আমাদের চিকিৎসাধীন ছিল, তৎপরে আরোগ্য লাভ করে, এবং অবশিষ্ট সকলে আগষ্ট মাসেই আরোগ্য লাভ করে। সেপ্টেম্বর মাসে ৬ জন সাধু রোগী আশ্রমে চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে একজন এখনও আমাদের চিকিৎসাধীন আছে, অবশিষ্ট সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ৪৮ জন বাহিরের রোগীর মধ্যে, ৩০ জন সাধু এবং ১৮ জন গরীব গৃহস্থ ছিল, তন্মধ্যে ৩৯ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ৭ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে এবং ২ জন আমাদের চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া যায়। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আশ্রমের আয় ২৯৬৷৶০।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ব্যয়ের হিসাব।

খাই খরচ	৪৭৬৶৭॥
ঔষধ	৪১ /৭॥
রান্নার বাসন ইত্যাদি	১৪৸৵১৫
চাকর, বামনের বেতন ইত্যাদি ...	১৩॥৶ ৫
বাড়ি ভাড়া	৯৲
খাটিয়া	৮॥৵১০
রেল ভাড়া	৮॥০
বিছানা	৫৵১০
খুচরা খরচ	৩। ১২॥
কুলি ভাড়া	১॥৶
টিকেট, পোষ্ট কার্ড ইত্যাদি	৸০

মোট—১৫৪৸৵৭॥ টাকা।

ইতি

বশম্বদ কল্যাণানন্দ।

৭ই অক্টোবর ১৯০১।

আমাদের পাঠকগণ ১৫ই ভাদ্র ও ১লা কার্ত্তিকের উদ্বোধনে এই সেবাশ্রম সম্বন্ধে ২খানি পত্র পাঠ করিয়াছেন। আমাদের সকল সহযোগী যদি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় তাঁহাদের পত্রস্থ করেন, তবে সাধারণের বড়ই উপকার করা হয়। সাধারণে এই বিষয় বিশেষরূপ জানিতে পারিলে সাধু ও দরিদ্রসেবারূপ মহৎ কর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। সাধারণের এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিলে আমরা ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে এইরূপ আশ্রম স্থাপন করিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই মহৎ কার্য্যের জন্য এক পয়সা চাঁদাও অতি আদরের সহিত গৃহীত হইবে ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রাপ্তিস্বীকার করা যাইবে।

সকল রকমেরই উপদেশ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে উপনিষদ বুঝাইব, ততই ইহা দেখিতে থাকিবে। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ এই, তোমার রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার এই সকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, কারণ, তোমার রাজ্য কখন নষ্ট হয় নাই। যাহা তুমি কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্টা করিবে কি? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। যদি তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমরা এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হইয়া যাইবে, আর যদি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে—অবশ্য যাহা বলিব, তাহা আমাকে বড় সাহসপূর্ব্বক বলিতে হইবে—এই সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তোমাদিগকে এ কথা বলিয়াছি। তোমাদের ইহা শুনিয়া এক্ষণে ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই ইহার চিন্তা করিবে এবং ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে, ততই দেখিবে, আমার কথা সত্য কি না। কারণ, মনে কর, মুক্তভাব তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়; তবে তুমি কোন রূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত ছিলে, এক্ষণে কোন রূপে সেই মুক্ত স্বভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতেই মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত ছিলে, তবে কিসে তোমায় বদ্ধ করিল? স্বতন্ত্র যে, সে কখন পরতন্ত্র হইতে পারে না, যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল, উহা কখন স্বতন্ত্র ছিল না—এই স্বাতন্ত্র্যপ্রতীতিই ভ্রম ছিল।

এক্ষণে দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ গ্রহণ করিবে? উভয় পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়। যদি বল, আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা উহাকে বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহাতে উহাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, সুতরাং তুমি যে উহাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, সে তোমার ভ্রম মাত্র। অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই মুক্ত-স্বরূপ। অন্যরূপ হইতেই পারে না। মুক্ত স্বভাবের অর্থ—বাহ্য সকল বস্তুর অনধীনতা—ইহার অর্থ এই, উহা ব্যতীত কোন বস্তুই উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্য্য করিতে পারে না। আত্মা কার্য্যকারণ-

সম্বন্ধের অতীত। ইহা হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা সকল আসিয়া থাকে। আত্মার অমরত্বের কোন ধারণাই স্থাপন করা যাইতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না। কারণ, মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দ্বারা কৃত কার্য্য। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর কিছু কার্য্য করিতে পারে। আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য্য করিতে পারে। যদি আত্মা সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে, আত্মা মুক্তস্বভাব, তবে ইহাও স্বভাবতঃ বোধ হয় যে, বহিঃস্থ কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না, কখন পারিবেও না। তাহা হইলেই আত্মা কখনও মরিবেনও না, আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত হইবেন। আত্মার মুক্ত-স্বভাব, উহার অমরত্ব এবং উহার আনন্দ-স্বভাব, সকলই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্য্য কারণ-সম্বন্ধের অতীত, এই মায়ার অতীত। ভাল কথা; এক্ষণে যদি বল, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এক্ষণে উহা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্তু অপর পক্ষে, আমরা পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্ত-স্বভাব, এই যে বদ্ধ হইয়াছি, বোধ হইতেছে, ইহা ভ্রান্তি মাত্র। এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ সত্য, তাহা বাছিতে হইবে, প্রথমটী ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টিকেই ভ্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত সঙ্গত। আমি সম্পূর্ণ রূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধভাব সত্য ও মুক্তভাব ভ্রমাত্মক নহে।

সকল দর্শনেই স্থূলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খুব আধুনিক দর্শনেও এই বিচার প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুই দল আছেন; এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া কিছু নাই, উহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণা সকলের পুনঃ পুনঃ স্থান-পরিবর্ত্তন; এই মিশ্রণ, যাহাকে শরীর, মস্তিষ্ক প্রভৃতি নাম দাও, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশ সকলের ক্রমাগত স্থান-পরিবর্ত্তনে এই মুক্ত স্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কতকগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন; তাঁহারা বলিতেন,

একটী মশাল লইয়া তোমার চতুর্দিকে ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র ঘুরাইতে থাকিলে, একটী আলোকের বৃত্তাকার দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ, ঐ মশাল প্রতি মুহূর্ত্তে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুসমষ্টিমাত্র, উহাদের প্রবল ঘূর্ণনে এই ভ্রান্তি জন্মিতেছে। একটী মত হইল এই যে, এই শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিন্তাশক্তির অতি দ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই দুই মতের বিবাদ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়াছে—এক দল বলিতেছেন, আত্মা ভ্রম মাত্র, অপরে আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। কোন্ মত ঠিক? অবশ্য আমরা আত্মবাদ গ্রহণ করিব, জড়কে ভ্রমাত্মক বলিব। যুক্তি উভয়দিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল, কারণ, জড় কি, তাহা কেহ কখন দেখে নাই। আমরা কেবল আপনাদিগকেই অনুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখি নাই যিনি আপনার বাহিরে গিয়া জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ, আত্মবাদ জগতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের দিক্ হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্ব্বে যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই অনুবাদ মাত্র। এই দর্শনগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, এই দুইটী মতেরই সংঘর্ষ চলিয়াছে। বন্ধ মুক্তির কথা যাহা বলা হইতেছিল, তাহার ভিতরেও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, অপেক্ষাকৃত দার্শনিক ভাবে আমরা এই স্বাভাবিক পবিত্রতা ও মুক্তস্বভাব এবং স্বাভাবিক বদ্ধভাবের বিচার দেখিতে পাই। এক দল প্রথমটীকে ভ্রমাত্মক বলেন, অপর দল দ্বিতীয়টীকে ভ্রমাত্মক বলেন। অবশ্য আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত—আমাদের বদ্ধভাবই ভ্রমাত্মক।

অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বদ্ধ নহি, আমরা নিত্যমুক্ত। শুধু তাহাই নহে, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর, উহা ভ্রম, উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করা মাত্র। যখনই তুমি বল, আমি বদ্ধ, আমি দুর্ব্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ; তুমি নিজের পায়ে আর একটী শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না। আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি; তিনি বনে বাস করিতেন—তিনি

দিবারাত্র শিবোহহং শিবোহহং উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল সেই ব্যক্তির শিবোহহং শিবোহহং রব, যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল—ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি শিবোহহং বলিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। 'সোহহং সোহহং, আমিই সেই, আমিই সেই, তুমিও তাহাই।' আমি নিশ্চিত ও পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তদ্রূপ। তুমিও তিনি, এবং আমিও তাহাই। ইহাই বীরের কথা। তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্ম্মে অনেক অপূর্ব্ব মহৎ মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আমাদের উপাস্য ও প্রেমের পাত্র সগুণ ঈশ্বরবাদ অপূর্ব্ব—অনেক সময় ইহাতে প্রাণ শীতল করিয়া দেয়—কিন্তু বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিংখোরের নেশার মত অস্বাভাবিক, আবার ইহাতে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে আর পূর্ব্বে যত না আবশ্যক হইয়াছিল, এখন জগতের বিশেষ আবশ্যক—সেই বলসঞ্চার—শক্তি-সঞ্চার। বেদান্ত বলেন, দুর্ব্বলতাই সংসারে সমুদয় দুঃখের কারণ। দুর্ব্বলতাই সমুদয় দুঃখ ভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই এত দুঃখ ভোগ করি। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই চুরী ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরী বা অন্যান্য পাপ করিয়া থাকি। দুর্ব্বল বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার কিছু নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তি বশতই দুঃখ ভোগ করিতেছি। এই ভ্রান্তি তাড়াইয়া দাও, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা ত খুব সহজ সাদা কথা। এই সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অদ্বৈত বেদান্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। ভারতে এবং অন্য সর্ব্ব স্থলেই এবিষয়ে একটী গুরুতর ভ্রম করা হইয়াছিল। বেদান্তের আচার্য্যগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সর্ব্বভৌমিক করা যাইতে পারে না, কারণ, তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত

গুলিতে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই গুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে প্রণালীতে তাঁহারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন—সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য করিলেন—অবশ্য ঐ প্রণালী অতি জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক প্রক্রিয়াগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কার্য্যজীবনের শিক্ষা করা যাইতে পারে না আর এরূপ দর্শনের ব্যপদেশে লোক অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ হইবে।

কিন্তু আমি একথা আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং আমার ইহা বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, তখন লোককে পঙ্কিল জল পান করিতে দিতেছ কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে শুদ্ধস্বরূপ, তবে এই মুহূর্ত্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা কেন না দাও? সাধু অসাধু নর নারী বালক বালিকা বড় ছোট, সকলকেই কেন না বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও? যে কোন ব্যক্তি জগতে দেহ ধারণ করিয়াছে, যে কেহ করিবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অথবা যে রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, ধনী দরিদ্র সকলকেই কেন না ইহা শিক্ষা দাও? আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই। আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই।

এক্ষণে ইহা বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কার জন্য, অন্য কারণে নহে। সকল প্রকার বদর্য্য ও দুষ্পাচ্য খাদ্য খাইয়া এবং উপবাস করিয়া করিয়া আমরা আপনাদিগকে সুখাদ্য খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এ ঠিক ভূত মানার মত। লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, আমরা ভূত মানি না, কিন্তু খুব কমলোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছম ছম না করে। ইহা কেবল কুসংস্কার। ঠিক এইরূপেই লোকে বলিয়া থাকে, আমরা অমুক মানি না, অমুক মানি না ইত্যাদি—কিন্তু কার্য্যকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকে, যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাক, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত হইতে এই এক প্রধান তত্ত্ব আসিতেছে আর ইহাই একমাত্র চিরকাল থাকিবার উপযুক্ত। বেদান্ত পুস্তকগুলি কালই নষ্ট হইতে পারে। প্রথমে এই তত্ত্ব হিব্রুদের মস্তিষ্কে অথবা উত্তরমেরুনিবাসীদের মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছিল, তাহাতে

কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ইহা সত্য, আর সত্য বলিয়া, ইহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, উহা কোন ব্যক্তির বিশেষ সম্পত্তি নহে। মানুষ পশু দেবতা সকলেই ইহার এক সমান অধিকারী। তাহাদিগকে ইহা শিখাও। জীবনকে দুঃখময় করিবার আবশ্যক কি? লোককে নানা প্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নহে, এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে উহা বল, তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলে, ইহা সন্ন্যাসীর জন্য—যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করে। কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক, [illegible]তে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ জগৎকে অনেক দিন শাসন করিয়াছে আর তাহার [illegible] এই। কেন, একটা নূতন পরীক্ষা কর না? হয়তো সকল ব্যক্তির উহা মনে ধারণা করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটী লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কাজ করিলাম।

ভারতবর্ষে একটী মহৎ ধারণা আছে, যাহা ইহার বিরোধী। তাহা এই:—'আমি শুদ্ধ, আমি আনন্দস্বরূপ', এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে ত সর্ব্বদা ইহা দেখাইতে পারি না। ইহা সত্য। আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই আকাশকে আপনার মস্তকের অনেক উপরে দেখে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা আকাশের দিকে যাইতে কেন চেষ্টা করিব না, তাহার ত কোন হেতু নাই। কুসংস্কারের দিকে গেলে কি সব ভাল হইবে? অমৃত লাভ যদি না করিতে পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে? আমরা সত্য এখনই অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে?

নানা প্রকারের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে কোন উপদেশ দুর্ব্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর নারী বা বালক বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি, সত্যই এক মাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই এক মাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্য্য থাকিবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। এই জন্যই যে কোন

মত, যে কোন প্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া ফেলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্ব্বদাই মানুষকে সকল প্রকার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব, আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না, কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক আর সে গুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সে গুলি বৃথা মাত্র।

যাহারা ঐ গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, এগুলিতে মনকে বিকৃত ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে—এত দুর্ব্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্য লাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবন যাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব, আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল। বলসঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন বলসঞ্চারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপিগণ অপর পাপিগণ দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও ইহাই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল প্রদান করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। যখন সমুদয় দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধের উপর পড়ে, তখন আমরা যত উচ্চভাবে কার্য্য করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই সেরূপ পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছি, বল দেখি, যদি তোমাদের হাতে একটী ছোট শিশু দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্ত্তেকের জন্য তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের যেরূপ স্বভাব হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপপ্রবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরূপ, যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ে, তখনই আমরা আমাদের সর্ব্বোচ্চভাবে আরোহণ করি; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে হয় না, যখন শয়তান বা ঈশ্বর কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, ইহাতেই আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ ভাবে লইয়া যায়। আমিই আমার অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভ উভয়েরই কর্ত্তা, কিন্তু আমার স্বরূপ শুদ্ধ ও আনন্দ মাত্র।

ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

বেদান্ত বলেন, সাধারণের একমাত্র এই স্তবই অবলম্বনীয়। ইহাই সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র উপায়—আপনাদিগকে এবং সকলকে বলা যে, আমরাই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে বল আইসে। যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পায়ে বল পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। শিবোঽহং রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আমাদের হৃদয়কে, আমাদের ভাবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে—পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে আরম্ভ হয়, ততই মোহ চলিয়া যায়, অজ্ঞানরাশি ধ্বংস হইতে থাকে—ক্রমশঃ এমন এক সময় আসিয়া থাকে, যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় এবং একমাত্র জ্ঞানসূর্য্যই অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই বেদান্ততত্ত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই (ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন; তাঁহাদিগকে আমি যদি বলি, শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম্ম গেল। অনেক লোক আমায় বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিলে ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে কেহ চালাইবার না থাকিলে আর ধর্ম্ম কি হইল? কেহ আমাদিগকে শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব কিরূপে? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতে ভাল বাসি। আমরা এইরূপ ভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমরা ভালবাসি। প্রতিদিন কেহ না কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এখন ইহা যতই ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, কিন্তু

ভাষ্যানুবাদ—সেই চারি প্রকারের (ভগবদ্ভক্তগণের) মধ্যে "জ্ঞানী" তত্ত্ববিৎ তত্ত্ববিদ্ বলিয়াই নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি; কারণ (তাহার নিকটে) অন্য কেহ ভক্তির পাত্র থাকে না, এই কারণ সেই একভক্তি জ্ঞানী বিশিষ্ট হয়। "বিশেষ" আধিক্য লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা অতিরিক্ততা প্রাপ্ত হয়। যে কারণে জ্ঞানী (আমাকে) আত্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, এই কারণে সেই জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকি। ইহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে যে, আত্মা (সর্ব্বাপেক্ষা) প্রিয় হইয়া থাকে, সেই কারণে জ্ঞানীর আত্মা বলিয়া বাসুদেব (অত্যন্ত) প্রিয় হয়েন ইহাই অর্থ। সেই জ্ঞানীও বাসুদেব স্বরূপ আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়, কারণ সে আমার আত্মাই হইয়াছে। ১৭।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্। ১৮।

অন্বয়।—এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ জ্ঞানী তু আত্মৈব (ইতি) মে মতম্। হি (যস্মাৎ) স যুক্তাত্মা মামেব অনুত্তমাং গতিং আস্থিতঃ। ১৮।

মূলানুবাদ।—ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই, ইহাই আমার মত। কারণ, সেই সমাহিতমনা জ্ঞানী আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিতে উদ্যত হয়। ১৮।

ভাষ্য।—ন তর্হি আর্ত্তাদয়স্ত্রয়ঃ বাসুদেবস্য প্রিয়াঃ? ন; কিং তর্হি? উদারাঃ উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্ব এব এতে ত্রয়োঽপি মম প্রিয়া এব ইত্যর্থঃ। নহি কশ্চিন্মদ্ভক্তঃ মম বাসুদেবস্য অপ্রিয়ো ভবতি জ্ঞানী তু অত্যর্থং প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ তৎ কস্মাদিত্যাহ জ্ঞানী তু আত্মৈব নান্যো মত্ত ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ। আস্থিতঃ আরোঢ়ুং প্রবৃত্তঃ স জ্ঞানী হি যস্মাৎ অহমেব ভগবান বাসুদেবঃ নান্যোঽস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব ব্রহ্ম গন্তব্যং অনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে কি আর্ত্ত প্রভৃতি তিন প্রকার ভক্ত তোমার প্রিয় নহে? না, কি তবে? এই সকল ভক্ত (অর্থাৎ আর্ত্ত প্রভৃতি ত্রিবিধ ভক্তই) "উদার" উৎকৃষ্ট অর্থাৎ (তাহারা সকলেই) আমার প্রিয়। আমার কোন ভক্তও আমার (বাসুদেবের) অপ্রিয় হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়, ইহাই বিশেষ। তাহা কেন হয়, তাহাই বলা হইতেছে—জ্ঞানী আমার আত্মাই। আমা হইতে সে (কোন প্রকারে) ভিন্ন

নহে, ইহা আমার "মত" নিশ্চয়। কারণ,সেই জ্ঞানী "আমিই ভগবান বাসুদেব, তাঁহা হইতে আমি পৃথক্ নহি" এই প্রকার সমাহিতচিত্ত হইয়া গন্তব্য পর ব্রহ্মরূপ আমাকে পাইবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পথে যাইতে উদ্যত হইয়াছে ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা স দুর্লভঃ। ১৯।

অন্বয়। বহূনাং জন্মনাং অন্তে "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" ইতি জ্ঞানবান্ (সন্) মাং প্রপদ্যতে, (য এবং) স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ১৯।

মূলানুবাদ।—বহু জন্ম অতীত হইলে পর "সকল বস্তুই বাসুদেব "এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া (সাধক) আমাকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার মহাত্মা (জগতে) অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯।

ভাষ্য।—জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে—বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থসংস্কারাশ্রয়াণাং অন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রপদ্যতে। কথং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতিপদ্যতে স মহাত্মা ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি অধিকো বা অতঃ সুদুর্লভঃ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু ইত্যুক্তম্। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। পুনর্ব্বার জ্ঞানীর স্তুতি করা হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল সংস্কার যে সকল জন্মে উপচিত হয়, সেই প্রকার বহু জন্মের অন্তে (অর্থাৎ) সমাপ্তি হইলে পর জ্ঞানবান (অর্থাৎ যাহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে,সে) আমাকে বাসুদেব (অর্থাৎ) সকল জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ পাইয়া থাকে। কি ভাবে পায় ? (সে তখন দেখে) "সকল বস্তুই বাসুদেব"। যে ব্যক্তি এই প্রকারে সকলের অন্তরাত্মা আমাকে পায়, সেই মহাত্মা, "তাহার সমানও কেহ থাকে না এবং তাহা হইতে অধিকও কেহ থাকে না বলিয়া" সুদুর্লভ— সহস্র সহস্র মনুষ্যগণের মধ্যে, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ১৯।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০।

অন্বয়।—স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ তৈস্তৈঃ কামৈর্হৃতজ্ঞানাঃ (সন্তঃ) তং তং নিয়মং আস্থায় অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। ২০।

মূলানুবাদ।—স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত সুতরাং নানা প্রকার কামের উদয়ে বিনষ্টজ্ঞান হইয়া (প্রাকৃত জনগণ) সেই সেই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। ২০।

ভাষ্য।—আত্মৈব সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে—কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈঃ হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ প্রাপ্নুবন্তি বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যা দেবতাঃ তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধোযোযোনিয়মস্তংতং আস্থায় আশ্রিত্য প্রকৃত্যা স্বভাবেন জন্মান্তরার্জ্জিতসংস্কারবিশেষেণ নিয়তা নিয়মিতাঃস্বয়া আত্মীয়া। ২০।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল বিশ্বই বাসুদেব এবং বাসুদেবই আত্মা এই প্রকার জ্ঞান সকলের কেন না হয়, তাহার কারণ বলা হইতেছে। সেই সেই পুত্র পশু ও স্বর্গাদি বিষয়ে কামনার বশে "হৃতজ্ঞান" অপহৃতবিবেকবিজ্ঞান হইয়া মনুষ্যগণ অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে (তাহারা বিবেচনা করে যে) ঐ সকল দেবতা সকলের আত্মভূতবাসুদেব হইতে ভিন্ন। যে যে দেবতার আরাধনায় যে যে নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া (তাহারা) "স্বীয়" আত্মীয় "প্রকৃতি" দ্বারা নিয়মিত (হইয়া থাকে)। ২০।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃশ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যাতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্। ২১।

অন্বয়।—যো যো ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া যাং যাং তনুং অর্চ্চিতুমিচ্ছতি তস্য তস্য (তস্যাং তস্যাং তনৌ) তামেব শ্রদ্ধাং অহং বিদধামি। ২১।

মূলানুবাদ।—যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবতাবিগ্রহকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, আমি (সেই সেই দেবতাবিগ্রহের প্রতি) সেই সেই ব্যক্তির সেই শ্রদ্ধাকে অচলা করিয়া থাকি। ২১।

ভাষ্য।—তেষাং চ কামিনাং যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তোভক্তশ্চ সন্ অর্চ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনঃ অচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি যয়ৈব পূর্ব্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতঃ যো যাং দেবতা তনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতীতি। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। সেই সকল কামিগণের মধ্যে যে যে কামী শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যে যে দেবতাবিগ্রহকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই কামীর সেই শ্রদ্ধাকে "অচলা" স্থিরা আমিই করিয়া থাকি (অর্থাৎ) আমি তত্তদ্দেবতার

প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধার স্থিরত্ব সম্পাদন করিয়া থাকি,যে শ্রদ্ধার বশে স্বভাবতঃ পূর্ব্বজন্মে সে যে দেবতার পূজা করিতে অভিলাষী হয় (সেই শ্রদ্ধারই স্থিরতা বিধান করিয়া থাকি।) । ২১ ।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধন মীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্। ২২।

অন্বয়। - তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স তস্যারাধনমীহতে ততঃ ময়ৈব বিহিতান্ তান্ কামান্ লভতে হি। ২২।

মূলানুবাদ।—সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই ভক্ত সেই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে এবং সেই দেবতার নিকট হইতে সেই সকল কাম লাভ করিয়া থাকে, বাস্তবিক কিন্তু আমিই এ সকল কামের বিধাতা। ২২।

ভাষ্য। - স তয়েতি। স তয়া মদ্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃসন তস্যা দেবতায়া রাধনং আরাধনং ঈহতে চেষ্টতে লভতে চ ততস্তস্যা আরাধিতায়া দেবতায়াঃ কামানীপ্সিতান ময়ৈব পরমেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন কর্ম্মফল বিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান নির্ম্মিতান্ তান্ হি যস্মাৎ তে ভগবতা বিহিতাঃ কামাস্তস্মাৎ তানবশ্যংলভতে ইত্যর্থঃ। হিতান্ ইতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্প্যং ন হি কামাঃহিতাঃ কস্যচিৎ। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ।—স তয়া ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। সেই ব্যক্তি মদ্বিহিত শ্রদ্ধা লাভ করিয়া সেই দেবতার ' রাধন" আরাধনা করিয়া থাকে ও সেই আরাধিত দেবতার নিকট হইতে তাহার ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং সকল প্রকার কর্ম্মফলের বিভাগ আমিই জানি,এই কারণ সকল পক্ষে ঐ সকল ফলের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আমিই। "যে কারণ সেই সকল কাম ভগবানই দিয়া থাকেন, এই কারণ সেই ব্যক্তি অবশ্যই সেই কামসকলকে লাভ করিয়া থাকে।" (হি শব্দের দ্বারা এই প্রকার অর্থ দ্যোতিত হইতেছে)"হিতান্" এই প্রকার পদচ্ছেদ করিলে কামসকলের হিতত্ব ঔপচারিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কামসমূহ ত কাহারও হিতকর হইতে পারে না। ২২।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। ২৩।

অন্বয়। —তেষাং অল্পমেধসাং তৎ ফলং অন্তবৎ তু ভবতি হি (যস্মাৎ) দেবযজঃ দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তা অপি মাং যান্তি। ২৩।

মূলানুবাদ—সেই অল্পবুদ্ধি (ভিন্নদেবতাযাজী) দিগের ফলও বিনশ্বর হয়, কারণ, ভিন্ন দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকেই পাইয়া থাকে। ২৩।

ভাষ্য।—যস্মাদন্তবৎসাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে্‌হতঃ—অন্তবদ্ বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ ভবতি অল্পমেধসাং অল্পপ্রজ্ঞানাং দেবান্ দেবযজো যান্তি দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবান্ যান্তি। মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। এবং সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রপদ্যন্তেঽনন্তফলায়াহো খলু কষ্টং বর্ত্তন্তে ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ তাহাদের সাধনানুষ্ঠান অনন্ত ফলদায়ক নহে ও তাহারা অবিবেকী ও কামপরবশ, এই কারণে সেই "অল্পমেধাঃ," অল্পবুদ্ধি কামিগণের কর্ম্মফল "অন্তবৎ" বিনাশীই হইয়া থাকে। যাহারা দেবযজ্, তাহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহারা দেবগণের প্রীতিকে উদ্দেশ্য করিয়া যাগ করে, তাহারাই দেবযজ্। আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার (উভয় দিকেই) আয়াস তুল্য হইলেও অনন্তফলের হেতু আমাকেই তাহারা ভজনা করে না। অহো অবিবেকিগণ কিরূপ ক্লেশে জীবন যাপন করে! এইরূপে ভগবান্ তাহাদের প্রতি অনুকম্পা দেখাইতেছেন ॥ ২৩ ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—মম অব্যয়ং অনুত্তমং পরংভাবমজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ মাং অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—অবিনাশী নিরতিশয় ও প্রকৃষ্ট মদীয় সত্তাকে বুঝিতে না পারিয়া অবিবেকিগণ বিবেচনা করিয়া থাকে যে, আমি সাধারণ ভূতসমূহের ন্যায় জন্মের পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিলাম, পরে প্রকাশ পাইয়াছি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য।—কিং নিমিত্তং মামেব ন প্রপদ্যন্তে ইত্যুচ্যতে অব্যক্তং অপ্রকাশং ব্যক্তিং আপন্নং প্রকাশং গতমিদানীং মন্যন্তে মাং নিত্যসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তং অবুদ্ধয়োঽবিবেকিনঃ পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনঃ মম অব্যয়ং ব্যয়রহিতং অনুত্তমং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবং অজানন্তঃ মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কি কারণে তাহারা আমাকেই আশ্রয় করে না, তাহাই

বলা হইতেছে। আমি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর হইলেও আমাকে সাধারণ প্রাণীর ন্যায় প্রথমে অব্যক্ত অপ্রকাশ (প্রাকৃত) পরে এইক্ষণে ব্যক্ত প্রকাশপ্রাপ্ত বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে। 'পর' পরমাত্মস্বরূপ স্বভাব না বুঝিয়া অবিবেকিগণ, "অব্যয়" ব্যয়রহিত "অনুত্তম" নিরতিশয় মদীয় ভাব না বুঝিয়াই এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহাই অর্থ ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—যোগমায়াসমাবৃতঃ অহং সর্ব্বস্য ন প্রকাশঃ মূঢ়ঃ লোকঃ অজং অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ।—আমি যোগমায়াসমাবৃত, এইজন্য সকলের নিকট প্রকাশমান নহি। মূঢ়জীব বুঝিতে পারে না যে, আমি জন্ম ও মৃত্যু এই উভয়বিরহিত ॥২৫॥

ভাষ্য।—মদীয়মজ্ঞানং কিংনিমিত্তমিত্যুচ্যতে নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য কেষাংচিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াসমাবৃতঃ যোগো গুণানাং যুক্তিঃ ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়য়া সমাবৃতঃ সংচ্ছন্ন ইত্যর্থঃ। অতএব মূঢ়ো লোকোঽয়ং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ।

ভাষ্যানুবাদ।—আমাকে লোক কেন বুঝিতে পারে না, তাহাই বলা হইতেছে—আমি সকল লোকের সমক্ষে (স্বরূপে) প্রকাশ নহি, কতকগুলি আমার ভক্তের সমক্ষেই আমি প্রকাশ হই, ইহাই অভিপ্রায়। (কারণ) আমি যোগমায়াসমাবৃত। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যোগই এই স্থলে যোগ শব্দের অর্থ অর্থাৎ গুণত্রয়ের ঘটনাই যোগ। সেই যোগই মায়া "যোগমায়া" তাহার দ্বারা "সমাবৃত" সংচ্ছন্ন ইহাই অর্থ। এই কারণেই মূঢ়লোক অজ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন, অহং সমতীতানি, বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ; মাং তু কশ্চন ন বেদ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে অর্জ্জুন আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল প্রাণীকেই জানি; আমাকে কিন্তু কেহই জানে না ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য।—যয়া যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকো নাভিজানাতি নাসৌ যোগমায়া মদীয়া সতী মমেশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি। যথা অন্যস্যাপি মায়াবিনো মায়াজ্ঞানং তদ্বদ্বত এবমতঃ—অহংতু বেদ জানে সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি বর্ত্তমানানি চ অর্জ্জুন ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহং মাংতু বেদ ন কশ্চন।

ভাষ্যানুবাদ।—যে যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত হইয়া লোক আমাকে জানিতে পারে না, সেই যোগমায়া আমারই অধীন। আমিই মায়াবী ও ঈশ্বর, এই কারণে সেই যোগমায়া আমার জ্ঞানকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না। যেমন কোন লৌকিক মায়াবীর মায়া তাহার জ্ঞানকে প্রতিরুদ্ধ করে না। কিন্তু দর্শকদিগের বুদ্ধিকেই প্রতিরুদ্ধ করে) এই কারণেই—আমি কিন্তু "সমতীত" অতিক্রান্ত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্য প্রাণীসকলকে জানি, আমাকে কিন্তু আমার ভক্ত ব্যতিরেকে অপর কেহই জানে না। (সুতরাং ইহাই স্থির) আমার তত্ত্ব জানে না বলিয়া প্রাণিগণ আমাকে ভজনা করে না। ২৬।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ। ২৭।

অন্বয়।—হে পরন্তপ ভারত! ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সর্গে সম্মোহংযান্তি। ২৭।

মূলানুবাদ। হে পরন্তপ ভারত! ইচ্ছা ও দ্বেষ এই উভয় হইতে সমুত্থিত সুখদুঃখাদিবিষয়বিষয়ক দ্বন্দ্বমোহের প্রভাবে সকল প্রাণীই সৃষ্টিকালে সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ২৭।

ভাষ্য।—কেন পুনর্মত্তত্ত্বাবেদনপ্রতিবন্ধেন প্রতিবদ্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্ব্বভূতানি মাংন বিদন্তি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—"ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন" ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছাদ্বেষৌ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতীচ্ছাদ্বেষসমুত্থস্তেন ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন কেন ইতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়ামিদমাহ "দ্বন্দ্বমোহেন' দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহঃ দ্বন্দ্বমোহঃ তাবেব ইচ্ছাদ্বেষৌ শীতোষ্ণবৎ পরস্পরবিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতু বিষয়ৌ যথাকালং সর্ব্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়েতে। তত্র যদেবেচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখতদ্ধেতু সংপ্রাপ্ত্যা লব্ধাত্মকৌ ভবতস্তদা তৌ সর্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদনদ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণং মোহং জনয়তঃ। নহি ইচ্ছাদ্বেষাশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানং মুৎপদ্যতে

বহিরপি, কিন্তু স্বকর্ম্মাৎ তাভ্যাং আবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতি। অতস্তেন ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ভরতান্বয়জ! সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি সন্তি সংমোহং সংমূঢ়তাং সর্গে জন্মনি উৎপত্তিকালে ইতি এতৎ। যান্তি গচ্ছন্তি হে পরন্তপ! মোহবশান্যেব সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ। যতএবমতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবদ্ধপ্রজ্ঞানানি সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি মামাত্মভূতং ন জানন্তি অতএবাত্মভাবেন মাং ন ভজন্তে। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। আমার তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকারণ বস্তুটী কি, যাহা দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া প্রাণিগণ সৃষ্টিদশাতে আমাকে জানিতে পারে না? এই প্রকার আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে, ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ" ইচ্ছা ও দ্বেষ (এই তাৎপর্য্যে) ইচ্ছাদ্বেষ (এই শব্দটী ব্যবহৃত)। সেই ইচ্ছাদ্বেষ হইতে যাহা সমুত্থিত হয়, তাহারই নাম ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থ। (এই বিশেষণের দ্বারা কে বিশেষিত হইতেছে? (তাহার উত্তর) "দ্বন্দ্বমোহ" দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহই দ্বন্দ্বমোহ (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থকে দ্বন্দ্ব বলা যায়) সেই ইচ্ছা ও দ্বেষ, শীত এবং উষ্ণের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব, সুখ ও সুখের সাধন, ইচ্ছার বিষয় দুঃখ ও দুঃখের সাধন দ্বেষের বিষয়, এই ইচ্ছা ও দ্বেষ নির্দ্দিষ্টকালে সকল প্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া দ্বন্দ্ব এই শব্দটীর দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার পর যে সময় সেই ইচ্ছা ও দ্বেষ, সুখ দুঃখ ও তাহার হেতুর প্রাপ্তিতে আত্মলাভ করে, সেই সময় ঐ ইচ্ছা ও দ্বেষ সকল প্রাণীর প্রজ্ঞাকে নিজের বশীভূত করিয়া, পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মের জ্ঞান যাহাতে না হয়, এইরূপ প্রতিবন্ধের কারণ মোহকে উৎপন্ন করিয়া দেয়। যে ইচ্ছা ও দ্বেষকে বশীভূত করিতে পারে না। তাহার বাহ্যবস্তু বিষয়েও যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। সেই ইচ্ছাদ্বেষের উদয়ে কলুষিতচেতা বিমূঢ় ব্যক্তির বহু ব্যাঘাতযুক্ত পরমাত্মজ্ঞান যে একেবারে হইতেই পারে না, ইহা বিশেষ করিয়া বলাই নিষ্প্রয়োজন। হে ভারত, এই কারণ সেই ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ দ্বন্দ্বমোহের বশে সকল প্রাণীই সংমোহিত হইয়া আছে এবং উৎপত্তিকালে তাহাদের মোহ সেই দ্বন্দ্বমোহের বশে আরও ঘনীভূত হয়, মোহবশীভূত সকল জীবই উৎপত্তিকালে সংমূঢ় হইয়াই জন্মিয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রায়। যে কারণে এইরূপ হয়, সেই জন্যই সকলপ্রাণী দ্বন্দ্বমোহের বশে প্রতিরুদ্ধবিজ্ঞান হইয়া সংমোহিত হইয়া থাকে এবং সেইজন্যই তাহারা আত্মভাবে ভজনা করিতে পারে না। ২৭।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

·AR 17/5 2-1902.

মাথাঘসা গলি শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাটীতে তাঁহার সহিত ও তাঁহার প্রতিবেশীদের সহিত কথোপকথন।

9/4 632

WRITERS BUILDINGS

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজি ২৮শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের Lily Cottage নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। মহাত্মা কেশব তখন পীড়িত শীঘ্রই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাটীতে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিলেন।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। ঠাকুর তো দেখিতেছি, নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর সহিত একপ সংসার করেন নাই। ধর্ম্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন। মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই। ঠাকুর তো দেখিতেছি—ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু দেখিতেছেন। টাকা স্পর্শ করিতে পারেন না। ধাতুদ্রব্য ঘটী বাটীও স্পর্শ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না। এ সব স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটা মত সেই স্থান ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে। হাতে টাকা সোণা দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস বন্ধ হয়, অবশেষে ঐ টাকা সোণা ফেলিয়া দিলে আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্বাস বহিতে থাকে।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে? পড়া শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি, যদি বিবাহ না করি, চাকরী তো করিতে হইবে না। বাপ মা কি ত্যাগ করিতে হইবে? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! ঠাকুর রামকৃষ্ণকে

দেখি আর ভাবি, আমি কি করিতেছি! ইনি রাত দিন তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন; আর আমি? আমি রাত দিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি! ইহাঁর দর্শন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের এক স্থানে একটু জ্যোতিঃ। জীবনসমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে, ইনি তো নিজে করে দেখালেন। তবে এখনও সন্দেহ?

"ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ?" সত্য কি "বালির বাঁধ?" তবে ছাড়িতে পারিতেছি না কেন? বুঝি শক্তি কম। যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, তাহলে আর হিসাব আস্‌বে না। যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে, তাহা হ'লে কে রোধ করবে? যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীন ধারণ করেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্যচিত্ত হয়ে বনবাসী হয়েছিলেন, আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ করেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ করে বৈরাগী হয়েছিলেন, সেই প্রেমের একবিন্দু যদি উদয় হয়, তাহা হ'লে এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে।

"আচ্ছা যারা দুর্ব্বল, যাদের সে প্রেমোদয় হয় নাই, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায়? এই প্রেমিক বৈরাগী মহাপুরুষের সঙ্গ ছাড়িব না। দেখি, ইনি কি বলেন?

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্ত সঙ্গে উপবিষ্ট—সম্মুখে জয়গোপাল ও তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ।

একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন।

[গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

জয়গোপালের ভ্রাতা। মহাশয় আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।

জয়গোপালের ভ্রাতা। মহাশয়। সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে, মানুষ 'আমার' 'আমার' আর মায়ায় বদ্ধ হয়ে কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আরও ডোবে। মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকিলেও পালাতে পারে না। একটী গান আছে—

"এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল করে ঘুনী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পলাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পলাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে॥"

"তোমরা তো নিজে নিজে দেখেছো সংসার অনিত্য। এই বাড়ীই দেখো না কেন? এই বাড়ীতে কত লোক এলো গেলো। কত লোক জন্মালো, কত লোক দেহ ত্যাগ করলে। সংসার এই আছে, এই নাই। অনিত্য। যাদের এতো 'আমার' 'আমার' করছো, চোখ বুঝলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। 'আমার হারুর কি হবে?' গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে। গুটী পোকা আপন নালে আপনি মরে। এরূপ সংসার মিথ্যা অনিত্য।

প্রতিবেশী। মহাশয়! এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখবে বল্লেন কেন? যদি সংসার অনিত্য, এক হাতই বা দিব কেন?

মনরে কৃষি জান না।
এমন মানবজমি রইল পতিত,
আবাদ কল্লে ফলতো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে (মনরে)
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি-বারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন,
রাম প্রসাদকে ডেকে নেনা॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সংসার ও ঈশ্বর।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। গান শুনলে ? 'কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাহলে সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।' শক্ত বেড়া! তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীব জগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে তার বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন, তাঁহার সেবা দুজনে করে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, এরূপ স্ত্রীপুরুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে—অতি বিরল—বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারেন না। তবে এরূপটী হতে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুইজনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহলেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। তাহা না হলে সর্ব্বদা অমিল্ হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তাহলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, "কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে। এমন লোকের হাতে পড়েছি! একদিনের জন্য সুখ হলো না। না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম, না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না।—তুমি, আমায় কি সুখে রেখেছ! কেবল চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন। ওসব পাগলামী ছাড়ো।"

একজন ভক্ত। এ সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তারপর কত আপদ আছে। তবে মহাশয় উপায় কি ?

[উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত – তা আর তোমাদের বলতে হবে না—রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নেই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার। তবে উপায় আছে, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

প্রতিবেশী। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে এক দিন দুদিন থাকবে—যেন কোন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ না কর্‌তে হয়। হয় নির্জ্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

প্রতিবেশী। সাধু চিন্‌বো কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না—সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন। ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না, আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে সেবা করেন। মোটামুটি এই গুলি সাধুর লক্ষণ।

প্রতিবেশী। নির্জ্জনে বরাবর থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ফুটপাথের গাছ দেখেছ? যতদিন চারা থাকে, চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। না হলে ছাগল গরু খেয়ে ফেলবে, গাছের গুঁড়ী মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না। গুঁড়ী যদি ক'রে নিতে পারো, তাহলে আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে যদি কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।

প্রতিবেশী। বিবেক কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এই বিচার। সৎ মানে নিত্য, অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়; অসৎকে ভালবাসলে—যেমন দেহসুখ, লোক মান্য, টাকা, এই সব ভালবাস্‌লে—ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে। শোনো, আর একটা গান শোন।

গীত।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুমূলেরে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥

শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্যঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে, তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মনটী হবি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তবে তত্ত্বকথা মনে উঠে। তখন মন বেড়াতে যেতে সাধ করে—কালীকল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম্ম অর্থ কাম যা সংসারীর দরকার, তাও হয়—যদি কেউ চায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রতিবেশী। তবে সংসার মায়া বলে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বরমায়াজীবজগৎ। তখন বোধ হয়, জীবজগৎশুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস আর বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল, একবার দেখত। তাহলে তুমি কি খোলা আর বীচ ফেলে দিয়ে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না, ওজন করতে হলে খোলা বীচি সমস্ত ধরতে হবে—তবে বলতে পারো, বেলটা এত্তো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীব গুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা ব'লেছিলে, অবস্তু ব'লেছিলে। বিচার করবার সময় বেলের শাঁসকেই সার ব'লে বোধ হয়, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক ব'লে বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে, যে সত্তাতে

শাঁস, সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলেই সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখমও হয়েছে। যদি মাখম হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, * যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।

"তাঁকে যে জেনেছে, সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব, জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সমস্ত।

[Sense of sin and responsibility]

প্রতিবেশী। তবে পাপ পুণ্য নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে আবার নেই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব † রেখে দেন, তাহলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু-এক-জনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ জ্ঞান—থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বল্‌তে পারো, "আমার পাপ পুণ্য সমান হয়ে গেছে তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি।' কিন্তু অন্তরে জান যে, সব কথামাত্র, মন্দ কাজটী করলেই মন ধুগবুগ করবে।

"ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে, আমি দাস, তুমি প্রভু। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে, ঈশ্বর-বিমুখ লোককে ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হলো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী। মহাশয় বলছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

["The Unknown and Unknowable."]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এই মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয় বাসনা নেই—সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

---

* লীলা—The relative phenomenal world; নিত্য—The Absolute as distinguished from the Relative.

† অহংতত্ত্ব—The Ego

প্রতিবেশী। ঈশ্বরকে কে জানতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক কে জানবে ? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হলেই হলো।

"আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার ? এক ঘটী জল হলেই খুব হলো।

"চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার ? ১টা ২টা দানা খেলেই হেউ ঢেউ হয়।"

প্রতিবেশী। আমাদের যে বিকার, এক ঘটী জলে হয় কৈ ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি।

[রোগ ও ঔষধ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, কি ঔষধ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান, তাঁকে সর্ব্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, মা আমি জ্ঞান চাই না, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর আমি কিছু চাই না।

[ঔষধ 'মামেকং শরণং ব্রজ'।]

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, 'হে অর্জ্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করবো'। তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার লবেন, তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায় ? একসের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে ? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায় ? তাই, বলছি, তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করন। তিনি ইচ্ছাময়, মানুষের কি শক্তি ?"

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৫৯২ পৃষ্ঠার পর।

অভূতপূর্ব্বং মম ভাবি কিংবা
সর্ব্বং সহে মে সহজং হি দুঃখম্।
কিন্তু ত্বদগ্রে শরণাগতানাম্।
পরাভবো নাথ ন তেঽনুরূপঃ ॥ ২৫ ॥

অথবা ইহাতে যদি কোন অভূতপূর্ব্ব দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করিব, কারণ দুঃখ আমার চির সহচর। কিন্তু আশ্রিত তোমার সম্মুখে বিফলমনোরথ হইলে, তাহা তোমার অনুরূপ হইবে না ॥ ২৫ ॥

নিরাসকস্যাপি ন তাবদুৎসহে
মহেশ হাতুং তবপাদপঙ্কজম্।
রুষা নিরস্তোঽপি শিশুঃস্তনন্ধয়ঃ
ন জাতু মাতু শ্চরণৌ জিহাসতি ॥ ২৬ ॥

হে মহেশ্বর তুমি তাড়াইয়া দিলেও, তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করিতে মন হয় না, কারণ মাতা রোষ বশতঃ স্তন্যপায়ী শিশুকে তাড়াইয়া দিতে চাইলেও, সে কখন মার চরণ পরিত্যাগ করে না ॥ ২৬ ॥

তবামৃতস্যন্দিনি পাদপঙ্কজে
নিবেশিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি।
স্থিতেঽরবিন্দে মকরন্দনির্ভরে
মধুব্রতো ন ক্ষুরকং হি বীক্ষতে ॥ ২৭ ॥

তোমার অমৃতস্রাবি পাদপদ্মে যাঁহার মন একবার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তিনি কি অন্য কিছু ইচ্ছা করিতে পারেন? কারণ মধুকর মধুপূর্ণ পদ্ম ফেলিয়া, তিলফুলের দিকে চাহিয়াও দেখে না ॥ ২৭ ॥

ত্বদঙ্ঘ্রিমুদ্দিশ্য কদাপি কেনচিৎ
যথা তথা বাপি সকৃৎকৃতোঽঞ্জলিঃ।
তদৈব মুষ্ণাত্যশুভান্যশেষতঃ
শুভানি পুষ্ণাতি ন জাতুহীয়তে ॥ ২৮ ॥

যেরূপেই হউক না কেন, তোমার পাদপদ্ম লক্ষ করিয়া কেহ কখন অঞ্জলি বন্ধন করিলে, সেই বদ্ধাঞ্জলি তাহার সমুদয় অমঙ্গল

তখনই দূর করিয়া দেয়, প্রভুত মঙ্গল বিধান করে, কখনই বিফল হয় না॥ ২৮ ॥

উদীর্ণ সংসারদবাশুশুক্ষণিং
ক্ষণেন নির্বাপ্য পরাং চ নির্বৃতিম্।
প্রযচ্ছতি ত্বচ্চরণারুণাম্বুজ-
দ্বয়ানুরাগামৃতসিন্ধুশীকরঃ॥ ২৯ ॥

তোমার লোহিত বর্ণ শ্রীচরণ পদ্মযুগলে ভক্তিরূপ সুধাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র কণা ভয়ঙ্কর সংসারদাবানল মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ব্বাপিত করিয়া পরমানন্দ প্রদান করে॥ ২৯ ॥

বিলাসবিক্রান্তপরাবরালয়ং
নমস্যদার্ত্তিক্ষপণে কৃতক্ষণম্।
ধনং মদীয়ং তবপাদপঙ্কজম্
কদানু সাক্ষাৎ করবাণি চক্ষুষা॥ ৩০ ॥

কবে আমি স্বনয়নে তোমার সেই পাদপদ্ম অবলোকন করিব, যাহা লীলাচ্ছলে স্বর্গ ও মর্ত্ত আক্রমণ করিয়াছিল, ভক্তদুঃখনাশের জন্য যাহা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এবং যাহা আমার একমাত্র ধন। ৩০ ॥

কদা পুনঃ শঙ্খরথাঙ্গ কল্পক-
ধ্বজারবিন্দাঙ্কুশবজ্রলাঞ্ছনম্।
ত্রিবিক্রম ত্বচ্চরণাম্বুজদ্বয়ম্
মদীয়মূর্দ্ধানমলঙ্করিষ্যতি॥ ৩১ ॥

হে ত্রিবিক্রম, তোমার চরণপদ্মযুগল শঙ্খ, চক্র, কল্পবৃক্ষ, ধ্বজ, পদ্ম, অঙ্কুশ, ও বজ্র চিহ্নে সুশোভিত। কবে তাহা আমার মস্তককে অলঙ্কৃত করিবে? ৩১ ॥

বিরাজমানোজ্জ্বল পীতবাসসং
স্মিতাতসীসূনসমামলচ্ছবিম্।
নিমগ্ননাভিং তনুমধ্যমুন্নতম্
বিশাল বক্ষঃস্থলশোভিলক্ষণম্॥ ৩২ ॥

তুমি উজ্জ্বলপীত বস্ত্রে পরিশোভিত, প্রস্ফুটিত অতসী পুষ্পের ন্যায় তোমার নির্ম্মল রূপ, তোমার নাভি গভীর, মধ্যস্থল ক্ষীণ, আকার উন্নত, ও বিশাল বক্ষঃস্থলে সুলক্ষণ শোভা পাইতেছে॥ ৩২ ॥

চকাসতং জ্যাকিণ কর্কশৈঃ শুভৈঃ
চতুর্ভি রাজানুবিলম্বিভি র্ভুজৈঃ।
প্রিয়াবতংসোৎ পলকর্ণভূষণ
শ্লথালকাবংধ বিমর্দ্দশংসিভিঃ॥ ৩৩॥

তুমি জ্যাঘাত কর্কশ, মঙ্গলময়, আজানুলম্বিত ভুজচতুষ্টয়ে শোভা পাইয়া থাক; তোমার উক্ত হস্তচতুষ্টয় দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তুমি তৎসমুদয় দ্বারা নিজ প্রিয়ার মস্তকস্থ উৎপল, কর্ণভূষণ, ও শিথিলিত কেশবন্ধ মর্দ্দন করিয়াছ॥ ৩৩॥

উদগ্র পীনাংসবিলম্বিকুণ্ডলা-
লকাবলীবন্ধুরকম্বুকন্ধরম্।
মুখশ্রিয়ান্যক্কৃত পূর্ণনির্ম্মলা-
মৃতাংশু বিম্বাম্বুরুহোজ্জ্বলশ্রিয়ম্॥ ৩৪॥

তোমার কুণ্ডল, উচ্চ, স্থূল স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত, তোমার কম্বুগ্রীবা কেশ সমূহে অতিশয় গহন, তোমার মুখশোভার সহিত তুলনা করিলে নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র এবং পদ্মের উজ্জ্বল শোভাও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়॥ ৩৪॥

প্রবুদ্ধমুগ্ধাম্বুজচারুলোচনম্
সবিভ্রমভ্রূলতমুজ্জ্বলাধরম্।
শুচিস্মিতং কোমল গণ্ডমুন্নসং
ললাটপর্য্যন্তবিলম্বিতালকম্॥ ৩৫॥

তোমার সুন্দর নয়ন প্রস্ফুটিত, মনোহর পদ্মের ন্যায়, তোমার ভ্রূলতা বিভ্রমযুক্ত, অধর উজ্জ্বল, হাস্য নির্ম্মল, গণ্ডদেশ কোমল, নাসিকা উচ্চ, কেশপাশ ললাট পর্য্যন্ত লম্বিত॥ ৩৫॥

স্ফুরৎ কিরীটাঙ্গদহারকণ্ঠিকা-
মণীন্দ্রকাঞ্চীগুণনূপুরাদিভিঃ।
রথাঙ্গ শঙ্খাসি গদাধনুর্ব্বরৈঃ
লসত্তুলস্যা বনমালয়োজ্জ্বলম্॥ ৩৬॥

তুমি দীপ্তিমান্ কিরীট, অঙ্গদ, হার, কণ্ঠিকা, মণি শ্রেষ্ঠ, কাঞ্চী, নূপুর প্রভৃতি, চক্র, শঙ্খ, অসি, গদা, শ্রেষ্ঠ ধনুঃ, এবং সুন্দর তুলসীর সহিত বনফুলের মালায় উজ্জ্বল॥ ৩৬॥

চকর্থ যস্যা ভবনং ভুজান্তরং
তব প্রিয়ং ধাম যদীয়জন্মভূঃ।

জগৎসমগ্রং যদপাঙ্গ সংশ্রয়ম্
যদর্থমম্ভোধি রমন্থ্যবন্ধি চ ॥ ৩৭ ॥

তোমার বক্ষঃস্থলকে যাঁহার ভবন করিয়াছ, যাঁহার জন্মভূমি ক্ষিরোদ-সমুদ্র তোমার প্রিয় আবাসস্থান, যাঁহার কটাক্ষকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জগৎ অবস্থান করিতেছে, যাঁহাকে পাইবার জন্য সাগরকে মন্থন ও বন্ধন করা হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

স্ববৈশ্বরূপ্যেণ সদানুভূতয়া-
প্যপূর্ব্ববদ্বিস্ময় মাদধানয়া।
গুণেন রূপেণ বিলাসচেষ্টিতৈঃ
সদা তবৈবোচিতয়া তব শ্রিয়া ॥ ৩৮ ॥

যদিও সেই লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ সুখ স্বীয় বিশ্বরূপদ্বারা তুমি সর্ব্বদা অনুভব কর, তথাপি তিনি নিত্য নব নব ভাব ধারণ করিয়া তোমার বিস্ময় উৎপন্ন করেন, এবং গুণ, রূপ, বিলাস, ও চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বদাই তোমার উপযোগিনী হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তয়া সহাসীনমনন্তভোগিনি
প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান বলৈক ধামনি।
ফণামণিব্রাত ময়ূখমণ্ডল
প্রকাশ মানোদর দিব্যধামনি ॥ ৩৯ ॥

যে অনন্ত নাগ অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞান এবং বলের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার ফণাস্থিত মণি সমূহের কিরণমণ্ডলে তদীয় উদরের দিব্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তুমি উক্ত লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার উপর আসীন হইয়া থাক ॥ ৩৯ ॥

নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকো-
পধান বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তবশেষতাংগতৈঃ
যথোচিতং শেষ ইতীর্য্যতে জনৈঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ শেষ নাগ, স্বীয় শরীর ভেদে, নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, পরিচ্ছদ, উপধান, এবং বর্ষাতপনিবারক ছত্রের আকার ধারণ করিয়া অশেষ প্রকারে তোমার সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া লোকে তাঁহার "শেষ" এই সমুচিত আখ্যা দিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো
যস্তে বিতানং ব্যজনং ত্রয়ীময়ঃ।
উপস্থিতং তেন পুরো গরুত্মতা
ত্বদঙ্ঘ্রিসম্পর্ককিণাঙ্কশোভিনা ॥ ৪১ ॥

তোমার পাদসংঘর্ষ জনিত চিহ্নে যিনি শোভমান, যিনি তোমার দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, চন্দ্রাতপ, ও ব্যজন, এবং যিনি বেদময় বিগ্রহ, তোমার পুরোভাগে সেই গরুড় উপবিষ্ট থাকেন ॥ ৪১ ॥

ত্বদীয়ভুক্তোজ্ঝিত শেষ ভোজিনা
ত্বয়া বিসৃষ্টাত্মভরেণ যদ্যথা।
প্রিয়েণ সেনাপতিনা নিবেদিতম্
তথানুজানন্তমুদার বীক্ষণৈঃ ॥ ৪২ ॥

তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যিনি ভোজন করিয়া থাকেন, তুমি যাঁহার উপর স্বীয় পালনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছ, সেই প্রিয় সেনাপতি (বিষক্সেন) যাহা যেরূপ নিবেদন করেন, তোমার উদার দৃষ্টি দ্বারা তুমি সেইরূপই অনুমোদন কর ॥ ৪২ ॥

হতাখিল ক্লেশমলৈঃ স্বভাবতঃ
সদানুকূল্যৈকরসৈস্তবোচিতৈঃ।
গৃহীততত্তৎ পরিচার সাধনৈঃ
নিষেব্যমানং সচিবৈর্যথোচিতম্ ॥ ৪৩ ॥

যাহাদের সমুদয় দুঃখ ও মালিন্য নাশ পাইয়াছে, স্বভাবতঃ তোমার ইচ্ছার অনুকূলে থাকাই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, যাঁহারা তোমার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, স্ব স্ব কার্য্যসাধন দ্রব্য সমূহ যাঁহারা সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি সেই সকল সচিবগণ কর্তৃক যথোচিত সেবাযুক্ত হইয়া থাক ॥ ৪৩ ॥

অপূর্ব্ব নানারসভাব নির্ভর-
প্রবুদ্ধয়া মুগ্ধবিদগ্ধলীলয়া।
ক্ষণাণুবৎক্ষিপ্তপরাদি কালয়া
প্রহর্ষয়ন্তং মহিষীং মহাভুজম্ ॥ ৪৪ ॥

যাহা নানা নব নব রস ও ভাবরাশি দ্বারা উজ্জীবিত, যাহা কল্পব্যাপী সুদীর্ঘ কালকে নিমেষের অপেক্ষাও অত্যল্প বোধ করায়, সেই মনোহর, চতুরতাপূর্ণ ক্রীড়া দ্বারা, মহাভুজসম্পন্ন তুমি স্বীয় মহিষীকে আনন্দিতা করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

[স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরাজী হইতে, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।]

(৬২৩ পৃষ্ঠার পর।)

কিন্তু এই সময় হইতেই তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল ও এই তত্ত্বানুসন্ধান অন্তর্ম্মুখী ছিল। তাঁহারা মনের বিভিন্নাবস্থাসম্বন্ধে গভীরতর অনুশীলন করিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতেও উচ্চতরাবস্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমরা পৃথিবীর সমস্ত বিশিষ্ট ধর্ম্মে এই উচ্চাবস্থাকে ভাবাবস্থা বা প্রত্যাদিষ্টাবস্থা বলিয়া কথিত দেখিতে পাই। সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ, ভবিষ্যদ্বক্তাগণ বা অবতারগণ যেরূপ মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাহা জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থা নহে, কিন্তু সেঅবস্থায় তাঁহারা কতকগুলি অভিনব তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিকরাজ্যসম্বন্ধীয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আমরা জাগ্রদবস্থায় চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাসকল যেরূপ উপলব্ধি করি, তাঁহারা ততোধিক স্পষ্ট ভাবে এই সকল উপলব্ধি করিতেন। বর্ত্তমান সমস্ত ধর্ম্মে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম দেখুন। বেদ, ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া, কথিত হয়। এই সকল ঋষি কতকগুলি তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে এই 'ঋষি' শব্দের যথার্থ পরিভাষা মন্ত্রদ্রষ্টা—বৈদিক স্তোত্রসকলে নিবদ্ধ ভাবসকলের দ্রষ্টা। ইঁহারা কতকগুলি তত্ত্ব উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (যদ্যপি প্রত্যক্ষ কথাটি অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রতি ব্যবহৃত হইতে পারে) বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল তত্ত্ব তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহুদি ও খ্রীষ্টান উভয়ের মধ্যে আমরা ঠিক এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই।

দক্ষিণ-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে একটু আপত্তি হইতে পারে; এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, যদ্যপি বৌদ্ধেরা কোনরূপ ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, জীবনের এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে কিরূপ উদ্ভূত হইবে! ইহার উত্তর এই বৌদ্ধেরাও এক অনন্ত নীতিশাসন বিশ্বাস করেন এবং এই নীতিশাসন আমাদের বাক্যার্থ অনুযায়ী, বিচার পূর্ব্বক নিষ্কাসিত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধ অতীন্দ্রিয় অবস্থায় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধের জীবন চরিত অধ্যয়ন

করিয়াছেন সংক্ষেপে লিখিত 'লাইট অভ এসিয়া" নামধেয় সুন্দর কাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন এরূপ বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধ বোধিদ্রুম-তলে উপবিষ্ট ছিলেন, যতদিন না তিনি সেই অতিন্দ্রিয়াবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত শিক্ষা এই অবস্থা হইতে আসিয়াছে, মানসিক চিন্তা হইতে প্রসূত হয় নাই।

এইরূপে সকল ধর্ম্মই এই বিষম কথা বলিতেছে যে, মানব-মন কখন কখন যে কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে এরূপ নহে কিন্তু বিচার শক্তির সীমাও অতিক্রম করে। তখন ইহা এরূপ কতকগুলি তত্ত্বের সম্মুখীন হয় যাহা কখনই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিত না, বা বিচার করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এই সকল তত্ত্ব পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। অবশ্য আমাদিগের এই সকল তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত করিবার, বা ন্যায়ের পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে বর্ত্তমান ধর্ম্মসকল মানব-মনের এই শক্তি বিশেষের সম্বন্ধে এই অধিকার স্থাপন করিয়া থাকেন যে, ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে, বিচার-শক্তির সীমা অতিক্রম করিতে পারে এবং এই শক্তি তাঁহারা যথার্থ ঘটনা বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এই তত্ত্ব সকল কতদূর সত্য সে প্রশ্নের আলোচনা স্বতন্ত্র রাখিয়া আমরা তাহাদের একটী সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাই। ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব; পদার্থবিদ্যার স্থূল আবিষ্কারের ন্যায় নহে। এবং সমস্ত উচ্চতর বিশিষ্ট ধর্ম্মসকলে ইহার অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বের শুদ্ধরূপ ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে ও মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার আশ্রয় না লইয়া ধর্ম্মপ্রচারের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন দিগের পুরাতন সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের "আদর্শ একতা, নীতিশাসন" প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বর্ত্তমান নহে ইহাই দেখাইতেছে। আমাদের মধ্যে কেহই আদর্শ-মনুষ্য দেখেন নাই অথচ আমাদিগকে একটী আদর্শ মনুষ্যে বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে। আমাদের মধ্যে কেহই আজিও আদর্শ স্থানীয় পূর্ণ মনুষ্য দেখেন নাই অথচ সেই আদর্শ ব্যতিরেকে আমরা উন্নতি করিতে অক্ষম। অতএব এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে এই সত্যটি সমুন্নত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে একটী আদর্শ অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে ইহাকে আমাদের সম্মুখে ব্যক্তিরূপে বা ব্যক্তিত্ব শূন্য সত্তারূপে

বা শাসন রূপে বা বর্ত্তমানতারূপে বা সারতত্ত্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে এই আদর্শে আপনাকে উন্নত করতে আমরা সতত চেষ্টা করিতেছি।

মনুষ্য যেরূপই হউন, যেখানেই অবস্থিতি করুন প্রত্যেকেরই এক অনন্ত শক্তির আদর্শ আছে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই অনন্তসুখের এক আদর্শ আছে। আমাদের চারিদিকে যে সকল কার্য্য দেখিতে পাই, সর্ব্বত্র যে কর্ম্মশীলতা দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই এই অনন্তশক্তি বা অনন্তসুখের জন্য চেষ্টা জনিত। কিন্তু অল্প লোকেই ইহা সত্বর বুঝিতে পারেন যে যদিও তাঁহারা অনন্ত-শক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞান পথে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে অনন্তসুখ ইন্দ্রিয়জ্ঞান পথে পাওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ অনন্তকে প্রকাশ করিতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, দেহ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তকে প্রকাশ করা অসম্ভব এবং শীঘ্র বা বিলম্বে মনুষ্য অনন্তকে সান্তের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার উদ্যম বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করেন। এই বিসর্জ্জন এই উদ্যমের ত্যাগই ধর্ম্মনীতির ভিত্তি ভূমি। এই ত্যাগ-ভিত্তির উপরই ধর্ম্মনীতি স্থাপিত। এরূপ ধর্ম্মনীতি শাস্ত্র প্রচারিত হয় নাই ত্যাগ যাহার ভিত্তি ছিল না।

ধর্ম্মনীতি সর্ব্বদাই বলিতেছেন "আমি নই কিন্তু তুমি" অহং নহে কিন্তু নাহম" ইহাই ইহার স্মরনীয় বাক্য। ধর্ম্মনীতির শাসন সকল বলিতেছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মধ্য দিয়া অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখের চেষ্টা করিতে মনুষ্য যে ভ্রান্ত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জ্ঞানকে দৃঢ়াবলম্বন করেন তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। নিজেকে সর্ব্বশেষে রাখিয়া, অপরকে তোমার অগ্রে স্থাপিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলিতেছে "আমি প্রথম" ধর্ম্মনীতি বলিতেছে "আমি নিজেকে সর্ব্ব-শেষে রাখিব"। এইরূপে ধর্ম্মনীতির সমস্ত শাসন এই ত্যাগের উপর স্থাপিত। ইহা জড়ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন,নির্ম্মাণ নহে। জড়ক্ষেত্রে অনন্ত কখনই প্রস্ফুরিত হইতে পারিবে না ইহা অসম্ভব, ইহা চিন্তাতীত।

(ক্রমশঃ)

এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে সকল কুসংস্কারে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে স্মরণ করিয়া হাসিব, আর আনন্দ সত্য ও দৃঢ়তার সহিত বলিব, আমিই তিনি, তাহাই ছিলাম এবং সর্ব্বদাই তাহাই থাকিব।

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

প্রথম প্রস্তাব।

আমাকে অনেকে বেদান্তদর্শনের কার্য্যজীবনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মত খুব ভাল বটে, কিন্তু উহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, ইহাই প্রকৃত সমস্যা। যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু পরিচালনা ব্যতীত উহার অপর কোন মূল্য নাই। অতএব বেদান্ত যদি ধর্ম্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে বিশেষরূপ কার্য্যকরী হইতে হইবে। আমরা যেন আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও যেন দূর হইয়া যায়, কারণ, বেদান্ত একত্ব শিক্ষা দেন—বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। ধর্ম্মের আদর্শসমূহ জীবনের সমুদয় অংশকে যেন আচ্ছাদন করে, উহা যেন আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে প্রবেশ করে ও কার্য্যেও যেন উহাদের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কল্পিত, সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতের বিষয়ই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্ব্বতগহ্বর নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে তাহারা আবার কোলাহলময় নগরীর কার্য্যবহুল রথ্যাসমূহে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই মতগুলির আমরা আর একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, এই চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জ্জন অরণ্যবাসের ফল নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহাদের প্রণেতা।

শ্বেতকেতু, আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থ ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চালদিগের নগরে তাঁহাদিগের রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জান?'—'না।' কিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান?'—'না।' 'তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ?' রাজা এইরূপ আরো অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না; তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কিছুই জান না।' বালক পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, 'আমিও এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না?' তখন তাঁহারা পিতাপুত্রে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই রহস্যের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, এই বিদ্যা—এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ব্রাহ্মণেরা কখন ইহা জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি তৎপরে এতৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই এক কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নহে, কিন্তু উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত মস্তিষ্ক সকলের চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজার অপেক্ষা কর্ম্মে ব্যস্ত মানুষ আর কাহাকেও কল্পনা করা যায় না, কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে সমুদয় বিষয়ই দেখাইতেছে যে, এই দর্শন অবশ্যই খুব কার্য্যকরী হইবে, আর পরবর্ত্তী কালের ভগবদ্গীতা যখন আমরা আলোচনা করি, (আপনারা অনেকেই বোধ হয়, ইহা পড়িয়াছেন; ইহা বেদান্তদর্শনের একটী সর্ব্বোত্তম ভাষ্য) তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সংগ্রামস্থল এই উপদেশের কেন্দ্র—তথায়ই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কর্ম্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার অনন্ত শান্তভাব। এই তত্ত্বকে কর্ম্মরহস্য বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্ম্ম বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে ত আমাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালগুলিই

পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা ত নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের গুঁড়ি এই গুলিই ত তাহা হইলে জগতে মহা তপস্বী বলিয়া বিখ্যাত হইত; তাহারাও ত নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলে তাহাই যে কার্য্যনামের উপযুক্ত হয়, তাহা নহে। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, যে স্থিরতা কখন নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের যে সমভাব কখন ভঙ্গ হইবার নয়। আর আমরা বহুদর্শিতা দ্বারা ইহা জানিয়াছি, কার্য্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই উপযুক্ত।

আমাকে অনেকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কার্য্যের জন্ত যেরূপ একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, সেরূপ আগ্রহ না থাকিলে কার্য্য কিরূপে করিব? আমিও অনেক দিন পূর্ব্বে ইহাই মনে করিতাম, কিন্তু আমার যতই বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই আমি দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কার্য্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল আর আমরা তত অধিক কার্য্য করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে পরিচালিত হইতে থাকি, আমরা তখন শক্তির বিশেষ অপব্যয় করিয়া থাকি, আমাদের স্নায়ুগুলীকে বিকৃত করিয়া ফেলি—মনকে চঞ্চল করিয়া তুলি, কিন্তু খুব কম কার্য্য করিতে পারি। যে শক্তি কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বৃথা ভাবমাত্র হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল যখন মন বিশেষ শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। আর যদি তোমরা জগতের বড় বড় কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে, তাহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুতেই যেন তাঁহাদের পা পিছলাইত না। এই জন্যই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা বেশী কায করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে তদপেক্ষা বেশী কায করিতে পারে। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা বা অন্ত কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, কিন্তু সে বড় কাযের লোক হয় না। কেবল শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়া থাকে।

বেদান্ত আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ অবশ্য

বাস্তব হইতে—আপাতকার্য্যকরী বিষয় হইতে—অনেক উচ্চ, তাহাও আমরা জানি। আমাদের জীবনে দুইটী গতি দেখিতে পাওয়া যায়—একটী আমাদের আদর্শকে জীবনোপযোগী করা, আর অপরটী এই জীবনকে আদর্শোপযোগী গঠন করা। এইটি বিশেষ বুঝা উচিত—কারণ, আমাদের আদর্শকে জীবনোপযোগী করিয়া লইতে আমরা অনেক সময়ে প্রলুব্ধ হইয়া থাকি। আমার ধারণা, আমি কোন বিশেষ প্রকার কার্য্য করিতে পারি। হয়ত তাহার অধিকাংশই খারাপ। ইহার অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়ত ক্রোধ, ঘৃণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে। এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা, আত্মসুখ ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ের উপদেশ দেন, যাহা আমার সমুদয় স্বার্থপরতার, সমুদয় অসাধুভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যেমন 'শাস্ত্রীয়' 'অশাস্ত্রীয়' কথা লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে; আমি যাহা বুঝি, তাহা শাস্ত্রীয়—তোমার মত অশাস্ত্রীয়। 'কার্য্যকরী' কথাটী লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। আমি যাহা কার্য্যকরী বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্য্যকরী। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে করি, দোকানদারীই একমাত্র কার্য্যকরী ধর্ম্ম। যদি আমি চোর হই, আমি মনে করি, চুরী করিবার উত্তম কৌশলই সর্ব্বোত্তম কার্য্যকরী ধর্ম্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা এই 'কার্য্যকরী' শব্দ কেমন আমরাই যাহা করিতে পারি সেই বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া থাকি—অবশ্য তাহা আবার এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমরা যে সকল অবস্থার মধ্যে আছি, তাহার মধ্যে। এইহেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিয়া রাখিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্য্যকরী বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে কার্য্যকরী নহে, আদর্শ হিসাবে উহা কার্য্যকরী। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখ স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শ, আদর্শ নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমসি', তুমিই সেই ব্রহ্ম, ইহার সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি এই। ইহার নানাবিধ বিচার পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদির পর তুমি পাও এই যে, মানবাত্মা শুদ্ধস্বভাব ও সর্ব্বজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখনও জন্মানও নাই, কখনও মরিবেনও না, আর আমি মরিব বা

মরিতে ভীত, এসব ভাব কেবল কুসংস্কারমাত্র। আর আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না, ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম্ম বলে, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক্ সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, সে নাস্তিক, সেইরূপ বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন। অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, তাহার কোন সন্দেহ নাই, আর আমরা অনেকেই বিবেচনা করি, ইহা কখনই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইবে না, কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়রূপে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের ভেদ নাই, বালক বালিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন—কোন কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ, বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই অনুভূত, পূর্ব্ব হইতেই উহা রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে। আমরা নিজেরাই আমাদের চক্ষে হাত চাপা দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে, প্রথম হইতেই আলোক ছিল। অন্ধকার কখনই ছিল না, দুর্ব্বলতা কখনই ছিল না, আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি, আমরা দুর্ব্বল; আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি, আমরা অপবিত্র। এইরূপে বেদান্ত যে, আদর্শকে শুধু কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় বলেন, তাহা নহে, কিন্তু বলেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ, আর এই আপাতপ্রতীয়মান আদর্শ কিন্তু প্রকৃত বাস্তব সত্তাই আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই মিথ্যা। যখনই তুমি বল, আমি মর্ত্ত্য ক্ষুদ্র জীব, তখনই তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি যেন যাদুবলে আপনাকে অসৎ দুর্ব্বল দুর্ভাগ্য করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপস্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্ব্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই—আপনাকে দুর্ব্বল, পাপী এবং হতভাগ্য জীব বলা—এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ, যখনই তুমি ঐরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন যে শৃঙ্খল তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে আরও দৃঢ় করিলে,

তুমি তোমার আত্মাকে পূর্ব্ব হইতে অধিক মায়া আবরণে আবৃত করিলে। অতএব যে কেহ আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত ; যে কেহ আপনাকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত আর সে জগতে একটী অসৎ চিন্তার স্রোত প্রক্ষেপ করিতেছে। এইটী যেন আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে যে, বেদান্তে আমাদের এই বর্ত্তমান মায়াময় জীবনকে—এই মিথ্যা জীবনকে—আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই—কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহার পশ্চাতে যে সত্য জীবন সদা বর্ত্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। এমন নহে যে, মানুষ পূর্ব্বে একটুকু পবিত্র ছিল, তাহা হইতে পবিত্রতর হইল। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণশুদ্ধ আছে—সেই পূর্ণশুদ্ধস্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র। আবরণ চলিয়া যায়, এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে।

বৈদান্তিক আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্ব্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই সত্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ লোকও ছিলেন না, কিন্তু যাঁহারা (আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে) বিশেষরূপে কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন, যাঁহাদিগকে সৈন্য পরিচালনা করিতে হইত, যাঁহাদিগকে সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত—আবার তখনকার কালে রাজারাই সর্ব্বময় ছিলেন—এখনকার মত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা এই সকল তত্ত্বের চিন্তা ও উহাদিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে উহা শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের এ তত্ত্ব অনুভব করা ত অনেক সহজ, কারণ, তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবন ত অনেকটা কর্ম্মশূন্য। অতএব আমাদের যখন এত কায কম, আমরা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, তখন আমরা যে ঐ সকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথা। পূর্ব্বকালীন সর্ব্বময় সম্রাড়্গণের অভাবের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব ত কিছুই নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণ্য অক্ষৌহিণীপরিচালক অর্জ্জুনের যত অভাব, আমার অভাব তাহার তুলনায় কিছুই নয়, তথাপি এই

যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা কহিবার এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবারও সময় পাইলেন সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বিলাসময় জীবনেও ইহা পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সদ্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব, আমরা যতটা ভাবি বা যতটা জানি, তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা সাবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটা আদর্শ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কখনই নীচু করা উচিত নয়। এইটী আমাদের জীবনে এক বিশেষ বিপদাশঙ্কা। অনেক ব্যক্তি আছেন—তাঁহারা আমাদের বৃথা অভাব সকলের, বৃথা বাসনা সকলের জন্য নানা প্রকার বৃথা কারণ প্রদর্শন করেন—আর আমরা মনে করি, আমাদের উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা কখনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে—বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত করিতে হইবে।

কারণ, তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তের মূলকথা এই একত্ব। দুই কোথাও নাই, দুই প্রকার জীবন নাই, অথবা দুটী জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা ও সকল কথা একেবারে পরিত্যাগ করেন। একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই একসত্তা মাত্র; প্রভেদ পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে। বেদান্ত এরূপ কথা সকল একেবারে অস্বীকার করেন যে, পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তাহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদের খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

কতকগুলি লোক অনুগ্রহ করিয়া জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারিণী সভা (Anti-vivisection society) স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই সভার এক জন সভ্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বন্ধো, আপনারা খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দুই একটা পশুহত্যার এত বিরোধী কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগণ আমাদিগের খাদ্যের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।' বাস্তবিক

সেই একত্বের মধ্যে পশুগণও অন্তর্ভুক্ত। যদি মানুষের জীবন অনন্ত হয়, পশুরও তদ্রূপ। কেবল পরিমাণগতভেদ, প্রকারগত নহে। আমিও যেমন, ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্রূপ—প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্ব্বোচ্চ সত্তার দিক্ হইতে দেখিলে এ সকল প্রভেদও থাকে না। মানুষ অবশ্য ঘাস ও একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের ভিতর অনেক প্রভেদ দেখিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি খুব উচ্চে আরোহণ কর, তবে ঘাস ও বৃহত্তম বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমান হইয়া যায়। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টি হইতে এ সকলগুলিই সমান—আর যদি তুমি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমায় পশুগণের সহিত উচ্চতম প্রাণীর পর্য্যন্ত সমতা মানিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবান ত একজন মহাপক্ষপাতী হইলেন। যে ভগবান মনুষ্যনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাত-সম্পন্ন, আবার পশুনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত নির্দ্দয়, তিনি দানব হইতেও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করার অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও স্বীকৃত হইব। আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর এরূপ নহেন। যাহারা ওরূপ বলে, তাহারা জানে না, তাহারা দায়িত্ববোধহীন, হৃদয়হীন ব্যক্তি,—তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এখানে আবার 'কার্য্যকরী' শব্দটী ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমরা খাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ ভোজনের আদর্শটা বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনাবিশেষে আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি, উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্ব্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই—মাংস ভোজন না করা—কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা, কারণ, পশুগণও আমার ভ্রাতা—বিড়াল ও কুকুরও তদ্রূপ। যদি তাহাদিগকে এরূপ চিন্তা করিতে পার, তবে তুমি কতকটা সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাবের দিকে অগ্রসর হইয়াছ—শুধু মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃভাব বলিয়া চীৎকার নহে—উহা ত বৃথা চীৎকার মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, ইহা অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ, তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যদি তুমি এমন এক মতের কথা বল, যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যের—বর্ত্তমান আচরণের পোষকতা হয়, তবে তাহারা বলে, ইহা কার্য্যকরী বটে।

শব্দে বা যূপের অর্থ কূপ শব্দে বা কূপের অর্থ যূপ শব্দে বা স্থূপের অর্থ কূপ শব্দে বা কূপের অর্থ সূপ শব্দে অথবা যূপ শব্দের অর্থ সূপ শব্দে দেখা যায় না, অর্থাৎ কূপ শব্দে জলাশয় না বুঝাইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যূপরূপ যজ্ঞীয় কাষ্ঠকে বা সূপ রূপ ডাল বা ঝোলকে বুঝায় না; এইজন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহ সংঘাত অর্থাৎ একত্র মিলিত হইয়া শব্দান্তর হইলে, সেই শব্দান্তরেরই এমন একজাতীয় শক্তি থাকে যে, তাহা পূর্ব্বশব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে বর্ত্তমান থাকে।

ইদং খল্বপি ভবতা বর্ণানামর্থবত্তাং ব্রুবতা সাধীয়োঽনর্থকত্বং দ্যোতিতম্। যোহি মন্যতে যঃকূপে কূপার্থঃ স ককারস্য; যঃসূপে সূপার্থঃ স সকারস্য; যোযূপে যূপার্থঃ স যকারস্যেতি। উপশব্দস্তস্যানর্থকঃ স্যাৎ। তত্রেদমপরিহৃতং সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চেতি। এতস্যাপি প্রাতিপদিকসংজ্ঞায়াং পরিহারং বক্ষ্যতি॥

এইরূপ হইলেও "বর্ণসমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট" এইরূপ বর্ণনকারী আপনারই দ্বারা অধিকতররূপে বর্ণসমূহের অনর্থকত্ব দ্যোতিত (প্রকাশিত) হইল। যে হেতু, যাহা মনে করা হইয়াছিল যে;—কূপে যে কূপার্থ, তাহা ককারের, সূপে যে সূপার্থ, তাহা সকারের, এবং যূপ শব্দে যে যূপার্থ, তাহা যকারের; তাহারই মতে, কূপাদি শব্দের 'ক'কার 'স'কারাদি অর্থবিশিষ্ট অংশ বাদ দিলে যে অবশিষ্ট উপ শব্দ রহিল, তাহা ত অর্থহীনই হইল। অর্থাৎ উ, প্, এই দুইটী বর্ণই যদি অর্থহীন হইল, তবে আর বর্ণসমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট কিরূপে হইবে? ইহা দ্বারাই মানিতে হইবে যে, কূপ শব্দ সমুদায় এক অর্থবাচক এবং সূপ শব্দেরও স্, উ, প্, অ, সমুদায় একত্র মিলিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচক।

এইরূপ হইলেও সেখানে ইহারও কোন পরিহারই (খণ্ডন) হইল না যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছিল "সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চ" অর্থাৎ একত্র মিলিত বর্ণ সমূহ অর্থবিশিষ্ট বলিয়া, তাহার অবয়বস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণও অর্থবিশিষ্ট। এই যুক্তিরও পরিহার (খণ্ডন) প্রাতিপদিক সংজ্ঞায় অর্থাৎ "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্। ১। ২ ৪৫।" এই সূত্রের ব্যাখ্যান কালে বলা হইবে।

সূত্রমূলম্।—অ ই উ ণ্, ঋ ৯ক্, এ ওঙ্, ঐ ঔ চ্॥

ভাষ্যমূলম্ —প্রত্যাহারেঽনুবন্ধানাং কথমজ্‌গ্রহণেষু ন ন (১)।

(১) 'প্রত্যাহারেঽনুবন্ধানাং কথমজ্‌গ্রহণেষু ন। আচারাদপ্রধানত্বাল্লোপশ্চ বলবত্তরঃ।' এই শ্লোককে ভাষ্যকার পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

য এতেঽস্মিন্ প্রত্যাহারার্থা অনুবন্ধাঃ ক্রিয়ন্তে এতেষামজ্গ্রহণেন গ্রহণং কস্মান্ন ভবতি। কিং চ স্যাৎ। দধিণকারীয়তি মধুণকারীয়তি। ইকোযণচীতি যণাদেশঃ প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদঃ—অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্ প্রভৃতি প্রত্যাহারে,ণ্ ক্, ঙ্, চ্ প্রভৃতি যে সকল অনুবন্ধ (ইৎসংজ্ঞক) বর্ণ আছে, অচ্ সংজ্ঞাতে তাহাদের গ্রহণ হয়না কেন ? অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে প্রত্যাহারের জন্য এই যে অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট বর্ণসমূহ প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'অচ্' সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কোনও কার্য্যকালে ইহাদের গ্রহণ হয় না কেন ?

অনুবন্ধ বর্ণের, 'অচ্' মধ্যে গ্রহণ হইলই বা, তাহাতে দোষ কি হইবে ?

তাহাতে দোষ এই হইবে যে,—"দধি+ণকারীয়তি", "মধু+ণকারীয়তি" প্রভৃতি স্থলে, দধি এবং মধু শব্দের পর, 'ণ'কার থাকাতে, "ইকোযণচি" সূত্রানুসারে, 'যণ্' আদেশ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সূত্রে আছে যে, 'ইক্', (ই, উ ঋ ৯ ক্) এর স্থানে 'যণ' (যবরট্, লণ্) হয়,'অচ্' (অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্, এ ও ঙ্, ঐ ঔ চ্) পরে থাকিলে, সুতরাং প্রত্যাহারে যদি অনুবন্ধের গ্রহণ হয়, তবে 'অচ্' প্রত্যাহারে, 'ণ্, ক্, ঙ্, চ্,' এই অনুবন্ধবর্ণসমূহেরও গ্রহণ হইবে ; অতএব 'ণ কার পরে থাকিলেও 'দধি' শব্দের ইকার স্থানে যকার (দধ্যণকারীয়তি) এবং 'মধু' শব্দের উকার স্থানে বকার (মধ্বণ-কারীয়তি) হইবে।

ভাষ্যমূল।—আচারাৎ। ৭

কিমিদমাচারাদিতি। আচার্য্যাণামুপচারাৎ। নৈতেষাচার্য্যা অচ্কার্য্যাণি কৃতবন্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'অচ্' সংজ্ঞামধ্যে অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণ করিলে যে পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ হয়, তাহা বারণ হইবে কিরূপে ? এই শঙ্কার উত্তর দিতে-ছেন,—"আচারাৎ"।

"আচারাৎ" এই কথা বলিলে কি বুঝায় ?

আচার্য্যগণের উপচার (আচার) অর্থাৎ ব্যবহার দ্বারাই জানা যাইবে যে, 'অচ্' সংজ্ঞামধ্যে অনুবন্ধবর্ণের গ্রহণ হয় না। ণ্, ক্, ঙ্, চ্, এই সকল অনুবন্ধ-বর্ণসমূহে, (পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি) আচার্য্যগণ, অচ্ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কোন কার্য্য করেন নাই ; এই জন্যই জানা যাইতেছে যে, অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—অপ্রধানত্বাৎ ণ্। অপ্রধানত্বাচ্চ। ন খল্বপ্যেতেষামচ্ষু প্রাধান্যেনোপদেশঃ ক্রিয়তে। ক্ব তর্হি। হল্‌ষু। কুত এতৎ। এষা হ্যাচার্য্যস্য শৈলী লক্ষ্যতে। যত্তুল্যজাতীয়াস্তুল্যজাতীয়েষূপদিশতি। অচোঽচ্ষু। হলোহল্‌ষু।

ভাষ্যানুবাদ।—অপ্রধানত্বহেতু ণ্।

অপ্রধানত্বহেতুও জানিতে হইবে যে, 'অচ্' সংজ্ঞামধ্যে অনুবন্ধবর্ণের গ্রহণ হয় না। এই সকল অনুবন্ধবর্ণসমূহের, কখনও (আচার্য্য) 'অচ্'সংজ্ঞামধ্যে প্রধানরূপে উপদেশ করেন নাই।

তবে কোথায় (অনুবন্ধের) প্রধানরূপে উপদেশ করিয়াছেন?

'হল্' সংজ্ঞা মধ্যে।

ইহা কিরূপে জানিলে?

আচার্য্যের শৈলীই (সঙ্কেত) এইরূপ দেখা যায় যে, তুল্যজাতীয় বিষয়, তাহার তুল্যজাতীয় বিষয়েই উপদেশ করেন। এই জন্যই জানিতে হইবে যে, 'অচ্', অচেরই মধ্যে, আর হল্, হলেরই মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। অতএব অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে ণ্, ক্ প্রভৃতি 'হল্' বর্ণ কদাপি গ্রহণ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—লোপশ্চ বলবত্তরঃ। লোপঃ খল্বপি তাবদ্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সকল প্রকারের বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান্। যাবতীয় অনুবন্ধবর্ণসমূহই লোপ হইয়া থাকে। এই জন্যও অচ্ প্রত্যাহার মধ্যে, অনুবন্ধবর্ণসমূহের গ্রহণ হয় নাই।

ভাষ্যমূল।—ঊকালোঽজিতি বা যোগস্তৎকালানাং যথা ভবেৎ। অচাং গ্রহণমচ্কার্য্যং তেনৈষাং ন ভবিষ্যতি ণ্। অথবা যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। ঊকালোঽচ্। উ ঊ উ৩ ইত্যেবং কালোঽজ্ ভবতি। ততো হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞশ্চ ভবতি। ঊকালোঽচ্।

এবমপি কুক্কুট ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত এব পরিহারঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ("ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ" ১। ২। ২৭। উঊউ৩, ইহাদের কালের ন্যায় কাল যাহার, সেই 'অচ্' অর্থাৎ স্বরবর্ণ, যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া থাকে) 'ঊকালোঽচ্' এই পর্য্যন্ত যোগবিভাগ করিব। তাহার কারণ এই যে, তাহাদের (হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ এবং প্লুত উ৩র) কালের ন্যায় কাল যেই অচের, তাহারই গ্রহণ যাহাতে হইতে পারে। তাহা হইলে অচ্ সংজ্ঞার মধ্যে হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রাবিশিষ্ট, দীর্ঘ অর্থাৎ দুই

মাত্রাবিশিষ্ট এবং প্লুত অর্থাৎ তিনমাত্রাকালবিশিষ্ট অচ্ প্রযুক্ত হইবে। আর সেই হেতুই এই সকলের (ণ্, ক্, ঙ্, চ্, প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জন [অনুবন্ধ] বর্ণসমূহের) অচ্ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কার্য্য হইবে না৭।

অথবা "ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ," এই সূত্রের যোগবিভাগ করা হইবে। তাহার একভাগ হইবে, 'ঊকালোঽচ্'। অর্থ হইবে,—উ ঊ উ৩ (এক মাত্রা, দুইমাত্রা, তিনমাত্রা বিশিষ্ট উ ঊ উ৩) ইহাদের ন্যায় কাল যার, তাহারই অচ্ সংজ্ঞা হয়। (অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট অনুবন্ধবর্ণ ব্যঞ্জনের, অচ্ সংজ্ঞা না হওয়ার জন্য, এরূপ করা হইল।)

অবশেষে সূত্রের অবশিষ্টাংশ "হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ" যোগ করা হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের (উ ঊ উ৩ ইহাদের কালের ন্যায় কাল যার) যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞাও হইবে।

শ্লোকান্থিত 'ঊকালোঽচ্' এর ব্যাখ্যা করা হইল।

যদি এই প্রকারে,একমাত্রা,দুইমাত্রা বা তিনমাত্রাবিশিষ্ট বর্ণেরই অচ্ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কার্য্য হয়, তবে 'কুক্কুট' শব্দের 'ক'কারে, দুইটী অর্দ্ধমাত্রা মিলিত হইয়াও ত একমাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে এই স্থলেও অচ্ সংজ্ঞা প্রযুক্ত কার্য্যপ্রাপ্তি হইবে?

এইস্থলে দোষ হয় সত্য; সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত পরিহার (খণ্ডন) ই সঙ্গত। অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, "আচারাৎ" (আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা) ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারাই অচ্ কার্য্যে অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণ হয় না; এইরূপে খণ্ডনই সঙ্গত জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্—এষ এবার্থঃ। অপর আহ। হ্রস্বাদীনাং বচনাৎপ্রাগ্যাবত্তাবদেব যোগোঽস্তু। অচ কার্য্যাণি যথা স্যুস্তৎকালেষক্ষু কার্য্যাণি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে অনুষ্টুপ্ ছন্দে যাহা বলা হইয়াছে, এই অর্থই অপরে নিম্নলিখিত রূপ আর্য্যাছন্দে বলিয়া থাকে, যথাঃ—"ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ", এই সূত্রে "হ্রস্বাদি বাক্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অংশ, সেই পর্য্যন্তই পৃথক্ এক যোগ হউক। তাহা হইলেই এইরূপ অর্থ হইবে যে,—যেখানে অচ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কার্য্য হইবে, সেখানেই তত্তুল্যকালবিশিষ্ট অচের (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের) কার্য্য হইবে।" অতএব অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনের হ্রস্বদীর্ঘাদি সংজ্ঞা হয় না বলিয়া, অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে,ণ্, ক্, প্রভৃতি বর্ণ থাকিলেও, তাহাদের অচ্ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কার্য্য হইবে না। কিন্তু তথাপি, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, 'কুক্কুট' শব্দে, দোষ

থাকিবেই। সুতরাং প্রথমতঃ "আচারাৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা যে দোষ পরিহার করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত।

ভাষ্যমূলম্।—অথ কিমর্থমন্তঃস্থানামণ্ সূপদেশঃ ক্রিয়তে। ইহ সয়ঁ্যন্তা সব্ঁৎসরঃ যল্ঁলোকং তল্ঁলোকমিতি পরসবর্ণস্যাসিদ্ধত্বাদনুস্বারস্যৈব দ্বির্বচনম্। তত্র পরস্য পরসবর্ণে কৃতে তস্য যয়্গ্রহণেন গ্রহণাৎ পূর্ব্বস্যাপি পরসবর্ণ যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—অতঃপর বিচার্য্য এই যে, অন্তঃস্থবর্ণ (য র ল ব) সমূহের 'অণ্' প্রত্যাহার মধ্যে উপদেশ করা হইল কেন?

সয়ঁ্যন্তা, সব্ঁৎসরঃ, যল্ঁলোকং, তল্ঁলোকম্ এই সকল স্থানে, পরসবর্ণবিধায়ক ("অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ। ৮।৪।৫৮।") শাস্ত্র, অত্যন্ত পরে বলিয়া (তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "অনচি চ" ৮।৪।৪৭। [২] শাস্ত্রের দৃষ্টিতে, পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্। ৮।২।১। [৩] সূত্রানুসারে) অসিদ্ধ হওয়াতে, অনুস্বারের প্রথমতঃ দ্বিত্ব হইবে। সেখানে ঐ দুই অনুস্বারের পরবর্ত্তী অনুস্বারকে পরসবর্ণ করিলে, (৪) যে যঁকার বঁকার লঁকার প্রভৃতিরও যয় (৫) প্রত্যাহারের গ্রহণেই গ্রহণ হইবে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রকৃতিগত

(১) যয়্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, অনুস্বারের স্থানে পরসবর্ণ হয়।

(২) অচ্এর পর যে যর্, তাহার দ্বিত্ব হয়; কিন্তু অচ্ পরে থাকিলে হয় না।

(৩) ৮ম অধ্যায়ের ২য় পাদ হইতে পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

(৪) অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ১। ১।৬৯। (ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। যদি যকার বকার প্রভৃতি অন্তঃস্থ বর্ণ, অণ্প্রত্যাহারমধ্যে পাঠ না হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত এই সূত্রানুসারে, যকার এবং বকারের সবর্ণ, যঁকার এবং বঁকার হইত না। সুতরাং পরবর্ত্তী অনুস্বার স্থানে যে অনুনাসিক যঁকার হইয়াছে, সেই যঁকার পরে থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারের স্থানে আর যঁকার হইবে না।

(৫) সংস্কৃত ভাষায় যকারে এবং য়কারে কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু উচ্চারণে প্রভেদ আছে। যকার যদি কোন শব্দের পরে কিংবা মধ্যে হয়, তবে তাহার 'য়' উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু অনুস্বার বা অনুনাসিক বর্ণের পরে যদি থাকে, তবে নিয়তই য উচ্চারণ হইয়া থাকে।

অনুস্বারেরও পরসবর্ণ যাহাতে হইতে পারে, এই জন্য অন্তঃস্থবর্ণের অণ্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করিতে হইবে। (২)।

ভাষ্যমূলম্।—নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। বক্ষ্যত্যেতৎ। দ্বির্বচনে পরসবর্ণত্বং সিদ্ধং বক্তব্যমিতি যাবতা সিদ্ধত্বমুচ্যতে পরসবর্ণ এব তাবদ্ভবতি। পরসবর্ণে তর্হি কৃতে তস্য যর্ গ্রহণেন গ্রহণাদ্দ্বির্বচনং যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—এই (পূর্ব্বোক্ত) ফল কার্য্যসিদ্ধির জন্য, অন্তঃস্থবর্ণের অণ্ প্রত্যাহারে পাঠের প্রয়োজন নাই। কারণ, এইরূপ (বার্ত্তিক) বলা হইবে যে,—"দ্বিত্বরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, পরসবর্ণ সিদ্ধই হয়, এইরূপ বক্তব্য।"

এই বার্ত্তিকে, যে হেতু (কাত্যায়ন ঋষি কর্ত্তৃক) সিদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই হেতুই পরসবর্ণ হইবে।

হইলই বা এই বার্ত্তিকানুসারে অনুস্বারের পরসবর্ণ ; অনুস্বারের পরসবর্ণ যঁকার বঁকারাদি করিলেও ত, সেই পরসবর্ণীকৃত যঁকার বঁকারের যাহাতে যর্ প্রত্যাহারে গ্রহণ হইতে পারে, যাহাতে সেই পরসবর্ণীকৃত যঁকার বঁকারাদির দ্বিত্ব [অনচি চ। ৮। ৪। ৪৭) সূত্রানুসারে (১)] হইতে পারে, সেজন্যও ত অন্তঃস্থ বর্ণসমূহের 'অণ্' প্রত্যাহারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—মাভূদ্দ্বির্বচনম্। ননু চ ভেদো ভবতি। সতি দ্বির্বচনে ত্রিযকারকমসতি দ্বির্বচনে দ্বিযকারকম্। নাস্তি ভেদঃ। সত্যপি দ্বির্বচনে দ্বিযকারকমেব। কথম্। হলো যমাং যমি লোপ ইত্যেবমেকস্য লোপে ন ভবিতব্যম্।

ভাষ্যানুবাদঃ—(যঁকারের) দ্বিত্ব নাই বা হইল ? যদি বল যে,—(যঁকারের) দ্বিত্ব না করিলে (প্রয়োগ) ভেদ (ভিন্ন) হইবে। কারণ, দ্বিত্ব 'যঁ' হইলে তিন যকারবিশিষ্ট প্রয়োগ হইবে ; আর 'যঁ' দ্বিত্ব না হইলে, দুই যকারবিশিষ্ট প্রয়োগ হইবে ?

(১) সং+যন্তা ; এইস্থলে অচের পরস্থিত যরের দ্বিত্ব হয় বলিয়া অনুস্বার শর্ প্রত্যাহারে পাঠ হওয়াতে অনুস্বারের দ্বিত্ব সংংযন্তা এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিত্ববিধায়ক 'অনচি চ' এই সূত্রের দৃষ্টিতে পরসবর্ণবিধায়ক 'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ', সূত্র অসিদ্ধ বলিয়া, প্রথমতঃ অনুস্বারের দ্বিত্বই হইল। এবং পরে, পর অনুস্বারের পরসবর্ণ 'যঁ'কার ('সংযঁ যন্তা' এইরূপ) হইল। এক্ষণে, এই সবর্ণীভূত 'যঁ'কারের, 'যর্'প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ না হইলে, পুনঃ আর অবশিষ্ট অনুস্বারের (সং যঁন্তার সং'এর) পরসবর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব 'সযঁ্ যঁ্যন্তা' এইরূপ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ইহাতে কোন রূপ প্রয়োগের ভেদ হইবে না। কারণ, যঁকারের দ্বিত্ব করিলেও দুই যকারই হইবে।

কিরূপে? হলোযমাং যমিলোপঃ। ৮। ৪। ৬৪। (হল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত যে, 'যম্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার লোপ হয়, 'যম্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, পূর্ব্বস্থিত একটী 'য'কারের লোপ করিলেই, যে পক্ষে তিনটী যঁকার হইবে, সেই পক্ষেও দুই 'যঁ'কারই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএবই কোন ভেদ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—এবমপি ভেদঃ। সতি দ্বির্ব্বচনে কদাচিদ্দ্বিযকারকং কদাচিৎত্রিযকারকম্। অসতি দ্বিযকারকমেব। স এষ কথং ভেদোন স্যাদ্ যদি নিত্যো লোপঃ স্যাদ্ বিভাষা চ স লোপঃ। যথাঽভেদস্তথাস্তু।

ভাষ্যানুবাদ এইরূপ (এক যকারের লোপ) করিলেও ভেদ হইবে। কারণ দ্বিত্ব হইলে, কখনও দুই যকার, কখনও তিন যকার বিশিষ্ট প্রয়োগ হইবে; কিন্তু দ্বিত্ব না হইলে, কেবল মাত্র দুই 'য'কার বিশিষ্ট প্রয়োগই হইবে।

সেই এই ভেদ, কি হইলে হইত? না, যদি ('হল্'এর পরস্থিত 'যম্'এর 'যম্' পরে থাকিলে) লোপ নিত্য হইত। কিন্তু ('যম্'এর) লোপও বিকল্পে হইয়া থাকে। অতএব (বিকল্পে) প্রয়োগের ভেদ (দুই যকার এবং তিন যকারবিশিষ্ট) ই হইবে। কেন, যাহাতে অভেদই হয়, তাহাই হউক! অর্থাৎ তিন যকার সিদ্ধ করিবার জন্য বিকল্প না করিয়া নিত্যই যকারের লোপ করিয়া, দুই যকারই হউক।

ভাষ্যমূল।—অনুবর্ত্ততে বিভাষা শরোচি যদ্বারত্যয়ং দ্বিত্বম্ শা যদয়ং শরোচাতিদ্বির্বচনপ্রতিষেধং শাস্তি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যোঽনুবর্ত্ততে বিভাষেতি। কথংকৃত্বাজ্ঞাপকম্। নিত্যে হি তস্য লোপে প্রতিষেধার্থো ন কশ্চিৎস্যাৎ। যদি নিত্যো লোপঃ স্যাৎ প্রতিষেধবচনমনর্থকং স্যাৎ। অস্তুত্র দ্বির্বচনম্। ঝরোঝরিসবর্ণে ইতি লোপোভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যঃ বিভাষা চ সলোপঃ ইতি ততো দ্বির্বচনপ্রতিষেধং শাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা (অভেদ) কখনও হইতে পারে না। কারণ, 'বিভাষা' (বিকল্প) এই বাক্যের অনুবৃত্তি আসিয়া থাকে,—যে হেতু, এই যে 'শরোঽচি'। ৮। ৪। ৪৯। (অচ্ পরে থাকিলে শরের দ্বিত্ব হয় না) সূত্র, ইহা দ্বিত্বকে নিত্যই নিষেধ করিয়া থাকে।

যে হেতু এই "শরোঽচি" সূত্র দ্বারা, দ্বিত্বের নিষেধশাসন উপদেশ

করিতেছেন, তদ্দ্বারাই আচার্য্য পাণিনি এই জানাইতেছেন যে, 'বিভাষা' শব্দের অনুবৃত্তি আসিবে। অর্থাৎ "হলো যমাং যমি লোপঃ" সূত্রে, বিকল্পের অনুবৃত্তি আসিয়া 'হল্' এর পরস্থিত 'যম্' এর, যম্ পরে থাকিলে, বিকল্পে লোপ হইবে।

এতদ্দ্বারা 'যমের' লোপ যে, বিকল্পে হয়, তাহা কিরূপে জ্ঞাপন হইল ?

তাহার ('যম্'এর) লোপ নিত্য হইলে, প্রতিষেধের 'অচ্' পরে এমন শর্ এর দ্বিত্বনিষেধের) কোনও প্রয়োজন ছিল না ¶। (১) লোপ যদি নিত্যই হয়, তবে দ্বিত্বপ্রতিষেধসূচক (শরে হচি) বাক্যই অনর্থক হয়।

কেন, হউক্ না দ্বিত্ব, "ঝরো ঝরি সবর্ণে"। ৮।৪।৬৫। হল্'এর পরস্থিত 'ঝর্'এর লোপ হয়. সবর্ণ 'ঝর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে লোপ হইবে ?

সেই লোপটী (ঝরো ঝরি সবর্ণে) ও বিকল্পেই হয়. আচার্য্য (পাণিনি) এইটী দেখিয়াছেন ; এবং সে জন্যই প্রতিষেধশাস্ত্র ('শরোহচি') করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। নিত্যোহপি তস্য লোপে স প্রতিষেধোহবশ্যং বক্তব্যঃ। যদেতদচোরহাভ্যামিতি দ্বির্বচনং লোপাপবাদঃ স বিজ্ঞায়তে। কথম্। যর ইত্যুচ্যতে। এতাবন্তশ্চ যরঃ। যদুত ঝরোবা যমো বা। যদি চাত্র লোপঃ স্যাদ্দ্বির্বচনমনর্থকং চাৎ।

ভাষ্যানুবাদ—ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ, তাহার ("ঝরোঝরি সবর্ণে, সূত্রানুসারে, ঝর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের) লোপ, নিত্য হইলেও সেই ("শরোহচি" সূত্রানুসারে শর্প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দ্বিত্ব) প্রতিষেধ, অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ, এই যে "অচোরহাভ্যাং দ্বে" এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এতদ্দ্বারাই জানাইতেছে যে, এই যে দ্বিত্ব-নির্দ্দেশ, তাহা লোপের বাধক। কেন ?

'ঝরো ঝরি সবর্ণে', এই সূত্রে, "যর্এর দ্বিত্ব হয়," এইরূপ বলা হইয়া থাকে। সেই 'যর্' (যর্প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ) আবার এইরূপ যে,—তাহার একাংশ 'ঝর্'ও একাংশ 'যম্'। অতএব যেখানেই 'যর্' এর দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে, সেখানেই, হয় 'ঝর্', নতুবা 'যম্', রহিয়াছে বলিয়া, সর্ব্বত্র লোপ করিতে থাকিবে। যদি এস্থলে, হয় "ঝরোঝরি সবর্ণে" সূত্রানুসারে, ঝর্ এর

(১) ¶ এরূপ চিহ্ন থাকিলে ভাষ্যকার পতঞ্জলিকৃত বা উদ্ধৃত শ্লোক জানিতে হইবে। উদ্ধৃত হওয়াই বিশেষ সম্ভব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের পণ্ডিত দর্শন।
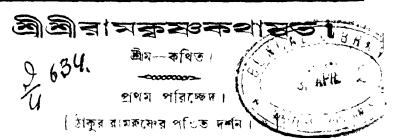
আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে পরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুর্য্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তাল পাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের

* শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি।

কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ! বেশ! পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেকচার দাও?

শশধর। মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার।)

"কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্ত্যা' ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বল্‌তে পার।

(বিষয়ী লোক ও লেকচার)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মার্‌লে কুমীরের কি হবে?

সাধুরকমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তাই বলি, তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্চে না।

তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;—তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

"তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, কোন্‌টা আম গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ কর্‌তে পারে

না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা'হ'লে নিশ্চয় জেনো যে, তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।

ফল হইলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম্ম—ফুল।

গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম কর্‌তে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়্‌লে, শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম কর্‌তে দেয় না। ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম কর্‌তে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী, প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়।

যেমন ঘণ্টার শব্দ টং-অ-ম্। যোগী নাদভেদ করে পর ব্রহ্মে লয় হন।

সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদিকর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাধির কথা বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল! তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বহির্গত হইতে লাগিল। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটী কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগন্মাতাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার বলেছিলাম, "মা! আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখ্‌বো" তাই, তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি? তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন।)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুনলুম, তখন জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে?

যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

[আদেশ ও আচার্য্য]

যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা হ'লে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জাল্‌লে, বাদ্‌লে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেকচার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে 'আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লবেন'? আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, 'দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না'।

চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা' ব'লে মনে কোরো না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, এক জন মাপে, আর একজন রাশ্‌ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোকশিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্‌ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা করছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না?

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। (পণ্ডিতের প্রতি) কেমন মহাশয় ?

পণ্ডিত। না, আদেশ ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্ত্তব্যবোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চার কি হবে ?

একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিল "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম।" এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, "শালা বলে কিরে ! মদ খেত !" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

বরিশালে বাড়ী এক জন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল "মহাশয়, আপনি প্রচার কর্‌তে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা' হ'লে আমিও কোমর বাঁধি'। আমি বল্‌লাম ওগো, একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটী পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো। আর সকালবেলা যারা পুকুরে আস্‌তো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত ; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না ; আবার তার পরদিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছুদিন পরে কোম্পানি থেকে যখন এক-জন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে ; তখন কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

তাই বল্‌ছি হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,—তাদের সঙ্গে তোমায় লড়্‌তে হবে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি ? আর যে আদেশ পায় নাই তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে ?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন ॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

[নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর]

আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম - ঈশ্বর রসের সমুদ্র ; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কি না বল। আচ্ছা মনে কর খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল? নরেন্দ্র বল্লে, আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে! তখন আমি বল্লাম বাবা এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হও।

ঈশ্বর লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বর লাভের নানা পথ)

দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও,বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন করলেই তুমি অমর হবে।

অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান,কর্ম্ম, ভক্তি ; যে পথ দিয়া যাও; আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামুটি যোগ তিন প্রকার— 'জ্ঞানযোগ," "কর্ম্মযোগ," আর "ভক্তিযোগ।"

১। জ্ঞানযোগঃ—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। কর্ম্মযোগঃ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ। তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ।

ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। ভক্তিযোগঃ—ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁ'তে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম করতে বলেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম।

তার পর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না ক'রে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তার পর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার'।

যদি রোগ শোক, সুখ দুঃখ, এসব বোধ থাকে, তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর্ করে রক্ত পড়্ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে'?

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে

ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে ; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরে যান, তা' হলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় ?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায় —প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কল্‌কাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে ; তা'হলে গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখ্‌তে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি।

জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন হয় ; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং থাকে না, নামরূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম্ম ; ভক্তের প্রার্থনা।)

ভক্ত বলে, 'মা, সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম কর্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম কর্‌তে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ কর্ত্তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্‌বে, তখন তোমার কর্ম্ম কর্‌বো, নচেৎ নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। হাজরা অনেক দূর গিছ্‌ল,

আর খুব উঁচুতে উঠেছিল, হৃষীকেশ গিছ্ল (সকলের হাস্য)। আমি অত দূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই। (সকলের হাস্য)।

চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা হ'লে তীর্থ যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখলাম সেই গাছ। সেই তেঁতুলপাতা!

তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তা হ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এ দিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ এ সব নিয়ে ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে অন্য হীরামাণিক খুঁজে বেড়ানও তা'।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না।

ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্লে, 'মা, আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লেন, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেব না।'

সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিন রকম বদ্যি আছে।

এক রকম আছে, তারা নাড়ী দেখে ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে চলে যায়। কেবল মাত্র রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বদ্যি।

সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল, কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা' দেখে না, তা'র জন্য ভাবে না।

কতকগুলি বদ্যি আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের

বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আবার উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা' হ'লে তারা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছেন; তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবা'র জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত। মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয় না বল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বদ্যি কি করবে? উত্তম বদ্যিও কিছু করতে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে'? মনে কর, বাপ নাই; হয়তো বাপের ঋণ আছে। তা হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক? শুনছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুনছি।

(ঈশ্বরের দয়া)

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুর বাড়ীতে কতগুলি শিখ সিপাহী এসেছিল; মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথার মধ্যে এক জন বল্লে, 'ঈশ্বর দয়াময়।' আমি বল্লাম, 'বটে? সত্য নাকি? কেমন ক'রে জান্লে?' তারা বল্লে, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন দাওয়াচ্ছেন, এত যত্ন করছেন।' আমি বল্লাম, 'সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখ্বে না ত কে দেখ্বে? তবে কি ও পাড়ার লোক এসে দেখ্বে না কি'?

নরেন্দ্র। তবে ঈশ্বরকে দয়াময় বল্বো না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে কি আমি দয়াময় বলতে বারণ করছি? আমার বল্বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আজ আমার খুব দিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বল্লুম জান?

"সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।' রাবণ এর মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুসি হয়েছিল। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত দূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধুবান্ধবসঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

[স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরাজী হইতে ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত]

(৬২৬ পৃষ্ঠার পর।)

এইরূপে মনুষ্য জড়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মণ্ডলে, অনন্তের গভীরতর প্রস্ফুরণ অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নানাবিধ ধর্ম্মনীতির শাসন সকল এইরূপে সংগঠিত হইয়াছিল, কিন্তু নিত্যকাল আত্মোৎসর্গই সকলের একমাত্র মূলচিন্তা ছিল। সম্পূর্ণ অহম্-নাশই ধর্ম্মনীতির আদর্শ। যদ্যপি মনুষ্যকে তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা চিন্তা করিতে নিষেধ করা হয়, তাহারা চমকিত হইয়া উঠে। সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব হারাইতে অত্যন্ত ভীত হয়। অথচ ইহারাই ধর্ম্মনীতির মহান্ আদর্শ সকলকে সত্য বলিয়া ব্যক্ত করে; মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করে না যে, সমস্ত ধর্ম্মনীতির অভিপ্রায়, লক্ষ্য, চিন্তা—এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ, ব্যক্তিত্বের নির্ম্মাণ নহে।

মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর যে ধর্ম্মনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সুখবাদীদিগের আদর্শ তাহা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। কারণ, প্রথমতঃ সাধারণের সুখের সম্বন্ধে

বিচার করিয়া আমরা কোন ধর্ম্মনীতিশাসন প্রাপ্ত হইতে পারি না। সাধারণতঃ যাহাকে ঐশ্বরিক আদেশ বলে কিম্বা আমি যাহাকে অহংজ্ঞানাতীত উপলব্ধি বলিয়া থাকি, তাহা ব্যতীত কোন ধর্ম্মনীতি থাকিতে পারে না। অনন্তাভিমুখীন ঈদৃশী চেষ্টা ব্যতীত কোনরূপ আদর্শও থাকিতে পারে না। যে কোন মত মনুষ্যকে স্বকীয় সমাজ মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা মানবজাতির ধর্ম্মনীতিশাসন ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইবে। সুখবাদিগণ আমাদিগের অনন্তাভিমুখীন এই চেষ্টা, এই অহংজ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া অসাধ্য ও অসম্ভব জানিয়া পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন ; অথচ আবার ধর্ম্মনীতিপরায়ণ হইয়া লোকের মঙ্গল সাধনে উপদেশ দেন। আমরা মঙ্গল সাধন করিব কেন ? মঙ্গল সাধন ত অপ্রধান উদ্দেশ্য। আমাদিগের একটী আদর্শ আবশ্যক। ধর্ম্মনীতি উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। যদি উদ্দেশ্যই কিছু না থাকিল, তবে আমাদিগের নীতিপরায়ণ হইবার আবশ্যকতা কি ? অনিষ্ট না করিয়া অপরের মঙ্গল করিব কেন ? যদি সুখই মানবজাতির লক্ষ্য হয়, তবে আমি নিজেকে সুখী করিব না কেন—অপরকে অসুখী না করিব কেন ? কি আমাকে নিবারণ করিতেছে ? দ্বিতীয়তঃ, সুখবাদের ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে এই সকল আচার ও বিধি প্রসূত হইয়াছে, কিন্তু সমাজ যে নিত্যকাল থাকিবে, তাহা সুখবাদীর অনুমানের কি অধিকার আছে ? বহুকাল পূর্ব্বে সমাজ ছিল না, সম্ভবতঃ বহুপর সময়ে বর্ত্তমান থাকিবে না ; অধিক সম্ভবতঃ, ইহা কোন উচ্চতর ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার একটী চলিতাবস্থা মাত্র এবং যে কোন শাসন শুদ্ধ সমাজদৃষ্টে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং সুখবাদীর মত বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় বড় জোর কার্য্যকারী হইতে পারে। ইহার বাহিরে এই মতবাদের কোন মূল্য নাই। কিন্তু যে নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতা হইতে উৎপন্ন—অনন্ত মনুষ্য তাহার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, কিন্তু অনন্তের সহিত ইহার সম্বন্ধ। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, এজন্য সমাজও ইহার অবলম্ব্য এবং ইহা ব্যক্তি ও তাহার নিত্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় বলিয়া সমগ্র সমাজে সহজেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মই মানবজাতির পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়। যতই সুখকর হউক না কেন, মানব অনবরত জড়ের চিন্তা করিতে পারে না।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে অধিক মনঃসংযোগ করিলে আমাদিগের ব্যবহারিক সম্বন্ধ

সকল বিপর্য্যস্ত হয়, এরূপ কথিত হইয়া থাকে। পুরাকালে চীনদেশীয় সাধু কনফুসের সময়ে এই কথা প্রচলিত ছিল, "ইহলোকের তত্ত্বাবধান করা যাউক, পরে ইহা শেষ হইলে অন্যান্য লোকের তত্ত্বাবধান করিব।" আমরা ইহলোকের তত্ত্বাবধান করিব, অন্য সমস্ত যাউক! উত্তম কথা! কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তাশীলতা আমাদিগের ব্যবহারিক সম্বন্ধ সকল কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি করিলেও ব্যবহার বিষয়ে অধিক চিন্তাপর হইলে ইহপরলোকে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইহা আমাদিগকে জড়বাদী করে। প্রকৃতি নহে, কিন্তু প্রকৃতির অতীত কিছু মানবের লক্ষ্যস্থান, ইহা তাহার জানা উচিত।

মনুষ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে যতক্ষণ চেষ্টা করে, ততক্ষণই তাহার মনুষ্যত্ব। এই প্রকৃতি উভয়বিধ,—আন্তর ও বাহ্য। যে সকল নিয়ম আমাদিগের চতুর্দিকস্থ ও দেহস্থ জড়পরমাণুসকল শাসিত করে, তাহারাই কেবল প্রকৃতির অধিকার নহে, কিন্তু আমাদিগের অন্তরে অধিকতর সূক্ষ্ম প্রকৃতি আছেন, যিনিই প্রকৃত চালক শক্তি—বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি শাসন করিতেছেন। বাহ্য প্রকৃতি পরাভূত করা উত্তম ও মহৎ কার্য্য বটে, কিন্তু মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি জয় করা অধিকতর মহৎ। গ্রহ নক্ষত্রাদি যে নিয়মে পরিচালিত হয়, তাহা অবগত হওয়া উত্তম ও মহৎ, যে নিয়মে মানবজাতির ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সুখদুঃখানুভাবকবৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি শাসিত করে, তাহা অবগত হওয়া তদপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। এই অন্তরস্থ মনুষ্যের জয়, মানবমনের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম কার্য্যসকলের গুপ্তরহস্য ভেদ করা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অধিকার। সাধারণ মানবপ্রকৃতি বৃহৎ জড়বিষয়ক সত্য সকল দেখিতে চায়, সূক্ষ্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। একথা যথার্থ যে, ইতর লোকে শারীরিক বলের আত্যন্তিক বিকাশ দেখিতে পায় বলিয়া সহস্র মেষ-যাতা সিংহের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ক্ষণমাত্র ভাবিবে না যে, সিংহের মুহূর্ত্তের জন্য প্রাবল্য হইলেও তাহা মেষগণের মৃত্যুর কারণ। সাধারণ মানবের পক্ষেও সেইরূপ। ইহারা বাহ্য বস্তুমাত্রেই আমোদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সকল সমাজেই এরূপ কতকলোক আছেন, যাঁহাদের সুখ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আবদ্ধ থাকে না, ইহারা বাহিরে চাহিতে চান; ইঁহারা কখন কখন জড় অপেক্ষা কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস দেখিতে পান ও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে কঠোর চেষ্টা করেন। যদ্যপি আমরা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ হই, আমরা দেখিতে পাই, সমাজে অধিকসংখ্যক এইরূপ ব্যক্তির উৎপাত্তর উপর সেই জাতির উন্নতি নির্ভর করে এবং সুখবাদিগণ ইহা নিষ্ফল বলিলেও অনন্তের অভিমুখীন অনুসন্ধান নিবৃত্তি

হইলেই সমাজের অবনতিরও সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মের ভিতর যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, তাহাই প্রত্যেক জাতির শক্তির নিদান এবং যে দিন হইতে আধ্যাত্মিকতার হ্রাস এবং জড়বাদে বিশ্বাস আরম্ভ হয়, জাতির মৃত্যুরও সেই দিন হইতে সূচনা হইয়া থাকে।

অতএব ধর্ম্ম হইতে ধ্রুব তত্ত্ব ও সত্য সকল শিক্ষা ভিন্ন, ধর্ম্ম হইতে শান্তিলাভ ভিন্ন, মানবের পক্ষে ধর্ম্ম, বিজ্ঞানরূপে অনুশীলন অতিশয় মহৎ ও স্বাস্থ্যকর পরিচালন। এই অনন্তের পশ্চাৎ অনুসরণ, এই অনন্তকে করায়ত্ত করিবার কঠিন যত্ন, এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবার চেষ্টা, এই জড়ের বাহিরে যাইবার প্রযত্ন, মনকে নীচ সঙ্কীর্ণ সামান্য আদর্শে পূর্ণ না করিয়া আধ্যাত্মিক মনুষ্য প্রস্ফুরণ করিবার, দিবারাত্র অনন্তকে আমাদিগের সত্তার সহিত একীভূত করিবার এই কঠিন উদ্যমই মানবের পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয়। কেহ কেহ আহারে আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন। তাঁহারা এসুখে বঞ্চিত হউন, ইহা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। অপরে, কোন বস্তু লাভ করিলে আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন। তাঁহারা এসুখে বঞ্চিত হউন, ইহা বলিবারও আমাদের কোন অধিকার নাই। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন; তাঁহাকেও "না" বলিবার অপরের কোন অধিকার নাই। যতই নিম্নতর জীবত্ব, ইন্দ্রিয়ে নিবদ্ধ সুখ ততই অধিক। কুকুর ও শৃগালের ন্যায় অতি অল্প লোকেই ভক্ষ্য বস্তু স্ফূর্তি পূর্ব্বক আহার করিতে পারেন। কুকুর ও শৃগালের সমস্ত সুখই যেন ইন্দ্রিয় অভ্যন্তরে, সেই আহারের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সকল জাতির নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ে অধিক সুখ অনুভব করে, কিন্তু উন্নত ও শিক্ষিতেরা চিন্তা, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞানে অধিক সুখ প্রাপ্ত হন। আধ্যাত্মিক চিন্তা অধিকতর উচ্চস্তর। অনন্ত ইহার বিষয় বলিয়া এই স্তরই উচ্চতম এবং যাঁহারা ইহার ভাবগ্রাহী, তাহাদের পক্ষে ইহা উচ্চতম সুখ। অতএব মনুষ্য সুখান্বেষণ করিবে—সুখবাদীদিগের এই মতানুযায়ীও মনুষ্যের ধর্ম্মচিন্তার অনুশীলন কর্ত্তব্য, কারণ, ইহাই উচ্চতম সুখ। এইরূপে ধর্ম্মানুশীলন সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় বলিয়া আমার বোধ হয়। আমরা কার্য্যে ইহাই দেখিতে পাই। ইহা মানবমনের পরিচালনে প্রধান চালকশক্তি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভিন্ন কোন আদর্শই তদ্রূপ শক্তিরাশি আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করিতে পারে না। আমরা সকলেই অবগত আছি, মানব-ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপই ঘটিয়াছে এবং ইহার শক্তি এখনও মৃত নহে। আমি অস্বীকার করি না

যে,মনুষ্য কেবল সুখবাদমতে দোষশূন্য ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে। পৃথিবীতে অনেক মহৎ লোক হইয়াছিলেন, যাঁহারা কোন সুখবাদ মতাবলম্বনে সম্পূর্ণ সৎ, নীতিবান ও দোষশূন্য ছিলেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জগৎ পরিচালিত করেন, যাঁহারা পৃথিবীতে আকর্ষক শক্তিরাশি আনয়ন করেন, যাঁহাদের শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র লোকের ভিতর কার্য্য করিতে থাকে—যেখানেই গমন করুন,যাঁহাদের জীবন পবিত্রকিরণজাল বিস্তার করিয়া আধ্যাত্মিক অগ্নিতে অন্যকে প্রজ্বালিত করে—এই আধ্যাত্মিকতাই যে ঈদৃশ লোকের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি-ভূমি, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। ধর্ম্ম হইতে তাঁহাদের তেজস্বিতার পরিচালক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। যে অনন্ত তেজস্বিতা প্রত্যেক মানবের জন্মাধিকার ও প্রকৃতি—প্রধান পরিচালক শক্তি ধর্ম্মই তাহাকে উন্মুক্ত করেন। এস্থলে ধর্ম্মের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। চরিত্র সংগঠিত করিতে, সুন্দর ও মহৎ যাহা কিছু লাভ করিবার উদ্যম করাইতে, পরকীয় ও স্বকীয় অন্তরে শান্তি আনয়ন করিতে, ধর্ম্মই উচ্চতম পরিচালক শক্তি এবং এই ভাবে ধর্ম্ম অনুশীলন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর ভিত্তির উপর ধর্ম্মানুশীলন আবশ্যক। ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক, বংশীয় বা জাতীয় ভাবসকল—প্রত্যেক বংশের বা জাতির বিশেষ দেবতা ভিন্ন অন্য সবই মিথ্যা এই ভাব সকল—অতীত নিহিত হওয়া উচিত, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মানবমন যেরূপ প্রসারিত হইবে, ইহার আধ্যাত্মিক পদবিন্যাসও সেইরূপ প্রসারিত হওয়া উচিত। সেই কাল সমুপস্থিত, যখন মনুষ্য একটী চিন্তা লিপিবদ্ধ করিলে তাহা জগতের সকল প্রান্তেই উপগত হয়। কেবল ভৌতিক উপায়ে আমরা সমগ্র জগতের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম সকলকেও সেইরূপ বিশ্বজনীন ও উদার হইতে হইবে।

ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আদর্শ সকল,জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ আছে,সমস্তই আলিঙ্গন করিবে অথচ ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে তাহাদের অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যমান থাকিবে। অতীতের যাহা কিছু সুন্দর,সুরক্ষিত হইবে, অথচ সঞ্চিত ভাণ্ডার ভবিষ্যতে বৰ্দ্ধনার্থ মুক্তদ্বার থাকিবে। ধর্ম্ম সর্ব্বমতগ্রাহী হইবে। কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ ঈশ্বরাদর্শে বিশ্বাসহীন অপর লোকের প্রতি ইহা অবজ্ঞাচক্ষে অবলোকন করিবে না। আমার জীবনে আমি অনেক আধ্যাত্মিক লোক দেখিয়াছি, অনেকানেক জ্ঞানী লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না—অর্থাৎ আমরা যে অর্থে এই ঈশ্বর কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। হয়ত তাঁহারা যেরূপ ঈশ্বরজ্ঞ ছিলেন, আমরা সেরূপ কখন হইতে পারিব না। ব্যক্ত

ভাবসমন্বিত ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরবিষয়ক ব্যাপারজ্ঞানশূন্যতা, অংশ সত্য, নীতি-শাসন বা আদর্শ মনুষ্য এই সকলই ধর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্গত হইবে এবং যখন ধর্ম্ম-সকল এইরূপ প্রসার প্রাপ্ত হইবে, তাহাদের মঙ্গলকরী শক্তিও বর্ত্তমানাপেক্ষা শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে। প্রভূতশক্তিধারী ধর্ম্মসকল কেবল সঙ্কীর্ণতা ও সীমা-বদ্ধতাবশতঃ মঙ্গলাপেক্ষা জগতে অনেক সময়ে অধিকতর অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়েও সমভাবসমন্বিত অনেক সম্প্রদায় পরস্পরে বিবাদ করিতেছে, কারণ, একজন যে ভাবে, যে ভাষায় তত্ত্বব্যাখ্যা করিতেছেন, অপরে ঠিক সেই ভাবে সেই ভাষায় উহা প্রকাশ করিতেছেন না। অতএব ধর্ম্মধারণার প্রসার আবশ্যক। ধর্ম্মভাবসকল বিশ্বজনীন, বহুবিস্তৃত ও অনন্ত হইলে আমরা ধর্ম্মের পূর্ণ ক্রীড়া দেখিব। এক্ষণে জগতে ধর্ম্মশক্তির সূচনা হইয়াছে মাত্র। ধর্ম্মসকল লোপ প্রাপ্ত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান জগৎ হইতে লুপ্ত হইতেছে, কখন কখন এরূপ কথিত হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, ইহাদের আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ধর্ম্মশক্তি প্রসারিত ও বিস্তারীভূত হইয়া মানবজীবনের প্রত্যেক অংশে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। কতিপয় নির্ব্বাচিত বা যাজক সম্প্রদায়ের হস্তে যতদিন ধর্ম্ম ছিল, ততদিন ইহা মন্দিরে গির্জ্জায় পুস্তকে মতবাদে আচারে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডে আবদ্ধ ছিল। যখন তুমি যথার্থ আধ্যাত্মিক বিশ্বজনীন উপলব্ধিতে উপস্থিত হইবে, তখনই কেবল ধর্ম্ম সত্য ও জীবন্ত হইবে, আমাদের প্রকৃতিকে স্পর্শ করিবে, মনুষ্যের প্রত্যেক গতিবিধিতে বর্ত্তমান থাকিবে, সমাজের অতি ক্ষুদ্রাংশে অনুপ্রবেশ করিবে এবং অভূতপূর্ব্ব অনন্তগুণ মঙ্গলপ্রদ শক্তি হইবে। যখন ধর্ম্মসকলের একত্র উত্থান ও পতন, তখন বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে সহানুভূতি আবশ্যক। এই সহানুভূতি পরস্পরের প্রতি সম্মাননা হইতে সমুদ্ভূত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সেইরূপ করুণাপর আনুকূল্যকারী কার্পণ্যরীতিযুক্ত সহানুভূতি নহে, যাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান সময়ে অনেকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা, মানসিক ব্যাপারসমূহের আলোচনা-সমুদ্ভূত ধর্ম্মের বিকাশ সকল—দুর্ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে যাহারাই কেবল ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী করে—ও যে সকল ধর্ম্মবিকাশ পৃথিবীতে পদলগ্ন করিয়া থাকিলেও উক্ত বাস্তবিক স্বর্গের গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করিতে মস্তকোত্তলন করিতেছে, অর্থাৎ যাহাদিগকে জড়বিজ্ঞান বলে, তাহাদের মধ্যে একটী বিশেষ আবশ্যক।

এই সমন্বয় সাধন করিতে হইলে উভয়েরই কখন অত্যন্ত অধিক কখন বা ক্লেশকর ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবশেষে এই ত্যাগস্বীকার-নিবন্ধন প্রত্যেকেই স্বকীয় উন্নতি দেখিতে পাইবেন এবং সত্যপথে অধিকতর অগ্রসর হইবেন। এবং পরিশেষে কালের পরিবর্ত্তন যে জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ এবং যে জ্ঞান দেশের পরিবর্ত্তনের উপর সংস্থাপিত, উভয়ই সম্মিলিত হইয়া সেই স্থানে একীভূত হইবে, যে স্থানে দেশও নাই কালও নাই, যে স্থানে মন যাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণও নহে, যাহা নিরপেক্ষস্বরূপ অনন্তস্বরূপ বিশ্বের ঈশ্বর।

মনুষ্য-স্বভাবে এই ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি র'হয়াছে; আমরা সম্মুখে এক পদও অগ্রসর হইতে চাহি না। যেমন বরফে জমা ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পড়া যায়, মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে আমারও তাহাই বোধ হয়। এরূপ কথা হইয়া থাকে যে, এরূপ অবস্থায় লোকে ঘুমাইতে চায়। যদি কেহ তাহাদে. টানিয়া তুলিতে চায়, তাহারা নাকি বলে, 'আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে ঘুমাইতে বড় আরাম।' তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিদ্রা হইয়া যায় আমাদের প্রকৃতিও তদ্রূপ। আমরাও সারা জীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদয় বরফে জমিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্ব্বদাই আদর্শ অবস্থায় পঁহুছিবার চেষ্টা করিবে আর যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে তোমার নিম্নভূমিতে আনয়ন করে, যদি কেহ তোমায় শিক্ষা দেয়, ধর্ম্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব ধর্ম্ম। কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে, ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য, তবে আমি তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই বিষয়টীতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ দুর্ব্বলতার পোষকতা করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে ত ইন্দ্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, যদি তুমি ঐ উপদেশের অনুসরণ কর, তবে তুমি কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ সম্বন্ধে আমি কিছু অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি, আর আমার দেশে ধর্ম্মসম্প্রদায় রক্তবীজের ঝাড়ের মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসর নূতন নূতন সম্প্রদায় হইতেছে। কিন্তু একটী জিনিষ আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে সকল সম্প্রদায়ে সংসার ও ধর্ম্ম একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে—আর যেখানে উচ্চতম আদর্শ সকলকে বৃথা সাংসারিক বাসনার সহিত সামঞ্জস্য করার—ঈশ্বরকে মানুষের ভূমিতে টানিয়া আনিবার—এই মিথ্যা চেষ্টা আছে, সেখানেই রোগ প্রবেশ করে। মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে ঈশ্বর হইতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর এক দিক্ আছে। আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। আমাদের সকলেই সেই লক্ষ্য স্থলে চলিয়াছি। দুর্ব্বলতা ও সবলতার মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের

মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, পাপও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, যে কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—প্রকারগত নয়—কারণ, একত্বই সমুদায়ের রহস্য। সমুদয়ই এক—চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মারূপেই হউক, সবই এক—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। এই হেতু যাহারা ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহাদের প্রতি ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা করিও না, লোককে সাহায্য করিতে পার ত কর। যদি না পার, হাত গুটাইয়া লও, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, তাহাদিগকে আপন পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতি হয় না। এরূপে কারু কখন উন্নতি হয় না। অপরের নিন্দা করিয়া কেবল বৃথা শক্তিক্ষয়। সমালোচনা ও নিন্দা আমাদের বৃথা শক্তিক্ষয়ের উপায় মাত্র, আর শেষে আমরা দেখিতে পাই, অপরে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক সেই দিকে চলিতেছি, আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতামাত্র।

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের পাপের ধারণা আর সাধারণ ধারণা যে, মানুষ পাপী—বাস্তবিক এই দুটী কথাই এক। একটী 'না' এর দিক্, বেদান্ত 'হঁা' এর দিক্। একজন মানুষকে তাহার দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেয়; অপরে বলে, দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না—আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে। মানুষ যখনই প্রথম জন্মিল, তখনই তাহার রোগ জানা গেল। সকলেই আপনার কি রোগ, তাহা জানে—অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না—আমরা বাহিরের ঘটনা সব ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা বহির্জ্জগতের নিকট কপট হইতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্ব্বলতা জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলে বড় উপকার হইবে না—তাহাকে ঔষধ দাও—আর মানুষকে কেবল সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নহে, রোগ প্রতীকারের হেতু নহে। মানুষকে সর্ব্বদা তাহার দুর্ব্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্ব্বলতার প্রতীকার নহে—তাহার বল স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতীকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে বল পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ ধরেন এবং বলেন, 'তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ'—

যাহাকে তুমি পাপ বল, তাহা তোমাতে নাই।' উহারা তোমার খুব নিম্নতম প্রকাশ; পার যদি, তবে উচ্চতরভাবে আপনাকে প্রকাশিত কর। একটী জিনিষ মনে থাকা উচিত—আমরা সকলই পারি। কখনও 'না' বলিও না, কখনও 'পারি না' বলিও না। ওরূপ কখন হইতেই পারে না, কারণ, তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশ কালও কিছুই নহে। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার, তুমি সর্ব্বশক্তিমান।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মূলসূত্র মাত্র। আমাদিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, যদি ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জন্য মতবাদ মাত্র। ধর্ম্ম যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে চায়, তবে উহার এমন হওয়া উচিত যে, মানুষ সর্ব্বাবস্থায় উহার সহায়তা লইতে পারে—দাসত্বে বা স্বাধীনতায়—মহা অপবিত্রতা বা অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্যে, সর্ব্ব সময়েই যেন উহা সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদান্তের তত্ত্ব সকল অথবা ধর্ম্মের আদর্শ সকল অথবা উহাদের যে নামই দাও না কেন—কাযে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানব জাতির সর্ব্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতে যত দুঃখ কষ্ট রহিয়াছে, তাহার অনেক হ্রাস হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ নর নারীর মধ্যে যদি কোন ভাব বিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে, তাহা এই আত্মবিশ্বাস—তাঁহারা এই জ্ঞানে জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইবেন, আর তাহা হইয়াও ছিলেন। মানুষ যত ইচ্ছা অবনতভাবাপন্ন হউক না কেন, কিন্তু এমন এক সময় অবশ্য আসিয়া থাকে, যখন কেবল ঐ অবস্থায় বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হয়; তখন সে আপনার উপর বিশ্বাস করিতে শিখে। কিন্তু [illegible]দের পক্ষে গোড়া হইতেই ইহা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বাস শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব? মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল এই বিশ্বাসের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব লইয়া, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা

পূর্ব্বে উহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা কর। তখন ঐ চিন্তাশক্তিপ্রভাবে তোমার সমুদয় কর্ম্মই পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। যদি জড় শক্তিশালী হয়, তবে চিন্তা সর্ব্বশক্তিমান। সেই চিন্তা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, আপনাকে নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল। কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের মাথায় যদি ঈশ্বরেচ্ছায় প্রবেশ না করিত, তাহা হইলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব এবং দুর্ব্বলতা ও নীচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পঁহুছিতে পারিলেই ভাল ছিল। কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া যাইতেই হয়; যাহারা তোমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর করিয়া যাইও না।

অনেক সময় এই সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথবা অপরকে দুর্ব্বল বলিও না। যদি পার, লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্পনিক পুরুষগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কারমাত্র। আমাকে একটী উদাহরণ দেখাও, যেখানে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা সকলেই জান, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গা ছম ছম করিতে থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাল হইতেই এই সকল ভয় আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভ্যাস করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, বন্ধু বান্ধবের ঘৃণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরের মস্তিষ্কে আর ঐ গুলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃত্তিকে জয় কর। ধর্ম্ম বিষয়ে শিখাইবার আর কি আছে? কেবল বিশ্বব্রহ্ম [illegible] আত্মবিশ্বাস।

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। তোমরাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমরা জানি। সকল দিক্ হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নহে,

পূর্ব্বে উহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা কর। তখন ঐ চিন্তাশক্তিপ্রভাবে তোমার সমুদয় কর্ম্মই পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। যদি জড় শক্তিশালী হয়, তবে চিন্তা সর্ব্বশক্তিমান। সেই চিন্তা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, আপনাকে নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল। কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের মাথায় যদি ঈশ্বরেচ্ছায় প্রবেশ না করিত, তাহা হইলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব এবং দুর্ব্বলতা ও নীচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পঁহুছিতে পারিলেই ভাল ছিল। কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া যাইতেই হয়; যাহারা তোমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর করিয়া যাইও না।

অনেক সময় এই সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথবা অপরকে দুর্ব্বল বলিও না। যদি পার, লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্পনিক পুরুষগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কারমাত্র। আমাকে একটী উদাহরণ দেখাও, যেখানে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা সকলেই জান, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গা ছম ছম করিতে থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাল হইতেই এই সকল ভয় আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভ্যাস করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, বন্ধু বান্ধবের ঘৃণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপ'র মস্তিষ্কে আর ঐ গুলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃত্তিকে জয় কর ধর্ম্ম বিষয়ে শিখাইবার আর কি আছে? কেবল বিশ্বব্রহ্মা আত্মবিশ্বাস।

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। তোমরাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমরা জানি। সকল দিক্ হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নহে,

আমাদের প্রতি কার্য্যে কিরূপে সদসৎ বিচার করিতে হয়, তখন আমাদিগকে সত্যাসত্যনির্ব্বাচনের উপায় জানিতে হইবে ; তাহা এই পবিত্রতা, একত্ব। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, কারণ, উহা মিলনসম্পাদক ; ঘৃণা অসত্য, কারণ, উহা বহুত্ববিধায়ক—পৃথক্‌কারক। ঘৃণার জন্যই তোমা হইতে আমাকে পৃথক্ করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য ; ইহা একটী বিনাশিনী শক্তি ; ইহাতে পৃথক্ করে—নাশ করে।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক। সকলে এক হইয়া যায়—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবার নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পশুগণের সহিত পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া যায়। কারণ, প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব—প্রেমই স্বয়ং ভগবান,আর সমুদয়ই প্রেমেরই বিভিন্ন বিকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে—কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব আমাদের সকল কর্ম্মেই উহা একত্ব-সম্পাদক বা বহুত্ববিধায়ক, তাহা দেখিতে হয়। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে উহাকে ত্যাগ করিতে হয়, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে উহাকে সৎ কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হয়, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক ; দেখিতে হয়—উহা আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি না। যদি তাহা করে, তবে ঐরূপ চিন্তার পোষণ করিতে হইবে—যদি না করে, তবে উহাকে পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু শিখায়ও না, কিন্তু উপনিষদের ভাষায় বলে, যাঁহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই তোমায় শিক্ষা দিতেছি। আমি এই চেয়ার খানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার 'আমি'র জ্ঞান হয়, তৎপরে চেয়ারটীর জ্ঞান হয়। এই আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটী জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞান লাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপবাক্য মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও—সমুদয় জগতই উড়িয়া যাইবে—আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আইসে—অতএব ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি'—যাহাকে তুমি 'আমি' বল। তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, এই 'সান্ত

অথবা "হলো যমাং যমি লোপঃ" সূত্রানুসারে, যমের নিয়তই লোপ হয়; তবে "অচোরহাভ্যাং দ্বে" সূত্রানুসারে, 'যর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দ্বিত্ব অনাবশ্যক হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কিং তর্হি তস্যোযোগস্যোদাহরণম্। যদকৃতে দ্বির্বচনে ত্রিব্যঞ্জনঃ সংযোগঃ। প্রত্তঃ অবত্তঃ আদিত্যঃ। ইহেদানীং কর্ত্তা হর্ত্তেতি দ্বির্বচনসামর্থ্যাল্লোপো ন ভবতি। এবমিহাপি লোপো ন স্যাৎ কর্ষতি হর্ষতীতি। তস্মান্নিত্যোঽপি লোপেঽবশ্যং স প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। তদেতদত্যন্তসংদিগ্ধং বর্ত্ততে আচার্য্যাণাং বিভাষানুবর্ত্ততে ন বেতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অচোরহাভ্যাং দ্বে" সূত্রানুসারে, যেখানেই 'যর্'এর দ্বিত্ব হয়, সেখানেই যদি "হলো যমাং যমি লোপঃ" অথবা "ঝরো ঝরি সবর্ণে" সূত্রদ্বয়ানুসারে, 'যর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের, লোপ না হইতে পারে, তবে এই যোগ (সূত্র) দ্বয়ের প্রয়োগের উদাহরণ কোথায় পাওয়া যাইবে? কেন, যেখানে "অচোরহাভ্যাং দ্বে" সূত্রানুসারে, দ্বিত্ব না হইয়াও তিনটী ব্যঞ্জন বর্ণের একত্র সংযোগ হইয়াছে, সেখানেই ইহার উদাহরণ মিলিবে। যেমন;—প্রত্তঃ, (১) অবত্তঃ, (২) আদিত্যঃ (৩)। এইরূপ করিলে 'কর্ত্তা' 'হর্ত্তা' প্রভৃতি, যে সকল স্থলে "অচোরহাভ্যাং" সূত্রানুসারে 'র' কারের (৪) পরে

---

(১) প্র+দা+ক্ত=প্রত্ত।

(২) অব+দা+ক্ত=অবত্ত। অচ উপসর্গাত্তঃ। ৭। ৪। ৪৭। অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত দা ধাতুর ঘু-সংজ্ঞক অচের স্থানে তকার হয়, ককার ইৎবিশিষ্ট, তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে। এই নিয়মানুসারে প্রত্তঃ, অবত্তং প্রয়োগ সিদ্ধ হইল। ক্ত প্রত্যয়ে অন্যরূপ প্রয়োগও হয়, যথা;—"অবদত্তং বিদত্তং চ প্রদত্তং চাদিকর্ম্মণি। সুদত্তমনুদত্তং চ নিদত্তমিতি চেষ্যতে॥"

(৩) অদিতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া আদিত্য, এবং তদুত্তর "আদিত্যো দেবতা অস্য" এইরূপে দেবতার্থে 'যং' প্রত্যয় করিয়া, "হলো যমাং যমি লোপঃ," সূত্রানুসারে, পর 'য'কারের লোপ করিয়া 'আদিত্য' হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত 'প্রত্তং' ইত্যাদি স্থলেও, প্র-দা ধাতুর আকার স্থানে 'ত'কার হইলে, 'দ'কার স্থানে ('খরিচ'।) 'তকার' করিলে এবং ক্ত প্রত্যয়ের 'ত'কার মিলিত হইলে, এক 'ত'কার লোপ হইয়া 'প্রত্তং' হইবে।

(৪) সংস্কৃতে 'রকার' এরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ, তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট প্রতীতির জন্য, তাহা অনেক স্থানে প্রয়োগ করা হইল।

প্রয়োগ পাওয়া যায় না, যাহার জন্য পর 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার করিবার জন্য, এখানে প্রয়োজন হয়।

ভাষ্যমূলম্।—নন্বু চায়মস্তি। আতৃঢ় আবৃঢ় ইতি। এবং তর্হি সামর্থ্যাৎ পূর্ব্বেণ ন পরেণ। যদি পরেণ স্যাদণ্ গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘো চ ইত্যেব ব্রূয়াৎ। অথবৈতদপি ন ব্রূয়াৎ। অচো হেতদ্ ভবতি হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি বল যে, কেন, পূর্ব্ব 'ণ'কার ভিন্নও ত 'ঢ'কার লোপাত্মক শব্দ আছে, যাহা পরের 'ণ' কারের সহিত প্রত্যাহার করিলে, তদন্তর্গত হইয়া থাকে। যেমন 'আতৃঢ়' 'আবৃঢ়' (১) ইত্যাদি।

যদি এরূপই হয়, তবে সমর্থতা হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে যে,—"পূর্ব্বের 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে, পরের 'ণ' কারের সহিত নহে।" কারণ, যদি এ স্থলে, পরের 'ণ' কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে, তবে 'অণ্' এত অধিক বর্ণ লইয়া প্রত্যাহার গ্রহণই ত অনর্থক হইবে। যে হেতু 'ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোচ,' এইরূপ 'অচ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

অথবা ইহা (ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘো চঃ) ও বলিতে হইবে না। কারণ, তাহারাই 'অচ্', যাহারা হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, যেহেতু ব্যঞ্জনের দীর্ঘ নাই, সেই হেতুই, 'ঢ'কার বা 'র'কার লোপ হইলে, যদি কাহারও দীর্ঘ হয়, তবে 'অচ' এরই হইবে। সুতরাং 'অচ'-এর গ্রহণ না করিলেও 'দীর্ঘ' এই উক্তির বলেই অচ্ এর গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।–অস্মিংস্তর্হি ণ গ্রহণে সন্দেহঃ কেণ ইতি। অসংদিগ্ধং পূর্ব্বেণ

(১) তৃহ্ হিংসায়াম্, বৃহ্ উদ্যমনে, ধাতুঃ। আ—তৃহ্+ক্ত=আতৃঢ়। আ—বৃহ্+ক্ত=আবৃঢ়। 'উ'কার ইৎ। 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ।' সূত্র "হোঢ়ঃ। ৮। ২। ৩১।" পদের অন্তস্থিত হকার, এবং 'ঝল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে আছে, এমন যে হকার, তাহার স্থানে 'ঢ'কার হয়। এখানে, এই সূত্রানুসারে, 'তৃহ্'ধাতুর 'হ'কার স্থানে 'ঢ'কার হইল। পরে 'ক্ত'প্রত্যয়ের 'ত'কার যোগ হইয়া, 'ষ্টুনাষ্টুঃ'। ৮। ৪। ৪১। সূত্রানুসারে 'ত'কার স্থানে 'ঢ' কার করিলে পর 'ঢ'কারকে নিমিত্ত করিয়া পূর্ব্ব 'ঢ'কারের লোপ করা হইল। এক্ষণে এই 'আতৃঢ়' শব্দের 'ঋকার' পর 'ণ' কারের অন্তর্গত হইলে, সন্দেহ হইতে পারে যে, ঋকারের দীর্ঘ হইবে কি না।

এইরূপ কেন হইবে?

পরের 'ণ' কারের অভাব প্রযুক্তই এইরূপ হইবে। কারণ, পদান্তে বর্ত্তমান্ এমন কোন শব্দই নাই, যাহার পরের 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে।

যদি বল যে, কেন, এই যে 'কর্ত্তৃ' 'হর্ত্তৃ' প্রভৃতি শব্দ, ইহাদের অন্তেস্থিত যে ঋকার, ইহারা ত পূর্ব্ব অণের অন্তর্গত হয় নাই; সুতরাং এখানে ত সন্দেহ হইতে পারে?

তবে, এইরূপ হইলে, সমর্থতা হেতুই পূর্ব্ব 'ণ' কারের সহিত প্রত্যাহার হইবে, পরের 'ণ' কারের সহিত হইবে না। কারণ, যদি এস্থলে পরের 'ণ' কারের সহিতই প্রত্যাহার হইত, তবে অণ্ গ্রহণ ত অনর্থকই হইত। সূত্রে, "অচোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ" এইরূপই বলা হইত। অথবা তাহাও বলা হইত না। যে হেতু প্রগৃহ্যসংজ্ঞাও 'অচ্' এরই হইয়া থাকে। অতএব অপ্রগৃহ্য (১) বলাতেও অচ্ এরই গ্রহণ হইবে, ব্যঞ্জনের নহে।

ভাষ্যমূলম্।—অস্মিংস্তর্হ্যণ্ গ্রহণে সন্দেহঃ। উরণ্ রপর ইতি। অসন্দিগ্ধং পূর্ব্বেণ ন পরেণ। কুত এতৎ। পরাভাবাৎ। ন হ্যঃ স্থানে পরে ণঃ সন্তি।

ভাষ্যানুবাদঃ—তবে "উরণ্ রপরঃ।" ১। ১। ৫১। ঋস্থানে 'অণ্'-প্রত্যাহারান্তর্গত যদি কোন বর্ণ আদেশ হয়, তবে তাহা রকার-পর-বিশিষ্ট হইয়া আদেশ হইয়া থাকে) এই সূত্রে অণ্ গ্রহণে সন্দেহ হইবে?

এখানেও যে পূর্ব্ব ণকারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে, পরের ণকারের সহিত হইবে না, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কেন এইরূপ হইবে?

পরের অভাব বশতঃই হইবে। কারণ, রেফের স্থানে আদিষ্ট হইতে পারে, এমন কোনও শব্দ প্রয়োগ নাই, যাহার জন্য পরের 'ণ' কারের সহিত 'অণ্ প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

---

(১) দীর্ঘ ঈকার দীর্ঘ ঊকার এবং একারান্ত যে, দ্বিবচননিষ্পন্ন শব্দ তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। সুতরাং দীর্ঘ ঈকারান্ত প্রভৃতি নহে, এমন শব্দের, অপ্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইলে হ্রস্ব বা প্লুতকেই বুঝাইবে। হ্রস্ব বা প্লুত সংজ্ঞাও 'অচ্' এরই হইয়া থাকে; অতএব 'অচ্' এর গ্রহণ না করিলেও সমর্থতা প্রযুক্তই অচের গ্রহণ হইবে।

বিভক্তিতে 'অপাম্পাঃ' প্রয়োগ হইয়াছে, এই সকল স্থলে তবে রেফের (১) লোপ হইত না। 'অজর্ঘাঃ' 'অপাম্পাঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইতনা।

ভাষ্যমূলম্ —ইহ তর্হি মাতৄণাং পিতৄণামিতি রপরত্বং প্রসজ্যেত। আচার্য্য-প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নাত্র রপরত্বং ভবতীতি যদয়ং ঋত ইদ্ধাতোরিতি ধাতুগ্রহণং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। ধাতুগ্রহণস্যৈতৎ প্রয়োজনম্। ইহ মাভূৎ। মাতৄণাং পিতৄণামিতি। যদি চাত্র রপরত্বং স্যাদ্ধাতুগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। রপ-রত্বে হলন্ত্যাদিত্বং ন ভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাত্র রপরত্বং ভবতীতি ততো ধাতুগ্রহণং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি এইরূপ হয়, তবে মাতৄণাং পিতৄণাং (২) প্রভৃতি স্থলেও রপরবিশিষ্ট শব্দ প্রতীতি হইবে?

---

(১) গৃধেঃ লোপে লুকি চ রিলোপে হলঙ্যাদিলোপে রপরে গুণে চ। ভষ্ভাবজশত্বে চ রুরেফলোপে ঢ্লোপদীর্ঘে চ ভবেদজর্ঘাঃ॥

এই প্রক্রিয়া অতিশয় গৌরব বলিয়া, এই স্থানের উপযোগী অংশমাত্র লিখিত হইতেছে। যথা;—'গৃধ্' ধাতুর যঙ্ লুগন্ত দ্বিত্বাদি হইবার পর 'সিপ্' প্রত্যয়ের কার্য্য উপস্থিত হইলে 'দশ্চ। ৮। ২। ৭৫।' (ধাতুর 'দ'কার যদি পদান্তে স্থিত হয়, তবে সেই 'দ'কার স্থানে রু হয়, সিপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, বিকল্পে) এই সূত্রানুসারে ধ স্থানে যে দকার হইয়াছে, সেই দকারের রু হইতে "ঢ্লোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ।" এই সূত্রানুসারে অকার দীর্ঘ হইয়া অজর্ঘাঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

(২) 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রে পূর্ব্বোক্ত 'কর্ত্রর্থং', 'হত্রর্থং' ইত্যাদি প্রয়োগে দোষ না ঘটিলেও মাতৃ এবং পিতৃশব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে আদিষ্ট 'নাম্' পরে থাকাতে যেখানে "নামি। ৬। ৪। ৩। (নাম্ পরে থাকিলে অজন্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়)" সূত্রানুসারে ঋকারের দীর্ঘ হইয়া "মাতৄনাম্" এবং "পিতৄনাম্" প্রয়োগ হইয়াছে; সেখানে ঋ স্থানে দীর্ঘ ৠ আদেশ হওয়াতে ৠর্ অর্থাৎ মাতৄর্ণাম্ এইরূপ প্রয়োগ হইবে। কারণ, "উরণ্ রপরঃ" সূত্রের অণ্ প্রত্যাহার যদি পরের ণকারের সহিত হয়, তবে মাতৃ শব্দের হ্রস্ব ঋ স্থানে আদিষ্ট যে দীর্ঘ ৠকার, তাহাও অণ্-প্রত্যাহারান্তর্গত হইবে। সুতরাং উরণ্ রপরঃ সূত্রানুসারেই দীর্ঘ ৠকার যে আদেশ হইবে, তাহা রপরবিশিষ্ট মাতৄর হইয়া হইবে। অতএব যাহাতে মাতৄর্ণাম্ প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ না হয়, সেই জন্যও পূর্ব্ব ণকারের সহিত অণ্ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে ৠকার পূর্ব্ব অণ্ এর মধ্যেও পড়িবে না; সুতরাং কোন সন্দেহও হইবে না।